গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সংগ্রাহক

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সংগ্রাহক

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

এই ভক্তিগ্রন্থ বিক্রয় হয় না।
শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ হয়।

6

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সংগ্রাহক

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

এই ভক্তিগ্রন্থ বিক্রয় হয় না

শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ হয়।

প্রকাশক :—

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম

শ্রীধাম গোদ্রুম, নবদ্বীপ

পোষ্ট-স্বরূপগঞ্জ

জেলা-নদীয়া

প্রকাশ কাল :—

পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস

৯ই ভাদ্র ১৪০৩

২৫শে আগষ্ট, ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

মুদ্রণে :—পোড়ামা ব্লক প্রিণ্টার্স

চরস্বরূপগঞ্জ,

পোঃ-গাদিগাছা, নদীয়া। পঃ বঃ

দূরালাপ : ৪৮-৩১৯ (০৩৪৭২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সবিনয় নিবেদন

মহাবদান্য শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অসীম করুণায় পরমারাধ্যতম নিত্যসিদ্ধ-গৌরনিজজন শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমোঘ বীর্যবতী ভাগবতী বাণী কিছু সংকলন করে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হল। নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি সাধকগণ এই বাণীর সেবানুশীলন দ্বারা, আলোচনা দ্বারা, নিজের জীবনে আচরণ, সংশোধন ও অনুভব দ্বারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ করবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হল—কি করে সিদ্ধদেহ লাভ করা যায়, কি করে এই প্রাকৃত জগতে থেকেও অপ্রাকৃত জগতের সেবা সুখ স্পর্শ লাভ করা যায়। আম্নায় ধারায় আগত গুরুবর্গের আনুগত্যে নিষ্কপট ভাবে সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে নিরন্তর কেঁদে কেঁদে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করলে, তাঁদের অহৈতুকী কৃপায় সাধক জীবের সিদ্ধদেহ উদিত হয়। এই সিদ্ধদেহ লাভের পথে বহু বাধা, বিপত্তি, বহুরূপিনী মায়ার প্রলোভন আছে যা সাধক বুঝতেই পারে না। সেই সব বাধার স্বরূপ "বহুরূপিনী আত্মবঞ্চনা", 'প্রতিষ্ঠাশা', 'বড় আমি, ভালো আমি', 'সেবার খতিয়ান', 'আমি ভজন করি না', 'দুঃসঙ্গ বর্জ্জন', 'সকল ত্যাগ করিয়াও কি

ত্যাগ করা যায় না' ইত্যাদি প্রবন্ধের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই সাধক হৃদয়ে নব জাগরণ সৃষ্টি করবে, ভজনে নতুন উদ্দীপনা দান করবে। ব্রজভজনের প্রতিকূল যে কুড়িটি ভাব আছে তা "শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী বৈভবের পূজা" প্রবন্ধের মধ্যে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই প্রতিকূল ভাবগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতে না পারলে কিছুতেই 'সিদ্ধদেহ' লাভ হবে না। "সিদ্ধদেহ" লাভের অনুকূল ভাব সমূহ "সারসিকী সেবা", "বেণু ও বপু" ইত্যাদি প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

কেবলাভক্তির সাধকগণ এই বাণীসমূহ পাঠ করে ব্রজজয়-যাত্রার মূল যে কুড়িটি প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূল ভাব তা ত্যাগ করে হরিনাম করলে তবে ব্রজে নিত্যসিদ্ধ পরিকর দেহ লাভ করে নিত্যসেবা লাভ করতে পারবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মূল কথা হচ্ছে অনর্থ মুক্ত হয়ে শুদ্ধনাম পরায়ণ গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীনাম ভজন ও শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করলে এই সিদ্ধদেহ উদিত হবে। তখন ব্রজে শ্রীরাধাশ্যামের দর্শন হবে ও নিত্যসেবা লাভ হবে। তাই প্রেমভক্তি লাভেচ্ছু শুদ্ধ ব্রজ ভজনের যাত্রীগণ! এই গ্রন্থ তোমাদের দুর্গম সংসার সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে গোলোকের প্রেম সেবানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত করাবেই করাবে। এই গ্রন্থই ব্রজাভিযানের একমাত্র অভয় ও অভ্রান্ত সঙ্গী, একমাত্র সহায় বন্ধু।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে শ্রীপাদ

শ্যামানন্দ দাস, শ্রীপাদ মদনমোহন দাস (বড়) শ্রীমান্ ব্রজদুলাল দাস ও শ্রীমতী রঞ্জনী অর্পিতা দাসী। তাদের ভজনজীবন উত্তরোত্তর উন্নতি হোক এই প্রার্থনা করি।

অবশেষে এই গ্রন্থের মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে গুরুত্ব না দিয়ে গ্রন্থের সারনির্য্যাস গ্রহণ করলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক ও সফল হবে।

নিবেদন ইতি
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপারেণু প্রার্থী
শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রীগোদ্রুম কানন কুঞ্জ
পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস
২৫ আগষ্ট ; ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধ মালা

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা নং

— ০ —

"করুণা না হলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর"—এই চিত্ত-বৃত্তিটী যখন বাস্তব ও ঐকান্তিক হয়, তখন পরমকরুণ পরতত্ত্ব উপযাচক হইয়া এরূপ ক্রন্দনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং অবরুদ্ধ হন। অযোগ্যতার সুতীব্র অনুভূতির সহিত যে অশ্রু, তাহা অজিতকে জয় করে, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করে, পূর্ণতম নিরপেক্ষকেও সাপেক্ষতম অর্থাৎ দীনবৎসল করিয়া দেয়। অশ্রুর এত বড় মূল্য যে, স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াও 'ঋণী' বলিয়া অভিমান করেন।

—০—

যিনি নিষ্কপট ভাবে কৃপার জন্য কাঙাল তাঁহার স্বাভাবিক তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জিহ্বায় সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম প্রভু নৃত্য করিতে থাকেন।

কৃপার কাঙালের জিহ্বাকে শ্রীহরিনাম প্রভু বলাৎকারে আত্মসাৎ করিয়া তদুপরি নিজ স্বেচ্ছাময় তাণ্ডব রচনা করেন এবং চিত্তকে সর্ব্বদা প্রগতিশীল বিরহবিধুর করিয়া রাখেন। 'কবে কৃষ্ণ কৃপা পাইব'—এই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসে। তাই একাধারে তাঁহার শ্রীহরির কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হইতে থাকে। মায়া তাঁহাকে কি করিয়া স্পর্শ করিবে? ইহাই মায়া জয় করিবার স্বাভাবিক উপায়।

—০—
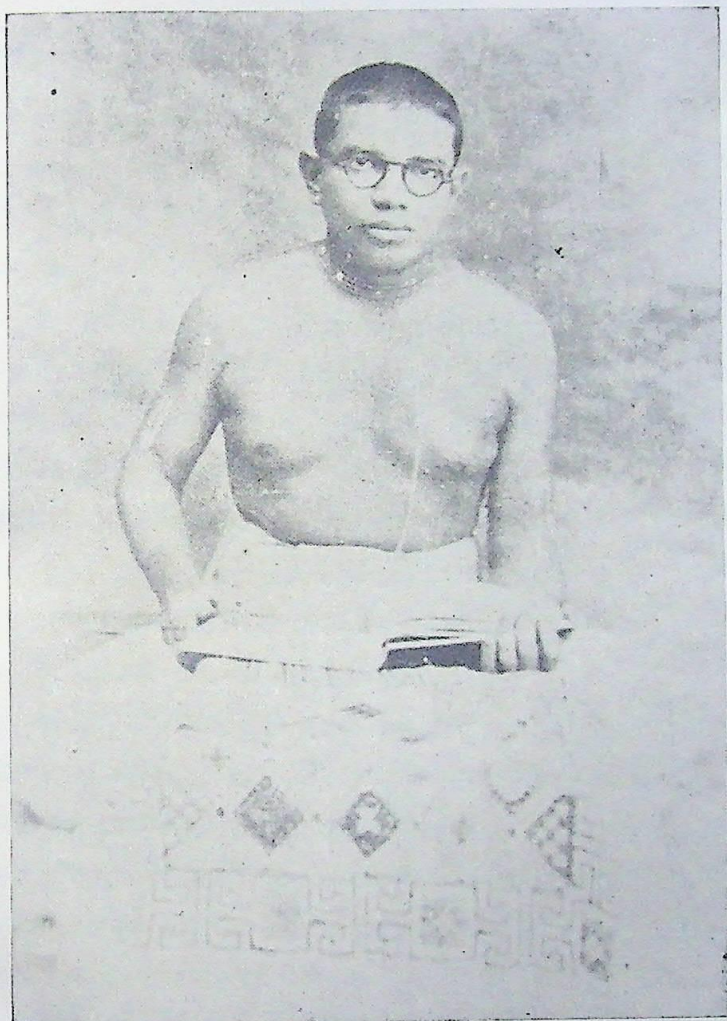
জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

সিদ্ধদেহ

যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজজনের রাগময়ী কৃষ্ণসেবায় গুরুকৃপায় স্বাভাবিকভাবে প্রলুব্ধ হন, সেই সকল নিবৃত্তানর্থ রাগানুগ ভক্ত সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা ভক্তির দ্বিবিধ অনুশীলন করিয়া থাকেন।

"বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

এই "সিদ্ধদেহ" কথাটি লইয়া অনুকরণপ্রিয় প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার বিকৃত ধারণা ও বিপত্তি ঘটিয়াছে। উপরি-উক্ত বাক্যকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ ভোগাসক্ত মনের কল্পনা বা আরোপাদিকে সিদ্ধদেহ মনে করিয়া লইতেছেন। এরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দিবার গুরুব্রুব-সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হইয়াছে। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে দু'চার আনা খরচ করিলে সিদ্ধপ্রণালী প্রদান করিবার অনেক গুরু (?) পাওয়া যায়। ইহারা কখনও অশিক্ষিত, কখনও বা অনুস্বার-বিসর্গের প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে গর্ব্বিত। ইহারা আপনাদিগকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বা

রাগানুগ বিচার-পরায়ণ বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেও ইহারা কোন-না-কোনপ্রকার সম্ভোগ-বিচারপর অনর্থযুক্ত জীব। ব্রজ-মণ্ডলের (?) সর্ব্বত্রও এরূপ জাতীয় প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়, এমন কি, ধাতুপাত্রাদি-স্পর্শ-পরিত্যাগের প্রতিষ্ঠায় স্ফীত—বিরক্ত-ব্রুব বা সিদ্ধব্রুব অনেক ব্যক্তিকে ঐরূপ অনর্থে প্রপীড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা রুচি শব্দের বিকৃত অর্থ করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, মানুষের ইচ্ছাই লোভ বা রুচির লক্ষণ। কিন্তু অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছার মধ্যে সম্ভোগের স্পৃহা যে বহুরূপিণী প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকে, ইহা তাহারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ভোগাসক্ত বা বিরক্তাভিমানী মন, 'সিদ্ধদেহ' ভাবনা করিতে পারে না। নিজের কল্পনাবলে বা পুস্তকাদি দেখিয়া তাহা হইতে কোন আদর্শ অনুকরণ করিয়া কেহ সিদ্ধদেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। রূপানুগবর পরমমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের অনর্থের অপগমে যথাকালে নির্ম্মল চেতনের সেবার নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক স্বরূপ সাধকের সিদ্ধদেহরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষার সিদ্ধিতে এই নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধদেহ গুরুপাদ-পদ্মের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তখনই সাধক সেই সিদ্ধ-দেহের ভাবনায় যোগ্যতা লাভ করেন এবং বাহ্যে সাধকদেহে অনুক্ষণ শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের শ্রীমুখে শ্রীভগবানের শ্রীনাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া অনুক্ষণ অর্থাৎ অষ্টকালীন কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। সেইরূপ অবস্থায় সাধকের ব্রজ-সেবানুভূতি-

ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য অনুভূতি থাকে না। কখনও সেই অনর্থমুক্ত সাধক গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভৌম ব্রজমণ্ডলে বাস করেন, কখনও বা ব্রজ-মণ্ডলের অভিন্ন-বপুজ্ঞানে গৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াও ব্রজভূমির অস্মিতা ও উদ্দীপনায় বিভোর থাকেন, কখনও বা সাধারণের বাহ্য দৃষ্টিতে স্থূল শরীরে ব্রজবাস না করিলেও বিশুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণসেবাপর ব্রজভূমিতে বাস করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহার কোন-প্রকার জড়ীয় রাগদ্বেষ বা ইতর বাসনার অস্মিতা থাকে না।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তব পূর্ণ কৃপা মানি॥"

রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

উপরিউক্ত দুইস্থানে যে শুদ্ধ মনের কথার উল্লেখ আছে এবং যে শুদ্ধমন বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন, তাহা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সংকল্প-বিকল্পাত্মক জড়-ভোগ ও জড়-ত্যাগ-ধর্ম্মপর অচিদাবরণে আবৃত চিদাভাস মন নহে। তাদৃশ মনে সিদ্ধদেহ ভাবনা করা যায় না। এই কথাট প্রাকৃত-সহজিয়াগণের 'মেটে' মস্তকে প্রবেশ

করে না। তাই তাহারা সগুণ পঞ্চোপাসকের 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'র ন্যায় সিদ্ধদেহ-কল্পনার চেষ্টা দেখাইয়া দ্বিতীয় প্রকার পৌত্তলিকতার আবাহন করিয়া থাকে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সিদ্ধদেহ প্রকাশের ক্রম আরও স্পষ্টতর ভাষায় জানাইয়াছেন—

"শ্রীরূপগোসাঞি শ্রীগুরুরূপেতে
শিক্ষা দিল মোর কাণে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পাবে নাম-গানে॥
কৃষ্ণনাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতন করি'।
রসনা মানসে করহ নিয়োগ
ক্রমবিধি অনুসরি'॥
ব্রজে করি বাস রাগানুগ হঞা
স্মরণ-কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল করহ যাপন
উপদেশ-সার ধর॥
হা রূপ গোঁসাই দয়া করি' কবে
দিবে দীনে ব্রজে বাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ
হইতে দাসের আশা॥"

* * *

"গুরুদেব ! কবে মোর সেই দিন হ'বে ?

মন স্থির করি' নির্জ্জনে বসিয়া

কৃষ্ণনাম গাব যবে।

সংসার-ফুকার কাণে না পশিবে,

দেহ-রোগ দূরে রবে ॥"

* * *

"নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে,

নিরন্তর নাম গাব।

আবেশে রহিয়া দেহযাত্রা করি'

তোমার করুণা পাব ॥

গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না দেখিব,

হইব বরজবাসী।

ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,

হইব রাধার দাসী ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধদেহ বা গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণের স্বাভাবিক ক্রম বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় গৌর-ব্রজবনে ভোগ্য ভেদ-দর্শনরহিত হইয়া ব্রজবাসী হইতে পারিলে তখন ধামের স্বরূপ নয়নে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইবে এবং শ্রীরাধার পাল্য কিঙ্করীত্বে লোভ হইবে। ধামের স্বরূপ—

"দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে

নিজ স্থূল পরিচয়।

নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা

নিত্য চিদানন্দময় ॥
বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব,
আনভাব না রহিবে ॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ, স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেমপ্রকরণ ॥”

উপরি-উক্ত পদাবলী হইতে জানা যায় যে, ‘সিদ্ধদেহ’ বা অপ্রাকৃত ব্রজগোপীভাব চেতনবৃত্তির পূর্ণ নির্ম্মলতা অর্থাৎ পূর্ণ সেবোন্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নতনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই লাভ হইয়া থাকে। ইতরভাব বিদূরিত হইয়া নিজসিদ্ধদেহের নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীভাব স্বভাবরূপে প্রকটনই গোপীগর্ভে জন্মলাভ। তাহাই নিজসিদ্ধদেহ, সিদ্ধনাম ও সিদ্ধরূপ, সিদ্ধবসনাদি সিদ্ধসেবার বিবিধ পর্ব্ব-প্রাপ্তির ভূমিকা।

কেহ কেহ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্যের কদর্থ করিয়া গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণের তাৎপর্য্য বিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই জন্মেই শ্রীগুরুকৃপাবলে গোপীগৃহে জন্মলাভ সম্ভব। যেমন ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও দ্বিতীয় সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ইহ জন্মেই দ্বিজ না হওয়া পর্য্যন্ত বেদপাঠে অধিকার হয় না

অথবা যেমন দৈক্ষ্যজন্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীশালগ্রাম-পূজায় অধিকার হয় না, তদ্রূপ ইহজন্মে গোপীগৃহে জন্ম লাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় অধিকার লাভ হয় না। অর্চ্চন-মার্গে যেরূপ ভূতশুদ্ধি-লাভের পর অর্চ্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাব-মার্গেও তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজগোপীভাব লাভ বা গোপীগৃহে জন্ম লাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবায় অধিকার লাভ হয় না।

'গুপ্' ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কৃষ্ণ নির্ম্মল চেতনের নিত্য-সিদ্ধ বৃত্তিকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্যসেবা-প্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি গোপীনাথ এবং নির্ম্মল চেতনের সেবাবৃত্তির বিগ্রহসমূহ গোপী। সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ কৃষ্ণের একমাত্র সংরক্ষিত-সত্ত্বস্বরূপ সেবাবৃত্তির অন্তরে জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত না হইলে কেহ রাধামাধবের সেবায় অধিকার পাইতে পারেন না।

"জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে"—দুর্গম-সঙ্গমনীর এই দুর্গমবাক্য বুঝিতে না পারিয়া এক শ্রেণীর স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায় যেরূপ "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুঃ" এই ভাগবতবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীহরিনাম-গ্রহণকারীকে পিষ্ট-পেষণ-ন্যায়ের অধীন করাইবার ইচ্ছা করেন এবং হরিনাম আশ্রয়কারী পরম মুক্ত-পুরুষকে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করাইয়া তাঁহাকে সাবিত্র সংস্কারের অধিকারী করাইতে চাহেন ; তদনুরূপ ভ্রম হইতেই 'স্থূল বা মর্ত্ত্য গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সিদ্ধদেহ লাভ হয়

না'—কেহ কেহ শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্যের দোহাই দিয়া ঐরূপ বিপর্য্যস্ত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল ভজন-রহস্য সাধারণ পুস্তকে, সাধারণ বা অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে বুঝা যায় না। রূপানুগ গুরু-পারম্পর্য্যেই এই সকল রহস্য সংরক্ষিত আছে।

সিদ্ধদেহ, সিদ্ধনাম, সিদ্ধরূপ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই লভ্য বা করায়ত্ত নহে। তাহা যে কোন গুরুব্রুব বণিকের দোকান হইতে জাগতিক দ্রবিণ বা কপটতার বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। সম্ভোগবাদী জীবের প্রচ্ছন্ন রিরংসাজাত সম্ভোগেচ্ছা-লৌল্যের বেশে সজ্জিত হইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিলেই তাহা অনর্থ-নির্ম্মুক্ত রাগানুগের রুচি নহে।

আমরা শুনিয়াছি, যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে * * * গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট সিদ্ধপ্রণালী ও অষ্টকালীয় ভজন শিক্ষালাভের আশায় উক্ত ধর্ম্মশালায় আগমন করিয়াছিলেন। ভজনশিক্ষাকামী উক্ত গোঁসাইজী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট সিদ্ধপ্রণালী পাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে প্রথম দিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আজ আমার অবসর নাই।" দ্বিতীয় দিন উক্ত গোঁসাইজী আবার সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে বাবাজী মহারাজ ঠিক সেই কথাই বলিলেন। এইরূপ যতবার উক্ত গোঁসাইজী বাবাজী মহারাজের নিকট সেই

প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন, ততবারই বাবাজী মহারাজ বলিতেন, "আমার অবসর নাই, অবসর হইলে বলিব।" অবশেষে উক্ত গোঁসাইজী বিরক্ত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। যেইদিন গোঁসাইজী চলিয়া গেলেন, সেইদিন রাত্রে বাবাজী মহারাজ নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—"একটা কাণাকড়ি হারাইলে তজ্জন্য যাহার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, এইরূপ জড়াসক্ত ব্যক্তি 'সিদ্ধ-প্রণালী' ও 'অষ্টকাল'-ভজন শিক্ষা করিতে আসিয়াছে! অষ্টকাল-ভজনের কথা পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা (?) করিলেই বা সে কিরূপে 'সিদ্ধদেহ' পাইবে? **পুস্তক দেখিয়া কেহ 'সিদ্ধদেহ' নির্ম্মাণ করিতে পারে না।** হাটে বাজারে এই সকল কথা 'বানিয়ারা' (ধর্ম্মব্যবসায়িগণ) প্রকাশ করায় জগতের অত্যন্ত অপকার হইতেছে। ইহারা সিঁড়ি চাহিয়া লইয়া আমার কৃষ্ণের দোতালার ছাদে উঠিবে (?) আর সেইখানে পুরীষ উৎসর্গ করিবে! রাধা-গোবিন্দের কুঞ্জসেবার নাম করিয়া ইহারা কুঞ্জ দূষিত করিবার ইচ্ছাই অন্তরে পোষণ করে! **ইঁচড়ে পাকা বানিয়া গুরু ও বানিয়া শিষ্যের মধ্যে আজকাল সিদ্ধপ্রণালী লইয়া যে ব্যবসা চলিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে।** তোমরা যদি মঙ্গল চাও, তবে সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে বসিয়া হরিনাম কর। নিজের মতলবে কিছু করিতে চাহিলেই মায়াপিশাচী ঘাড়ে চাপিবে। আমার কাছে কত লোকই ত' আসিল! সকলেই আমাকে ঠকাইতে আসে!"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর এই সৎসিদ্ধান্ত-পূর্ণ কথা শুনিয়া

কোন কোন ইঁচড়েপাকা ধর্ম্মব্যবসায়ী প্রা * * * প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কেন না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু প্রেয়ঃকথা না বলিয়া অনুক্ষণ শ্রেয়ঃকথা বলিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ (১৯২-১৯৩)

সর্ব্বাত্মসমপণ ও দিব্যজ্ঞানের সিদ্ধিতে এই অপ্রাকৃত-দেহ বা চিদানন্দময় সিদ্ধদেহের প্রকাশ হয়। **প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হয় না। জড় কখনও চিৎ হয় না;** পরন্তু স্বরূপদেহের প্রকাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য পুরুষদেহকে সখীদেহ বা সিদ্ধদেহ সাজাইবার প্রয়াস করিয়াছে। ইহারা 'সখীভেকি' নামে প্রচারিত। বস্তুতঃ জড়মানসদেহকে সিদ্ধদেহ সাজান' যেরূপ ভগবৎসেবার বিরুদ্ধবিচার, জড়স্থূলদেহকে 'সখী' সাজান' তদ্রূপই সেবাবিরুদ্ধ প্রাকৃত-সম্ভোগবাদ। স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহের প্রাকৃত সজ্জা, প্রাকৃত আরোপ কখনও কৃষ্ণসেবার সিদ্ধদেহ নহে; বিশেষতঃ কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য জড়পুরুষ বা জড়-স্ত্রীদেহকে 'সখী' সাজাইবার পূর্ব্বে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহারা

শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত-ভাবধারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করে নাই, তাহারা শ্রীল রঘুনাথের এই শ্লোকটি বুঝিতে পারে না।

"পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

স্তবাবলী (বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ ১৬শ শ্লোক)

হে ঈশ্বরি, তোমার পাদপদ্মযুগলের শ্রেষ্ঠ দাস্য ব্যতীত আমি কখনও অন্য কোন প্রার্থনা করি না। আমি তোমার সখীত্বও প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক এবং আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, একমাত্র তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, আমার অনুরাগ হউক।

যাঁহারা প্রাকৃত পুরুষদেহকে বাহ্য বেষ ভূষা দ্বারা সখীদেহ বা গোপীদেহ সাজাইতেছেন, তাঁহারা কেবল যে জড়কে 'চেতন', প্রাকৃতকে 'অপ্রাকৃত', বলিয়া ভীষণ অপরাধ ও অনর্থের প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা নহে, তাঁহারা অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদরূপ ভীষণ অপরাধও আবাহন করিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর বিচারানুসারে 'শ্রীরাধার দাস্যের সৌভাগ্যের জন্য অকপটে ব্যাকুল না হইয়া তাঁহারা স্বয়ং সখীত্বই (?) প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী 'প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' টীকায় ইহাকে 'অহং-গ্রহোপাসনা' বলিয়াছেন। ঐ সকল চেষ্টায় ভক্তি দূরে থাকুক, ভক্তি লোপ করিবার চেষ্টাই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান।

বহুরূপি-আত্মবঞ্চনা

'আত্মবঞ্চনা' বহুরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নিত্য মঙ্গলের পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। এই মায়াবী কখনও অমঙ্গলকে 'অমঙ্গল' বলিয়া বুঝিতে দেয় না ; কখনও কোন্‌টি প্রকৃত মঙ্গল তাহা বুঝিতে পারিলেও মঙ্গলের পথ হইতে শতহস্তীর বলে নিম্নে পাতিত করিয়া ফেলে ; কখনও মঙ্গলকে 'অমঙ্গল' বলিয়া ধারণা করায়। মূলে গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইতেই আত্মবঞ্চনা-বৃত্তিটি আমাদের নিকট বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়। তাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাই—

"শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্‌বিমুখতা-রূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাতমধুর মন্দোময় ভোগ বা ত্যাগ-রাজ্যে লইয়া যায়।"

যখন আমাদের হৃদয়ে অপরাধের প্রবল বন্যা উচ্ছলিত হয়, যখন মায়ার বিপরীত স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, তখন এই সকল উপদেশ—যাহা পূর্ব্বে শত শতবার শ্রবণের অভিনয় করিয়াছি, যে সকল কথা অপরকে সহস্রবার উপদেশ দিবার অভিনয় করিয়াছি, তাহা সব ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণ আর এক মানুষ হইয়া পড়ি। পিশাচী ঘাড়ে চাপিলে যেইরূপ মতিভ্রষ্ট হইতে হয়, অপরাধগ্রস্ত হইয়া, মায়াগ্রস্ত হইয়া সেইরূপই হইয়া পড়ি।

যে গুরু-বৈষ্ণবকে "জীবনের একমাত্র বন্ধু" জ্ঞান করিয়াছিলাম, যাঁহাদের মহিমা কোটিকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতাম, যাঁহাদের তিরস্কারকে 'আশীর্ব্বাদ' মনে করিতাম, সাধু-গুরুর চরণে অপরাধগ্রস্ত হইয়া তখন তাঁহাদিগকে স্বজনাখ্য দস্যু হইতেও অধিকতর শত্রু এবং তাঁহাদের সামান্য শাসন বা মঙ্গলোপদেশকে আমার প্রতি তাঁহাদের হিংসা বা শত্রুতা মনে করি। তাঁহাদের কীর্ত্তিত শ্রৌতবাণীসমূহও অপরাধগ্রস্ত হইলে আমারই উপর বর্ষিত কটাক্ষবাণ বা আমারই উদ্দেশ্যে কল্পিত আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়া থাকি।

যাঁহাদের সিদ্ধান্ত একমাত্র অভ্রান্ত, অকাট্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতাম, অপরাধগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে কুসিদ্ধান্ত বা অপস্বার্থপর মতবাদ বলিয়া প্রচার করি। যাঁহাদের আচার-প্রচারকে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার বিচার করিতাম, অপরাধগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের আচরণে শত সহস্র দোষ দর্শন করি, যে পরিমাণ তাঁহাদের স্তুতি করিয়াছি, তাহার কোটিগুণ নিন্দা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত হই!

আমরা অন্যাভিলাষকে হৃদয়ে পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সাধুগুরুর প্রতি যে ধার-করা শ্রদ্ধা বা মিছা-ভক্তি দেখাই, তাঁহাদের স্তাবক হইয়া অপরের সহিত সংগ্রাম পর্য্যন্ত করিয়া থাকি, সেই সকল ধার-করা ব্যাপার বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অশোধিত পারদের মত অন্যাভিলাষ ও কপটতাগুলি অবশেষে ফুটিয়া উঠে এবং আমরা স্তুতি করিবার ছদ্মবেশে যে তাহাদের

ছিদ্রানুসন্ধানই করিতাম, তাহাই প্রমাণিত হয়। আধ্যক্ষিক, অন্যাভিলাষী বা নির্ব্বিশেষবাদীর যত স্তুতি সব কপটতাময়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যতদিন **ভক্তিবিপরীত বাসনা** বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত **সদুপদেশ** দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের **কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে,** হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা **যত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর না কেন,** যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের **নিজ-কর্ম-দোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না।"**

—(সজ্জনতোষণী ১৫।১)

হৃদয়ে ভক্তিবিরুদ্ধ বাসনা অর্থাৎ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কুটিনাটী, অন্যাভিলাষ ও অপরাধ থাকিলে 'গ্রামোফনে'র ন্যায় শত শত লোককে কীর্ত্তন শুনাইয়াও, লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট হরিকথা-প্রচারের অভিনয় করিয়াও নিজে অচেতন জড়বস্তুই থাকিয়া যাইতে হয়। কখনও কখনও সাময়িক উচ্ছ্বাসরূপ স্পন্দন আমাদের চিত্তে লক্ষিত হইলেও উহা তপ্ত লৌহে জলবিন্দু-পতনের ন্যায় ত্রিতাপতপ্ত লৌহসম হৃদয়ে তন্মুহূর্ত্তেই শুকাইয়া যায়, অন্তরে স্থায়ী ভাবের উদ্বোধন করিতে পারে না। সংসারের ত্রিতাপে তপ্ত হইয়া আমরা যে হরিগুরুবৈষ্ণবের সন্ধানের ছলনা করি, তাহাতে হয় চরমে নির্ব্বিশেষবাদ, না হয় "পুনর্মূষিকো ভব" ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে পুনরায় ভোগের সংসারে প্রবিষ্ট করায়। তখন আমরা নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য ও অপরের নিকট 'সাফাই'

গাহিবার জন্য বলিয়া থাকি—“যখন হরিভজনকারী ‘হোমড়া চোমড়া’ ব্যক্তিগণেরও পতনোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তখন হরিসেবা না করিয়া মায়ার সেবা করাই ভাল. কল্পনাময় (!) কৃষ্ণের সংসার না করিয়া বাস্তব (?) মায়াব সংসার করাই ভাল !” তখন হরি-সেবাটি হইয়া দাঁড়ায় কাল্পনিক ব্যাপার, আর মায়ার সংসারই হয় বাস্তব বস্তু! এখানেও আমাদের শেষ নাই। মায়ার সংসারের পুনর্যাত্রী হইবার কালে আমরা গুরুবৈষ্ণবের চরণে যে অপরাধ করিয়া বসি, তৎফলে আমাদিগকে ভক্তিদেবী চিরতরে তাঁহার আশ্রয় হইতে ভ্রষ্ট করে। আমরা অপরাধ করিতে করিতে তখন অসুর হইয়া পড়ি এবং পৃথিবীর যাবতীয় স্পষ্ট নাস্তিক সম্প্রদায় হইতে আমাদের প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার পরিমাণ গুরুতর হইয়া পড়ে। এই সকল আত্মবঞ্চনাই সম্ভোগমদমত্ত হৃদয়ের এক একটি তাণ্ডব।

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”॥—শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণীকে একমাত্র সার করিয়া যাঁহারা বিপ্রলম্ভময়ী সুনীচতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক অনুক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে স্বরাট্ শ্রীনামপ্রভুর দ্বারে দ্বারী হইয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—এই জগতে হরিভজন ব্যাপারটী কেবল শ্রীনামপ্রভুর কৃপার জন্য সোৎকণ্ঠার প্রতীক্ষা। ভূত দেখিয়া ফেলা, কোন **‘সিদ্ধাই’** লাভ করা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসম্ভার প্রাপ্ত হওয়া, কিংবা রাজযোগিগণের ন্যায় কৃত্রিম-পন্থায় সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় রোধ করা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বা কৃষ্ণ-

প্রীতি-লাভ নহে। শ্রীনামপ্রভুর সেবার জন্য যাঁহার যতটা রুচি ও আসক্তি এবং আর্ত্তিময়ী সহিষ্ণুতা আছে, শ্রীনামের সেবা-লাভের জন্য যাঁহার যতটা বিপ্রলম্ভরসের উদয় হইয়াছে, এই জগতে তিনি ততটা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। শ্রীনামপ্রভুর সেবায় এইরূপ দৈন্যময়ী সহিষ্ণুতাকে বাধা দিবার জন্য বহুরূপিণী আত্ম-বঞ্চনা কোটি কোটি কুহক সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব সাধু সাবধান! গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে যেন কোন প্রকার অপরাধ বা অবিশ্বাস না আসে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

—:•:—

ঐকান্তিক হরিভজন

বাগ্‌দণ্ডরূপ মৌন, দেহদণ্ডরূপ চেষ্টারাহিত্য ও কৃষ্ণসেবা-চিন্তনের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য না করিলে 'গোস্বামী' হওয়া যায় না। তজ্জন্য মহাভারতে হংসগীতায় এবং শ্রীল রূপগোস্বামীর উপদেশামৃতে ত্রিদণ্ডবিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। **কেবল বাহিরের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের দ্বারা বদ্ধজীব কখনও সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয় না। কৃষ্ণভজনানুকূল জীবনযাপনেই ত্রিদণ্ড-গ্রহণের সার্থকতা। নতুবা দম্ভের জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয় জীবের হরিভজনের প্রবৃত্তি বিনাশ করে।**

ভৈক্ষ্য ত্রিবিধ—মাধুকর, অসংক্লিপ্ত ও প্রাক্‌প্রণীত। কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহকে **'মাধুকরী ভৈক্ষ্য'** বলে। উহাই ভিক্ষু-জীবনে সর্ব্বোত্তমা বৃত্তি। কোন দাতা ভিক্ষা দিবেন কি না দিবেন—না জানিয়া যে ভিক্ষা, উহাকে 'অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য' বলে। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দাতা অবশ্যই ভিক্ষা দিবেন—এই বিচারে ভিক্ষাকে 'প্রাক্প্রণীত ভৈক্ষ্য' বলে। অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা সপ্ত বিপ্র-গৃহে সম্পন্ন করিয়া তল্লব্ধ ভিক্ষার দ্বারাই নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য। শুক্লবিত্তসংগ্রহকারী ও অমেধ্যগ্রহণে বিরত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্মানকারী গৃহস্থের ভবনেই ভিক্ষা প্রার্থনীয়া। যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র কৃত্য ভগবদ্ভজনে বিমুখ, তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন না; কেননা, তাহারা নিজ ভোগের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী যথেচ্ছাচারী। তাহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া Vagrancy Actএর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ আরোপ করিবে।

ভগবদ্ভক্ত একল হইয়া একায়ন পদ্ধতি গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। বাসনা-সঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। আবার সঙ্গ-কামনায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে ইন্দ্রিয় সংযত করার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয়গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-রত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইলে বাসনাময় জন-সঙ্গ আদৃত হয় না—উহা আপনা হইতে রহিত হইবে। সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সঙ্গই ইতর-সঙ্গরহিত জানিবে। যেখানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনার উপদেশ প্রদত্ত হয়,

সেই দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধ প্রীতিলক্ষণম্॥"

—ইহাই সঙ্গবিচারে বিচার্য্য। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অনুশীলনই একল হইয়া জীবদ্দশায় ব্রজবাস। ব্রজবাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ নহে—উহাতে কোন জড়ভোগবৃত্তির কথা নাই। সকলেই ভগবৎসেবানিরত—এইরূপ দৃষ্টি হইলেই সমদর্শিতা-প্রভাবে আপনাকে ব্রজজনানুরাগী জানিতে পারা যায়। আত্মবান্ ব্যক্তিই স্বরূপস্থ। নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির নামই আত্মক্রীড়। ভগবান্ ও ভক্তে সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল-সেবাবিশিষ্ট হওয়ার নামই আত্মরত। কৃষ্ণৈকসেবাতৎপর না হইলে জীবের সমদর্শন, আত্মরত, আত্মক্রীড় ও আত্মবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। **কৃষ্ণের ও তদ্ভক্তজনের প্রতি বিদ্বেষ যেইখানে প্রবল**, তথায় **অবস্থান করিলে সঙ্গ-দোষে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থীর দুঃসঙ্গ ভক্তকে গ্রাস করে।** তখন তাহার সংযত ইন্দ্রিয় কৃষ্ণ-সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত না থাকিয়া অসংযত ও অভক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্যক্রমেই বহু-শাখগণের একায়ন-স্কন্ধ-পরিত্যাগের বাসনা হয়। সেইখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি নাই, ব্যভিচারক্রমে বহু দেবদেবীর সেবায় প্রবৃত্ত তাহার কৃষ্ণেতর বস্তুকে দেবান্তর জ্ঞান হয়। উহা ভোগেরই প্রকারভেদ। কামদেব কৃষ্ণ একমাত্র

সেবা—এই বিচার থাকিলেই জীবের অপস্বার্থপর ভোগরূপ বহু দেব-ভজন-স্পৃহা নিরস্ত হয়।

যিনি ভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচ প্রকার সেবন-ভাবযুক্ত, তিনিই বিমল বৈষ্ণব। তাঁহাতে রতিবিশিষ্ট হইলেই নির্জ্জন ভজন সম্ভব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স্ মঙ্গলরূপ ভগবান্ বা ভক্তসেবাতেই তৎপর হইবেন। আপনাকে ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগী বলিয়া ভেদবুদ্ধি করিবেন না। অনাত্মদেহ ও মনোরূপ আবরণদ্বয় যদি চিন্তনীয় বিষয় হয়, তাহা হইলেই ভেদ-বাদ উপস্থিত হয়। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদ-বাদই অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়চেষ্টাগুলিকে ধ্বংস করিয়া অভেদচিন্তায় যে জাড্য আনয়ন করে, উহাতে তাহার স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না। সর্ব্বক্ষণ অভেদ-চিন্তার মধ্যেই জড়ভোগীর ন্যায় ভেদ-চিন্তা আসিয়া তাহার ঐকান্তিক ভাবের বিপর্য্যয় করায়। ইন্দ্রিয়সকল অধোক্ষজ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে আধ্যক্ষিকগণের পরামর্শমত গুণজাত জগতে যে কৃত্রিম নির্গুণ চিন্তা, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ায় সগুণ বিচার প্রবল হইয়া পড়িবে। ত্রিগুণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান না হইলে বিবিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতর বিবেক কখনও নির্জ্জনতা আনয়ন করিবে না। বহির্জ্জগতের ভোগচিন্তারূপ বিবেক ভগবানে শরণাগতি-রহিত করায়।

জাগতিক বস্তুতে বিলাসরহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম্ম। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির

ব্যাঘাত হয়। ভোগ্য বস্তুর অপেক্ষারহিত ভগবৎপ্রীতিকামী ভগবৎসেবক ভোগ্য জগতের কোন বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগিগণ সর্ব্বদাই ভোগাভাবে বিরক্ত এবং স্বরূপজ্ঞানে বিমুখতা-হেতু জড়ভোগাপেক্ষাপ্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার বিধানের অনুগত থাকেন। ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্যধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। শ্রীচরিতামৃত-কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

—এই অবস্থা-লাভই পারমহংস্যের সুষ্ঠু বিচার।

পারমহংস্যাবস্থায় বিধিপালন ও নিষেধ-ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য বহির্জ্জগতে পালিত না হইলেও উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তত্তদ্বিষয়ে পারঙ্গতি-লাভই পারমহংস্য বিচার। আপাত-দর্শনে খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচার বুঝিতে না পারিয়া আত্মকলঙ্ক বিধান করেন।

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ"

—শ্রীরূপপাদের এই বিচারটি বুঝিতে না পারিলে অদৈব বর্ণাশ্রমেই আবদ্ধ থাকিতে হয়।

—:*:—

বেণু ও বপু

'বেণু' শব্দের সরলার্থ বাঁশী ও 'বপু' শব্দের অর্থ শরীর। বেণু বাণীর বাহন বা বাণীময়, আর বপু বস্তুর অস্তিত্বের বাহ্য বাহন বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের লক্ষ্য স্বরূপ। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অতীতরাজ্য হইতেও বেণুর গান কর্ণরন্ধ্রে তাহার সুর পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের গোচরীভূত না হইলে বপুর অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না।

পার্থিব রাজ্যে বেণু ও বপুর বৈশিষ্ট্য কতকটা এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু অপার্থিব গোলোক-রাজ্য হইতে যখন স্বয়ং ভগবদ্বস্তুর বেণু ও বপুর অবতার হয়, তখন আমরা কিভাবে বেণু ও বপুর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার যোগ্য হইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বেণু সরল বা সোজা ; কিন্তু কৃষ্ণের বপু বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গিম বা তিন জায়গায় বাঁকা। বেণু কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়কে মথিত করে। অতএব বেণুর অবতার কর্ণাঞ্জলির মধ্যে হয়। জগতেও দেখা যায় জীব-জগতের মধ্যে যাহা অত্যন্ত ক্রূর বলিয়া বিবেচিত, সেইরূপ কুটিলগতি হিংস্র সর্পকেও সাধারণ বেণুধ্বনি বশীভূত ও মুগ্ধ করিতে পারে। হয়ত' যে সর্প বপুবিশেষকে দেখিয়া শত্রুজ্ঞানে অহিংসককেও হিংসা করিয়া থাকে, সেই সর্পই সেই ব্যক্তির বেণুধ্বনি শুনিয়া আকৃষ্ট হয়, তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে ও চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে।

প্রাকৃত বপুকে আমরা চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পারি, কিন্তু বিজাতীয় চক্ষুর্দ্বারা অপ্রাকৃতবপুর দর্শন হয় না। মাংসচক্ষু লইয়া কৃষ্ণের বপু দেখা যায় না। এক দেখিতে আর এক দেখিয়া ফেলিতে হয়। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শৃগাল-বাসুদেব প্রভৃতি বহুব্যক্তি কৃষ্ণের বেণু শ্রবণ করিতে না পারিয়া কেবল মাংস-চক্ষু লইয়া কৃষ্ণবপুর আবৃতাবস্থা দর্শন করায় কৃষ্ণের কোটিকন্দর্প-নীরাজিত বপু-মাধুর্য্য দর্শন করিতে পারে নাই। অপ্রাকৃত বপুর আবরণ-স্বরূপ স্থূলত্ব ভাবই উহাদের মাংস-চক্ষুর এক একটি 'ঠুলী' প্রস্তুত করিয়াছিল। কাজেই কেবল বপু দেখিতে গিয়া অনেক সময় স্থূলত্বই আমাদের চক্ষুকে আবরণ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আচার্য্য-পাদপদ্ম বা বৈষ্ণব-পাদপদ্মের বেণু অর্থাৎ বাণীশ্রবণের পরিবর্ত্তে—তাঁহার বাণীকেই বরণ করিবার পরিবর্ত্তে যদি আমরা কেবল আমাদের মাংস-চক্ষু লইয়া তাঁহাদের বপু দর্শন করি, তাহা হইলে মধ্যপথে স্থূলত্ব বা অস্বচ্ছতা যবনিকার ন্যায় পতিত হইয়া বস্তু-দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইবে। তাই অনেকে সাধু দর্শন করিতে গিয়া মাংস-চক্ষুতে সাধুর স্থূলত্ব অর্থাৎ অসাধুত্বই দর্শন করিয়া আসেন। কারণ, যে পর্য্যন্ত আমরা শ্রবণে সাধুর বাণী বরণ না করিব, সেই পর্য্যন্ত এই চক্ষুর্দ্বারা কখনই সাধুদর্শন হইবে না। সাধুর বপু দর্শন করিতে গিয়া সাধুত্বের আবরক আমার চাক্ষুষজ্ঞানের রচিত স্থূলত্বই দর্শন করিয়া ফেলিব। কৃষ্ণের বপুর ন্যায় সাধু ও গুরুর বপুও বঙ্কিম অর্থাৎ তাহা সরলভাবে জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ

করেন না। এইজন্যই শ্রীব্যাসদেব "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" শ্লোকের দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। বপু বঙ্কিম বলিয়া আমরা বিষ্ণুর অর্চ্চাবতারে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নর-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, বিষ্ণুর পাদোদকে জলবুদ্ধি, কিংবা হয়ত গুরু, বৈষ্ণব বা আচার্য্যের নানাপ্রকার বপুগত দোষ কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে কামী, ক্রোধী, লোভী, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, মাৎসর্য্যপরায়ণ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকি! অনেক সময় আচার্য্যের আচরণ—গুরু-বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা ধারণা করিতে পারি না, বঞ্চিত হইয়া পড়ি।

মাংসচক্ষুতে বপু দেখিতে গিয়া এখনও কতকগুলি সাহিত্যিক ও আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মায়াবাদী', কখনও বা একজন পণ্ডিত, কিংবা অপণ্ডিত বিকৃতচিত্ত বা ভাবপ্রবণ ব্যক্তি মাত্র, কখনও বা ধর্ম্মপ্রচারক কিংবা সমাজ-সংস্কারক মাত্র প্রভৃতি কত কি কল্পনা করিয়া থাকেন! শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ না করিয়া যাঁহারা তাঁহার বপু বা বাহ্যবেশ দেখেন, তাঁহারা শ্রীরায় রামানন্দের নিকট ব্যঙ্গ ও দৈন্যচ্ছলে মহাপ্রভুর "মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥"—প্রভৃতি বাক্যে বঞ্চিত হইয়া মহাপ্রভুকে একদণ্ডী মায়াবাদী সন্ন্যাসী কল্পনা করেন। কেন না, তাঁহারা তাঁহাদের মাংসচক্ষুর দ্বারা মহাপ্রভুর বাহ্যবেশ দেখিয়াই বিমোহিত বা বঞ্চিত হইয়াছেন। কেহ বা মহাপ্রভুকে মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিয়াও চিকিৎসা-পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছেন! 'গৌরনাগরী' নামক এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়

মহাপ্রভুর বপুদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কিছুকাল যাবৎ জগতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সরস্বতী. তাঁহার সিদ্ধান্তবাণী তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। যিনি অপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্যে কাম-কোটি, সেই গৌরসুন্দরকে আবৃত-দর্শনে—মাংসচক্ষুতে দর্শন (?) করিতে গিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছেন। রায় রামানন্দ কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুকে মায়াবাদী জীব-বিশেষ (!!) রূপে দর্শন করে নাই, কিংবা সম্ভোগ বিগ্রহ নাগররূপেও অনুভব করেন নাই। কাঞ্চন-পঞ্চালিকার (স্বর্ণ প্রতিমা শ্রীরাধাঠাকুরাণীর) ভাবকান্তিতে সম্ভোগময় শ্যামবপুর বিভাবিতরূপ অর্থাৎ 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ কৃষ্ণের বেণু নিত্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। বেণু-মাধুর্য্য ও বপুমাধুর্য্যে তাঁহার ভেদ-জ্ঞান নাই। তিনি প্রাকৃত মাংসদৃকের ন্যায় অগ্রে বপু দেখিয়া পরে বেণু-শ্রবণের ছলনা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি গৌরসুন্দরকে বলিয়াছিলেন,—

"মোর জিহ্বা—বীণাযন্ত্র, তুমি বীণা-ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩২)

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্র-পরমানন্দমগ্নয়োঃ।
ভবেদ্ধর্ম্ম-বিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে॥

(শ্রীসঙ্ক্ষেপভাগবতামৃত ৫৩৩)

তাৎপর্য্য—যে মোহন-বেণুর ধ্বনিতে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণি-

সমূহ পরমানন্দে নিমজ্জিত হয় এবং তাহাদের ধর্ম্মবিপর্য্যাস হইয়া পড়ে অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমের ধর্ম্ম ও জঙ্গম স্থাবরের ধর্ম্ম লাভ করে।

কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রৌতবাণীকে সর্ব্বাগ্রে কর্ণ-বিভূষণ করিতে হইবে। শ্রবণ ছাড়িয়া অগ্রেই রূপদর্শনের স্পৃহা উদিত হইলে, আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কোন কালেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয় না, কেবল কৃষ্ণমায়া দর্শন হয়। যাহারা শ্রবণের পথ পরিত্যাগ করিয়া রূপদর্শনের স্পৃহায় লালায়িত, তাহারাই প্রাকৃতসহজিয়া। এই জন্য শ্রীগুরুদেব সর্ব্বাগ্রে কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন, ইহাই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বেণু-ধ্বনি বা বাণী। এই বাণী-মন্ত্রের দ্বারা মাংসচক্ষুর স্থূলত্ব-দর্শন বিদূরিত হইলে চক্ষু যখন দিব্যজ্ঞানাঞ্জনে রঞ্জিত হয়, বস্তুতঃ তখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বপুর দর্শন হইয়া থাকে।

আজ একটি নিগূঢ় কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট শ্রবণ করিয়া নিজে সতর্ক হইবার জন্য কীর্ত্তন করিতেছি। যাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহারা শুনিয়া রাখিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের সরস্বতী—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সরলা, তাহাতে বঞ্চনাবিদ্যা নাই। তাহা শ্রবণ না করিয়া যেন আচার্য্যের বপু দর্শন করিতে ধাবিত না হই। তাহাতে হয়ত বহির্ম্মুখের জন্য অনেক বঞ্চনা-কৌশলও থাকিতে পারে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বাহ্য বপু বা আচরণ মাংসচক্ষুতে দর্শন করিয়া কেহ কেহ তাহা অনুকরণ করিতে

গিয়াছিল, তাহাতে কেহ পুরীষত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল, কেহ বা শ্মশান হইতে মৃতের পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় আহরণ করিয়া উহার পরিধানকেই শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর আনুগত্য মনে করিয়াছিল! কেহ আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভোগী গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছে! শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ অনেক সময়ে অনেক অন্যাভিলাষীকে সুযোগ প্রদানের জন্য শিষ্যত্বে গ্রহণের অভিনয় বা প্রচুর স্নেহ-সৌজন্য প্রদর্শনের অভিনয়, কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসাদি করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এই সকলই মাংসচক্ষুতে বপুদর্শনের দৃষ্টান্ত; ইহা বেণু-শ্রবণের আদর্শ নহে। শ্রীচৈতন্যের সরস্বতীই শ্রবণ করিতে হইবে। **যেখানে বাণীর সহিত বপুর আদর্শের বিপর্য্যয় বা বিরোধ-প্রতীতি হয়, সেইখানে বাণীই অনুসরণীয়া।** যেমন শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই গরীয়সী, তেমন বাণী ও বপুর মধ্যে অর্থাৎ **ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও মাংসচক্ষে দৃষ্ট আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সাক্ষাৎ সিদ্ধান্তবাণীই গরীয়সী।** সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও যেন মাংসচক্ষে দৃষ্ট প্রতিহত অন্যান্য আদর্শে বঞ্চিত না হইতে হয়। ইহার মধ্যে সাধন-পথের বিশেষ নিগূঢ় রক্ষাকবচ নিহিত রহিয়াছে। **বাণী শ্রবণই আমাদের রক্ষা-মাদুলী—মাংসচক্ষের বপু-দর্শন নহে;** তাহা হয়ত' অনেক সময়ে পতনের পিচ্ছিল পথ-

প্রদর্শকও হইতে পারে। সাধু সাবধান!

সন্দেহ হইতে পারে, "যেমন বপুদর্শনের মধ্যে আধ্যক্ষিকতা বা স্থূলতা আসিয়া পড়ে, তেমন ত' বাণী-শ্রবণের মধ্যেও নানা-প্রকার আবরণ উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ স্থলে বাণী-শ্রবণের অভিনয় করিয়াও ত' আমরা বিপথগামী হইতে পারি?" একদিকে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের কতকটা সার্থকতা আছে; কিন্তু বাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, বাণী শ্রবণ করিতে করিতে স্বয়ং বাণীই তাঁহার আবরণ ও প্রতিবন্ধকগুলিকে বিনষ্ট করিয়া দেন; কিন্তু বপু দর্শন (?) করিতে করিতে মাংসচক্ষুর আবরণ নষ্ট হয় না, কেন না মাংসচক্ষু বিজাতীয় বস্তু, অপ্রাকৃত বপু কোন দিনই তাহার নিকট অবতীর্ণ হন না—তাহার গোচরীভূত হন না। কিন্তু বাণী স্বয়ংই আবরণ উন্মোচন করিয়া জীবের নির্ম্মলতা সাধন করে ও প্রতিনিয়তই যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। বপু যোগ্যব্যক্তির নিকট আত্ম-প্রকাশ করে আর বাণী বা মন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃতরাজ্যে বাণী ও বপু ভিন্ন নহে, বাণীই জীবকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাহার বপুময়ী বা বিগ্রহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করে। অযোগ্যাবস্থায় সেই বিগ্রহময়ী মূর্ত্তির কিছুতেই দর্শন হয় না, এইজন্য বপু হইতে বাণী গরীয়সী—এইজন্যই স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইতেও ভগবানের নামকে অধিকতর করুণাময় বলা হইয়াছে।

প্রাকৃত শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাকৃত শব্দে বহুত্ব, পরস্পর, স্বগতভেদ, জন্মভঙ্গাদি দোষ এবং বপু, গুণ ও ক্রিয়া হইতে ভেদ

নিহিত। প্রাকৃত শব্দ ও প্রাকৃত বপু উভয়েই জড়েন্দ্রিয়-চেষ্টার দ্বারা পরিমেয় ও জন্মমরণশীল অর্থাৎ অনিত্য। অপ্রাকৃত চেতন শব্দ তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই তাঁহার নিরন্তর সেবনপ্রবণ জিহ্বা-ধারায় প্রপন্ন কর্ণেন্দ্রিয়ে অবতীর্ণ হন এবং প্রপন্ন কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়মিত ও শোধিত চক্ষুতে সেই শব্দই স্বীয় অবতীর্ণ বপু প্রকট করেন।

তবে যাহারা বাণী-শ্রবণের অভিনয় করিতে করিতে অসহিষ্ণু হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে, যাহারা শ্রীচৈতন্যবাণীর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণীতে দীক্ষিত না হয়, যাহারা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর নিত্য সেবানুশীলন না করে, তাহারা ত' অধঃপতিত হইবেই, তাহাদের কর্ণে নিত্য অর্গল ও নানাপ্রকার মল প্রতিবন্ধক-রূপে সমুপস্থিত আছেই; তাহাদের কথা আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, নিরন্তর সরল হৃদয়ে বাণীশ্রবণ ও মাংসচক্ষে বপু দর্শনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে ? সাধুগণ বলেন, বাণীশ্রবণই সেইখানে নিয়ামক ও প্রামাণিক হইবে। কেননা, তাহা সরল, বপুর ন্যায় বঙ্কিম নহে।

বাণী বা বেণুর এমনই শক্তি ও মাধুর্য্য যে, তাহা অচেতন-প্রায় অর্থাৎ বিলুপ্ত চেতনেরও নিত্যসিদ্ধ চেতনবৃত্তির উদ্বোধন করিয়া থাকে, আবার কর্ম্ম-চঞ্চলকে নৈষ্কর্ম্ম্য মন্ত্রে (চেতনতার পরাকাষ্ঠা বা সর্ব্বোত্তম অবস্থায়) দীক্ষিত করিয়া থাকে; কিন্তু ভোগবুদ্ধিতে বপুদর্শনের স্থূলত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়কে গ্রাস করিলে

সেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে ভোগোন্মুখতা বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-চেষ্টা আনিয়া দেয়। তাই অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়া হরিকথা শ্রবণ অপেক্ষা ভগবদ্দর্শনের (?) অধিক পক্ষপাতী।

কেহ হয়ত গুরুর (?) নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন,—"আপনি কি আমাকে ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন?" এইরূপ প্রশ্নকারীর অন্তর বেণুমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। যিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্য ভগবদ্বিগ্রহের সেবার জন্য লালায়িত, গুরুদেবের নিকট তাঁহার প্রশ্ন হইবে,—"আপনি আমাকে উপদেশ দ্বারা শাসিত ও শোধিত করুন। আমাকে চক্ষুদান করুন।" হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি। সেই শ্রীহরিকে প্রথমে কর্ণ দ্বারাই দর্শন করা যায়, কর্ণ দ্বারাই তিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন, কর্ণদ্বারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবানের দর্শন কি, ভগবদ্দর্শন করা ভাল কি মন্দ, বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল না মন্দ, ইহা গুরুদ্বারা শাসিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি 'জানিয়া ফেলিয়াছি' মনে করেন, তিনি ত' গুরুর উপর গুরুগিরি করিলেন!—ইহা শিষ্যের লক্ষণ নহে—গীতার "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—বাক্যের আদর্শ নহে, বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"ও নহে; কি বেদান্ত বা শ্রুতির পথ, কি গীতা বা স্মৃতির পথ, সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বাণী-শ্রবণের জন্যই শিষ্যের অভিগমন। শিষ্যের প্রথম দর্শনীয় বিষয় 'বপু' নহে, প্রথম দর্শনীয় বিষয়—বাণী; কর্ণদ্বারা সেই বাণীর দর্শন হয়। প্রথমেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরিচালনা নাই।

সর্ব্বাগ্রে কর্ণ, কর্ণবেধ-সংস্কারই গুরুর প্রথম কার্য্য। **কর্ণই চক্ষু প্রস্তুত করিবে, বাণীই বপু দেখাইবে।** বাণীই বপুর সন্ধান দেন এবং বপুরূপে প্রকটিত হন। মাংসচক্ষু অপ্রাকৃত বপু দেখিতে পারে না বা দেখাইতে পারে না। যাহারা প্রথমেই ভগবান্‌কে দেখিব, এইরূপ ভোগবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া নিজের খিদ্‌মৎগার স্বরূপ তথাকথিত গুরুর আশ্রয়-গ্রহণকারী অর্থাৎ যাহারা গুরুভোগ-কারী (?), তাহারা তাহাদের মাংসচক্ষুর বিচারে ভূতপ্রেতজাতীয় কিংবা অন্ধকার বা শূন্যময় নির্ব্বিশেষ-জাতীয় কোন সত্তা বা ভাব যে গুরু দেখাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে "ছুয়ো দেগে দিতে পারিলে না," অর্থাৎ যে গুরু আমাকে ভগবদ্বস্তু ভোগ করাইতে পারিলেন না, তিনি গুরুই নহেন মনে করিয়া কেবল হরিকথা-কীর্ত্তনকারী অকৃত্রিম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান হইতে অন্যত্র বিচরণ করে। আর যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীই অনুক্ষণ শ্রবণাঞ্জলিতে শ্রবণ করিয়া থাকেন। যেখানে শ্রবণের সহিত দর্শনের বিরোধ উপস্থিত হয়, বাণীর সহিত বপুর বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বা চৈতন্যসরস্বতীরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই পুনরায় বলি, সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! সাধু সাবধান!!! হে দুষ্টমন, দুষ্ট ইন্দ্রিয়, বাণী-শ্রবণ ও তোমার মাংসচক্ষুতে বপু-দর্শন এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বা বিরোধ দৃষ্ট হইলে বাণীরই শরণাপন্ন হইও—অপ্রাকৃত সরস্বতীতেই আকৃষ্ট থাকিও—অপ্রাকৃত বেণুধ্বনিই তোমার অনাবৃত আত্মার অভিসারের প্রকৃত দিগ্‌দর্শন করাইবেন—বেণুমাধুর্য্যই তোমাকে

তোমার মঙ্গলের প্রগতির দিকে লইয়া যাইবেন—তুমি তোমার সাধনপথে চৈতন্যবাণীকেই তোমার ধ্রুবতারা কর।

—:*:—

সেবার খতিয়ান

তের বৎসরের অধিককাল হইল, যে মহেন্দ্রক্ষণে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী কর্ণকুহরে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অবিরত শুনিয়া আসিতেছি, 'সেবা' শব্দের অর্থ—একমাত্র অধোক্ষজ স্বরাট্ পরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণ, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোন প্রকার ছলনা, কপটতা বা ছদ্মবেশ নাই। আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছার প্রতি এইরূপ তীব্রতম কষাঘাত ও তৎসঙ্গে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির মুক্ত-প্রগ্রহবৃত্তি পরিচালনা করিবার অনুপ্রেরণা-দায়িনী বীর্য্যবতীবাণী অসংখ্য তথাকথিত ধর্ম্মগুরুর উপদেশের মধ্যে পাই নাই বলিয়াই শ্রীচৈতন্যবাণী হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে এবং সতীর্থগণের আদর্শ আচার ও প্রচারে বুঝিতে পারিয়াছিলাম—সেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম। সেই সেবা তথা-কথিত জীব-সেবা নহে, তথাকথিত আর্ত্ত-সেবা নহে, নিজের খেয়ালের সেবা নহে, মনোধর্ম্মের সেবা নহে, কপটতার সেবা নহে, পরোপদেশে পাণ্ডিত্যসূচক উক্ত বাগ্‌বৈখরীর সেবাও নহে, চালিয়াতি ও জালিয়াতির সেবা নহে;—উহা বাস্তবসত্য, অদ্বিতীয়

ভোক্তা, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় এক পরাৎপর পুরুষের সেবা। সেই সেবামন্ত্র লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শুনিয়াছিলাম,—জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেব্যের দ্বারা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অভিসন্ধিতে যে সেবার বাহ্যাকৃতি, তাহাও সেবা নহে, বরং তাহা সেবার চরণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।

সরস্বতীর সেই বাণী-বীর্য্য যে-দিন কর্ণে আহিত হইল, সেই একদিন, আর আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে আর এক দিন! আজ দেখিতেছি, মহাদেবের তেজোময় সেই চেতনবীর্য্যকে আমি কর্ণে ধারণ করিতে পারি নাই, ফেলিয়া দিয়াছি। জগতের অপ-দেবতা, কুদেবতা, ভূত-প্রেতের মাটিয়া ধাতুই আমার কর্ণে যোগ্য-স্থান পাইয়াছে!

সেবামন্দিরে প্রবেশের প্রথম মুখে সাধন-পথের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম,—"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ সঙ্গ-ত্যাগাৎ" প্রভৃতি। সরস্বতীকে কর্ণ হইতে ঝাঁটাইয়া (!) ফেলিয়া দিয়া ভূতপ্রেতের কুমন্ত্রণায় এই মন্ত্রগুলিকে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কাজে লাগাইতে ত্রুটী করি নাই। 'উৎসাহ' আমি খুবই প্রদর্শন করিতেছি! আমার উৎসাহ ও উদ্যমের আবেগে ধরিত্রীর জীব-কুল, স্বর্গের দেবগণ ত্রস্ত হইয়া উঠে! পুরাণে পাঠ করিয়াছিলাম, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ প্রভৃতি অসুরগণের উৎসাহ, উদ্যম, নিশ্চয়, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণপণায় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দেবতা ও জীব ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন! সেই আদর্শের খানিকটা ছাপ আমারও অঙ্গে লাগিয়াছে।

কিন্তু এই উদ্যম কিসের জন্য ? এত উৎসাহ কেন ? এরূপ আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিবার অদম্য চেষ্টাই বা কোথা হইতে আসিল ? হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ খোলাখুলিভাবে বিষ্ণু-বিদ্বেষ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-আহরণের জন্য মহাউদ্যম প্রদর্শন করিয়াছিল ; কিন্তু আমি ত' বিষ্ণুবিদ্বেষী নহি, আমি বৈষ্ণব,—ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রাণ, গুরুসেবার জন্য আমার রাত্রিতে নিদ্রা নাই, ভোজনের সময় নাই, সংসারের দিকে দৃক্‌পাত নাই, স্ত্রী-পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার দিকে তাকাইবার অবসর নাই, আত্মীয় স্বজনের রোগশোকে সান্ত্বনা বা পরিচর্য্যার সময় ত' আদৌ নাই-ই। আমার এই অমানুষী সেবা-বৃত্তি দেখিয়া সংসারত্যাগী বৈষ্ণবগণ গুরুসেবকের সেবা করিবার জন্য সংসারের যে সকল সেবা ছাড়িয়াছেন, সেই সকল সেবা পুনরায় আবাহন করিতেও প্রস্তুত! গুরু-সেবায় আমার এত উৎসাহ, এত উদ্যম, এত আপ্রাণ চেষ্টা!

সংসারের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া সাময়িক বিরাগী সাজিয়াছিলাম। প্রচার-কার্য্যে আমার কত উৎসাহ, বক্তৃতা ও ব্যাখ্যায় কত উদ্যম দেখাইয়াছি। আমি অবৈতনিক প্রচারক, অভিজ্ঞ সম্পাদক, পরিপক্ক লেখক, উচ্চ সাহিত্যিক, বহু প্রশংসা-পত্রপ্রাপ্ত বাগ্মী, প্রতিষ্ঠানের মূলস্তম্ভগণের অন্যতম, বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে একদিনও একমুহূর্ত্তের জন্য সময় করিয়া লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর কষ্টিপাথরে যাচাইয়া দেখিয়াছি কি আমার এই উদ্যম কিসের জন্য ? ইহা কি

আমার সেবা-চেষ্টা, না সেব্যের সমগ্রতাদ্বারা আমার প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা, আমার কনক-স্পৃহা ও আমার কামিনীলাভের সেবা-সমৃদ্ধি করাইয়া লইবার উদ্যম ?

আধুনিক যান্ত্রিক যুগের সভ্যতা সর্ব্বত্রই উদ্যমের যে বিপুল আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া জাগতিক মনীষিগণও একবাক্যে বলিয়াছেন যে, পুরুষজাতিকে বিপুল কর্ম্মোদ্যমের শক্তি সঞ্চার করিয়াছে প্রধানতঃ কামিনীজাতি, তারপর জাতরূপ ও যশোলিপ্সা। কামিনীকে সুখী করিবার জন্য যান্ত্রিক সভ্যতার যন্ত্রারূঢ়ব্যক্তিগণ কামানের গোলার সম্মুখীন হইতেছেন, জলের অতলগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন, আকাশচারী হইতেছেন, কত কি করিতেছেন! তাহাতে প্রতিষ্ঠা আছে, পশ্চাতে অর্থ আছে অর্থ থাকুক আর না-ই থাকুক, প্রতিষ্ঠা তাহাতে যে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে, তাহাতে মৃতব্যক্তিও জাগিয়া উঠিতে পারে। সভ্যজাতি স্ত্রীজাতিকে এই জন্য "শক্তিজাতি" নামে ভূষিত করিয়াছেন। কারণ যতকিছু জড়শক্তির প্রেরণা, মনীষিগণ বলেন, উহার মূল ভাণ্ডার মহামায়ার অংশভাগিনীগণের নিকটই নাকি গচ্ছিত।

কোন এক প্রত্যক্ষদর্শী লেখক বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে সৈনিকগণের হস্ত হইতে যখন ভয়ে ও বিভীষিকায় অস্ত্রশস্ত্র স্খলিত হইয়া যায়, তখন কোন সুন্দরী কামিনী যদি সেই স্থানে আগমন করিয়া সৈনিকগণের করমর্দ্দন করেন, তখনই সৈনিকগণের হৃদয়ে বিদ্যুৎসঞ্চার হয়। তাহারা নববল ও নবোৎসাহের সহিত যুদ্ধে বিপুল উদ্যম প্রকাশ করিতে থাকে! শক্তি-জাতির নিকট হইতে

সম্মান পাইবে বা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিবে, এই যে প্রচ্ছন্ন রিরংসা, তাহাই সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্ম্মুখ ত্যাগী ও ভোগী উভয় প্রকার মানবকে উদ্যমী, উৎসাহী, অদম্য কর্ম্মনিপুণ, কর্ম্ম-বিচক্ষণ করিয়া তোলে। হয়ত অনেকে একথা অস্বীকার করিবেন, ইহার ভীষণ প্রতিবাদও করিবেন; কিন্তু আমাদের ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ বিচারবুদ্ধির অজ্ঞাতসারে ছদ্মবেশী মায়া এই সকল ঘটনা মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্ঘটিত করিয়া থাকে। তাই দেখিতে পাই, এই প্রচ্ছন্ন পিপাসার উত্তেজনা যে উৎসাহ ও উদ্যমের আকাশ-পাতালভেদিনী ধ্বজা উড্ডীন করিয়া গর্ব্বস্ফীতবক্ষে জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠা, কনক বা কামিনী হইতে বঞ্চিত করাইবার অগ্নিপরীক্ষার সময়ই তাহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলে। প্রতিষ্ঠাদ্বারা pump করিতে করিতে যতক্ষণ আমাকে ফুলাইয়া রাখা যায়, ততক্ষণই আমি মহা উদ্যমী, মহাসেবক, গুরু-সেবার আদর্শ, প্রাণপাত-পরিশ্রমী, মস্ত প্রচারক, বক্তা বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে পারি; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রতিষ্ঠাটি কমিয়া যায়, তন্মুহূর্ত্তেই আমার সেই কর্ম্মের উদ্যম ম্লান হইয়া পড়ে। প্রতিষ্ঠার লাঘব যাহাতে বিন্দুমাত্রও হয়, সেইরূপ বাক্য আমার নিকট অমোঘবাণের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হয়। **আমি আত্মসাফাই করিবার ছলনায় সেই প্রতিষ্ঠার সামান্য লাঘবকে সুদে আসলে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য কখনও অভিমান, কখনও কর্ম্ম-বিরতি, কখনও নিজশক্তি-সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যসমূহ অস্ত্রশস্ত্ররূপে বাহির করিয়া ফেলি।**

তাই চৌদ্দ বৎসর পরে ভাবিতেছি, আমার উদ্যম ও উৎসাহ প্রভৃতি কি সত্য সত্যই গুরুসেবা, না আর কিছু ! কি করিতে আসিয়াছিলাম, কি করিয়াছি, ইহার হিসাব-নিকাশ ত' একদিনও নিরপেক্ষ ও সুস্থ হৃদয়ে করিলাম না !

আমি সতীর্থগণকে বলি, "তোমাদের সমালোচনা কেবল হিংসা-মূলক। তোমরা বৈষ্ণবাপরাধী !"—ইহা হয়ত' আমি স্বয়ং মুখে না বলিলেও আমার স্তাবক সম্প্রদায়-দ্বারা আকারে ইঙ্গিতে বলাইয়া থাকি এবং তাহাদের ঐরূপ চেষ্টারও গুপ্ত অনুমোদন করি এবং স্বয়ং দৈন্যের ছদ্মবেশ বা অস্ত্র লইয়া তদ্দ্বারা সমালোচকগণকে বাহ্যতঃ পরাভূত করিতে চেষ্টা করি। ইহাতে আমার "বৈষ্ণবতাও" বজায় থাকে !

আমার মৌন প্রতিবাদের ও নিজ-পক্ষ-সমর্থনের আর একটি প্রধান অবলম্বন আমার মতে স্বয়ং শ্রীগুরুপাদপদ্ম ! আমি মনে করি, শ্রীগুরুদেব যখন আমাকে সমর্থন (?) করেন বা আমার বিরুদ্ধে যখন আমার সম্মুখে বা কাগজে কলমে বাহিরে কিছু প্রকাশ করেন না, তখন নিশ্চয়ই যে সকল কার্য্য করি, তিনি তাহার অনুমোদক ও সমর্থক। তাই স্বয়ং 'চিফ্‌জাষ্টিস্‌' আমার পক্ষে ব্যারিষ্টারী করিবেন জানিয়া আমি আমার স্তাবকসম্প্রদায়ের দ্বারা আমাকে সমালোচকগণের ব্যূহ হইতে নিরাপদ্‌ রাখিতে পারি এবং "আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক" ইহা জানিয়া উদ্যম, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য ও তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের ধ্বজা উড়াইয়া আমার অভিলাষ-পূরণের অভিযানে অগ্রসর হইয়া থাকি।

শুনিয়াছি, আমার স্তাবক সম্প্রদায় সংবাদপত্রের cuttings সংগ্রহের ন্যায় আমার প্রশংসা-সূচক যাবতীয় প্রমাণের cutting গুলি সংগ্রহ করিয়া এখন হইতেই file রাখিতেছেন! ঐগুলি নাকি আমার সমালোচকগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পক্ষে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে আমার স্তাবকসম্প্রদায়ের পাশুপাত অস্ত্র হইবে! যাহা হউক, আমি যদি নিত্য-সরস্বতী শ্রবণ করিবার পরিবর্ত্তে সরস্বতীর কৃত (?) স্তুতিকেই আমার রক্ষামাহুলী মনে করিয়া থাকি, অর্থাৎ সরস্বতীর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আমার প্রতিষ্ঠা ও অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অমোঘ বর্ম্মরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি চৈতন্য-সরস্বতী শ্রবণ করিলাম কি ? না, অচৈতন্য-সরস্বতীর মন্ত্র কাণে তুলিয়া লইলাম ? আমার স্তাবকসম্প্রদায়ের ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়া যাওয়া কি আমার শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা ? হয়ত বলিব, "উহারা আমার স্তাবক বলিয়া আমি তাঁহাদের পক্ষপাতী নহি, তাঁহারা আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করেন বলিয়াই আমি তাঁহাদিগের অনুমোদক।" আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি. তাঁহারা কি বাণীর সেবক, না বপুর সেবক ? যদি তাঁহারা বাণী-বধির হইয়া কেবল 'বপু' লইয়াই অধীর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সরস্বতীর অবস্থান-ভূমিকা হইতে তাঁহারা কতদূরে অবস্থিত, তাহা সত্য সত্যই আমি হৃদয়ে সকল সময়ে দেদীপ্যমান রাখিয়াছি কি ? হয়ত' আমার বিচার আমাকে পরামর্শ দিবে, "কেবল 'বাণী-বাণী' করিয়া চীৎকার করিলেই ত হইবে না, জগতে কাজ করিতে হইলে বপু লইয়া যাঁহারা কারবার

করেন, এরূপ দুই চারিজন লোককেও সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে!" আমার এই কৌশলী বুদ্ধি সত্য সত্যই প্রশংসনীয়া; কিন্তু বপু-সেবকগণের স্তাবকতা যদি বাণীর আচার প্রচার ও আদর্শ হইতে ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্য আচার প্রচার ও আদর্শে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলে—অনবদ্যা বাণীর সঙ্গে যদি তাহাদের মিল না হয়, তবে কি মনে করিব? তখন কি ইহাই প্রমাণিত হইবে না যে, সরস্বতী বা বাণীর সম্যক্ গমন রূপ 'সঙ্গ' ত্যাগ করিয়া বাণী-বধিরগণের সঙ্গকেই "সঙ্গত্যাগাৎ" বাক্যের আদর্শ করিয়া ফেলিয়াছি?

সরস্বতী নৃসিংহদেবের বাগ্‌বিলাসিনী। নৃসিংহদেব ভক্তি-বিঘ্নবিনাশক, কৃষ্ণসেবা-সিদ্ধিদাতা, বিন্দুমাত্রও কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ প্রশ্রয় দিবার ইঙ্গিত সরস্বতীতে নাই। সরস্বতী ঐকান্তিক-সেবাময়ী। সরস্বতীর মধ্যে আপোষ বা গোঁজামিল নাই। সরস্বতী সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণ-সেবানুসন্ধানের জন্য জীব-কর্ণে বাণীবীর্য্য আধান করেন। কোন বিষয়ের বাহ্য আকার-ইঙ্গিত, স্থূল আচার-ব্যবহার, সেবার বাহ্য আকৃতি, বেশ-আবেশসমূহের সহিত যদি সেই অনবদ্যা সরস্বতীর মিল না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে না কি, সরস্বতী আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, না হয় সরস্বতীকেই আমি বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি?

অনেক সময় সরস্বতী দ্ব্যর্থ-সূচক বলিয়া মনে হয়। তখন আমাদের বঞ্চিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য-জনক নহে। তবে একথাও

সভ্য, স্বরূপের সঙ্গেই 'ছায়া' থাকে। আমি যদি অন্যাভিলাষ চাহি, তাহা হইলে ছায়া-সরস্বতীকেই বরণ করি। সরস্বতীর অনবদ্য ঐকান্তিক ও সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত কৃষ্ণসেবার সন্দেশ ব্যতীত যদি অন্য কোন প্রকার দ্ব্যর্থ-সূচক বাক্‌চাতুর্য্য আমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমি অকপটে গুরুকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিব, "প্রভো ভক্তিবিনোদবাণী ব্যতীত যেন আমি বঞ্চনা-বাণীতে মুগ্ধ না হই। যে বাণী আমার অকৃত্রিম সেবা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে আমাকে 'সেব্য' সাজাইবে, যে বাণী ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ করিবার পরিবর্ত্তে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি বিঘ্নগুলিকে আমার বরণীয় করিয়া তুলিবে, প্রভো, সেই বাণী ভক্তিবিনোদবাণী নহে—তাহা শুদ্ধা সরস্বতী নহে।"

যে শুদ্ধা সরস্বতীতে কোনপ্রকার তটস্থ অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় নাই, কোন প্রকার বঞ্চনার সমন্বয় নাই,—সেই সরস্বতী-দ্বারা ব্যারিষ্টারী করাইয়া আমি কি অন্যাভিলাষের বিন্দুবিসর্গও রক্ষা করিতে পারি? আমি হয় ত' বলিতে পারি, 'আমার অধিকার এত উচ্চ যে, লোকের নিকট অক্ষজজ্ঞানে যাহা অসামঞ্জস্যকর, তাহা আমাতে দোষ আনয়ন করিতে পারে না। আমি তেজীয়ান্, সাপ লইয়া খেলিতে পারি, তাহা সকলের অনুকরণীয় নহে, তাহা আমারই একচেটিয়া। কৃষ্ণের ন্যায় আচার ও প্রচারের মধ্যে অসামঞ্জস্য আমাতে একচেটিয়া করিতে গেলে আমি শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যময়ী আচার্য্যলীলার সেবা হইতে—শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে কি আমাকে দূরে

রাখিলাম না ?

"আচার প্রচার নামের কর তুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

—ইহাই অনবস্থা শ্রীচৈতন্যবাণী। সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণ যখন ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই বাণীকে আবৃত করিলে চলিবে কেন? আমার দুর্ব্বলতা ও অন্যাভিলাষকে 'তেজীয়সাং ন দোষায়' বলিয়া কৃষ্ণের যথেচ্ছাচারিতার সজ্জায় আবৃত করিলে কি আমিই বঞ্চিত হইব না? তাহাতে কি আমার কল্যাণ হইবে, না জগতের কল্যাণ হইবে? আমি যদি চৈতন্যবাণীর সংসার পাতিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে সেই সংসারের পাল্যবর্গের দিকে তাকাইয়াও আচার ও প্রচারে অকৃত্রিম সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। আমি নির্জন ভজনানন্দী নহি, আমি কৃষ্ণের বৃহৎ সংসারের সংসারী, আমি প্রচার-প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের সম্পাদক। আমার দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে ও আছে; কিন্তু উহাকে সকল সময়ই মহাভাগবতের বা কৃষ্ণের একচেটিয়া যথেচ্ছাচারিতার পোষাকে সজ্জিত ও সমর্থিত করাইলে তদ্দ্বারা কি সেবা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে না?

মুখর পরচর্চ্চককে মূক করিয়া দেওয়া বা নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য কর্ণকে বধির করিয়া রাখা বা 'সমালোচক মাত্রই আমার শত্রু' ভাবা এবং তাহা ভাবিয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করিবার সহায়তা করা বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চালিয়াতি ও কৌশল-দ্বারা আত্মগোপন করাই কি সরস্বতীর সেবার কুশলতা? সরস্বতীর

অভ্যর্থনার জন্য যদি কর্ণের দ্বার সর্ব্বক্ষণ অকপটে উন্মুক্ত রাখিতে না পারি, তাহা হইলে বাহিরে স্থূলতঃ সরস্বতীর বপুর বিপুল অভ্যর্থনা, অভিনন্দনের মহা আড়ম্বর দেখাইয়াও কি আমি বঞ্চিত হইব না ?

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র, বাউলিয়া বিশ্বাস প্রভৃতি কি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্থূল সেবায় কম উদ্যম দেখাইয়াছিলেন ? শ্রীবল্লভভট্ট সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌর-সুন্দরকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সবংশে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া ধন্যাতি-ধন্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্টকেও সত্যকথা বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতিষ্ঠাশা ভগবদ্ভক্তিলাভের কিরূপ অন্তরায়, তাহা মহাপ্রভু স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছিলেন।

সেই প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়াই দিই, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণের বপুসেবায় (?) যে সকল ব্যক্তি বিপুল চেষ্টা দেখাইয়াছেন, **অথচ কর্ণদ্বারা অকপটে তাঁহাদের বাণীর পরিচর্য্যা করেন নাই,** তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে বাহ্য-বিষয়ে কে কতটা জড়বিষয়ে আকৃষ্ট, অভিভূত, এমন কি পাষণ্ডতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন, তাহা কি সরস্বতী আমাদিগকে অনন্তকোটিবার বলিয়া দেন নাই ?

কএক বৎসর ধরিয়া ব্যাসপূজার অভিনন্দনে বাক্যবাগীশতার

বহর প্রদর্শন করিয়া নিজেকে কতই ত' জাহির করিলাম। অহৈতুক অকপট গুরুসেবায় কতটা অগ্রসর হইলাম বা হইয়াছি বা সেইজন্য কতটা আন্তরিক যত্নবান্ আছি, তাহা একবারও সুস্থচিত্তে ভাবিয়াছি কি? না, ব্যাসপূজার প্রত্যাভভাষণ বা ধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদ-জ্ঞাপন, উপাধি-বিতরণের মধ্যে আমার প্রশংসার ভাগ কতটা কম-বেশী হইল, অবৈতনিক সেবক আমি, সম্বৎসরের গুরুসেবার শুল্করূপে উহারই প্রতীক্ষা করিয়াছি? শ্রেষ্ঠ শুল্কটি আমার ভাগে না হইলে আমার মন উঠে নাই,— গুরুবৈষ্ণবগণ আমার মন পান নাই! আমি ঐসকল প্রশংসা আদৌ চাহি না জানাইয়া বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠাকেই চাহিয়াছি! তবে, উহা ষোল আনারও কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়, ইহাই আমার গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়, ইহা দেখিয়া আমার এক সরল-প্রাণ সতীর্থ বন্ধু বলিলেন, "সরস্বতীর বপু ত' তাঁহার বাণী হইতে অভিন্ন। অপ্রাকৃত বস্তুতে ত' দেহ-দেহি-ভেদ নাই। বপু-সেবা বাণী-সেবারই ফল-স্বরূপ। তবে আপনি 'বপু'র প্রতি এত বিমুখ কেন?" আমি 'বপু' বলিতে কি বুঝিয়াছি, তাহা এখানে না বলিলে হয় ত' আমার ঐ বন্ধুর ন্যায় অনেকেই আমার বক্তব্য বিষয়টি ধরিতে পারিবেন না, এই জন্য এখানে বলিয়া রাখি,— অপ্রাকৃত বাণী ও অপ্রাকৃত বপুতে কোন ভেদ নাই. ইহাই শ্রীচৈতন্যবাণী। যেখানে এই ভেদ-দর্শনের যবনিকার আবির্ভাব, তাহাকেই আমি 'বপু' বলিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ-সেবা

আমার উদ্দিষ্ট বপু-সেবার উদাহরণ নহে। **শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ সেবা করিলে তাঁহার বাণীর প্রতি আমরা বধির হই না**, আর বাণী-বধির হইয়া যে বপুসেবার বিপুল আড়ম্বর, তাহাতে নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ প্রবিষ্ট। **আবার নিরন্তর বাণী-শ্রবণের অভিনয়েও যে জড়ের প্রতি আকর্ষণ, তাহাও স্থূল বপুর বিক্রম।** শ্রীচৈতন্যবাণী যাহাকে 'opaque' বলেন, তাহাই আমার কথিত বপুর দৃষ্টান্ত। Non-conductor বস্তুটিই বপু অর্থাৎ আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ধাতুতে গঠিত আমার মনোরম আবরণ, যাহার মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদের হৃদয়ে সেবাচেতনতার বিজলী সঞ্চার করেন না; আমার স্বকৃত এই আবরণই অপ্রাকৃত বপুর ন্যায় প্রতিভাত আমার বিবর্ত্ত। ইহাকেই আমি 'বপু' বলি। আশা করি, ইহাতে আমার কোন ভুল থাকিলে গুরুবৈষ্ণবগণ সংশোধন করিয়া দিবেন।

আমি বলি—"কাজ! কাজ! কাজ! চাই কাজ!!" যাঁহারা শারীরিক উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতে না পারেন, বাক্যের বহ্বাড়ম্বর, শরীরের বহ্বাড়ম্বরের প্রদর্শনী খুলিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে অলস, জড়, রুগ্ন, বোকা, অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া নিম্নাধিকারী সেবক বলি বা সেবকের তালিকা হইতেই খারিজ করিয়া থাকি। আমি মনে করি, আমার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বা কনকাদি-চেষ্টার সহিত যিনি বা যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, তাঁহাকে বা তাঁহা-দিগকেই মৌখিকভাবে কিছু "কাজের লোক" বলা যাইতে পারে! আর যিনি বা যাঁহারা আমার প্রতিষ্ঠা, আমার কনক-কামিনী-

স্পৃহা-সমৃদ্ধির সহায়তার জন্য বিপুল উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতে পারেন, তিনি বা তাঁহারাই কাজের লোক। আমার 'সেরেস্তা' হইতে তাঁহারাই আন্তরিক ও অযাচিতভাবে প্রশংসা-পত্র পাইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী যে মহেন্দ্রক্ষণে অনাবিলভাবে আমার কর্ণে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে কিন্তু এই টুকুই শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, –"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়, ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্ম্যবাদে **'কাজ' বলিতে এক অনাবিল হরিকথা-শ্রবণ ও শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন।** ভাগবতধর্ম্মে অন্য কোন কাজই নাই। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারি যুগে—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে **শ্রবণ ও কীর্ত্তনই মুখ্য কাজ।** শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়িয়া অথবা শ্রবণ-কীর্ত্তনকে কার্য্যতঃ আচ্ছাদিত করিয়া, সরস্বতী-সূর্য্যের প্রণতি স্তম্ভিত বা আবৃত করিয়া কার্য্যের বিপুল আড়ম্বর সেবা নহে, তাহা ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ নহে। তাহা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভের সাধক কর্ম্মবাদ মাত্র। শ্রবণ কীর্ত্তনের ছদ্মবেশ বা নামাবলী গায় দিয়া অন্তরে অন্যাভিলাষের আগ্নেয়গিরি হইতে যে কর্ম্মাড়ম্বরের উদ্যম সজীবতার (?) অগ্নিবৃষ্টি করে, তাহা কিছুদিন পরেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।"

শ্রীচৈতন্যবাণী সেইরূপ সাময়িক উত্তেজনার কথা বলেন না। সারস্বত-শ্রবণ-সদনে যে শ্রবণ কীর্ত্তনের অবিশ্রান্ত প্রবাহ ও প্রতিষ্ঠা, তাহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান—ইহা ইট্ পাট্‌কেলের বাহ্য বপু নহে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মদন-

মোহনের মন্দিরের যে বিপুল বপু শ্রেষ্ঠিসম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর তাহাতে ঈর্ষা হইয়াছিল, সেই বাহ্য বপুর চূড়া তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীসনাতনের ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি যাহাতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, শত শত বিধর্ম্মীর দল, অসংখ্য কালাপাহাড় ঐসকল উন্নততম চূড়া ভাঙ্গিতে পারিবে না। ইট্-পাট্কেলের স্থূল বপুর মধ্যে চর্ম্মচটিকার বাসস্থান বা গঞ্জিকা-সেবকগণের বিশ্রামস্থান বা অক্ষক্রীড়াগার হইতে পারে বা হইয়াছে ; কিন্তু রসামৃতসিন্ধুর বাণীতে—বৈষ্ণবতোষণীর সরস্বতীতে কলি বা মায়ার কোন স্থান নাই। তাহাতে আছে – এক অদ্বিতীয় ভোক্তা, এক নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, এক স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য অকৃত্রিম শ্রবণ-কীর্ত্তনের উৎসাহ ও উদ্যম।

'সব প্রতিষ্ঠা আমার চাই', 'সব কনক আমারই প্রয়োজন'—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া সেবার উদ্যম বা সেবায় উৎসাহ-প্রকাশ কি সেবা, না কৃষ্ণের অভিনয়ের পাঠ-গ্রহণের আন্তরিক পিপাসা? বাহ্য উদ্যম ও উৎসাহ দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমার সেবার বিপুলত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন না। কতটা নিষ্কপটে সরস্বতীর কীর্ত্তন করি, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য কতটা আন্তরিক ব্যাকুল ও প্রয়াসী হই, শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে আমার হৃদয়ে চেতন-বিলাসের নূতন নূতন কতটা স্ফূর্ত্তি কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতীর সেবক বিচার করিবেন।

সরস্বতীর বঞ্চনায় কতটা বঞ্চিত হইয়া তাহা দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইয়াছি ও লইতেছি, কয়ঝুড়ি প্রশংসা-পত্র ভেট পাইয়াছি, কতগুলি উপাধি ও উপায়ন পাইয়াছি, কতটা লোক-পূজা, সাদর-সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছি, কতটা জাগতিক সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতীর সেবক বিচার করিবেন না। রুগ্ন হই, সুস্থ হই, জাগতিক হিসাবে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হই বা কর্ম্মনিপুণ হই, মূর্খ হই বা পণ্ডিত হই— "সরস্বতী" বলিতে যাহা, সেই নৃসিংহবাগ্‌বিলাসিনী, বাগীশা— সেই শ্রীচৈতন্যবাণী, তাহা যতটা নিষ্কপটভাবে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিব, তজ্জন্য যত আন্তরিক উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য ও তত্তৎকর্ম্ম-প্রবৃত্ত হইব, ততটাই আমি সরস্বতীর প্রকৃত সেবক। যে সরস্বতী আমার কর্ণে এই মন্ত্রবীর্য্য দান করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন কর্ণ হইতে ঝাড়িয়া না ফেলি। আজ চৌদ্দ বৎসর পরে বৈষ্ণবগণের চরণে, সতীর্থগণের পাদপদ্মে এবং শ্রীগুরুদেবের অশোক, অভয়, অমৃতাধার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণারবিন্দে এই প্রার্থনা।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি, আমি নাকি গোত্রান্তরিত হইয়াছি। এইজন্য তথাকথিত সামাজিকগণের সহিত কতই না বাগ্‌যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ করিতে হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর কাল স্বামিসেবার ফলেও যদি সুসন্তান-সম্ভাবনা না হয়, তবে কি জানিতে হইবে? পুরুষাভিমানের প্রাবল্যই ইহার মূল কারণ নহে কি? ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিতে শুনিয়াছিলাম,—

"ছোড়ত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান ॥

বরজ বিপিনে সখী-সাথ ।
সেবন করবু' রাধানাথ ॥"

কিন্তু পুরুষাভিমান লইয়া মাথুরমণ্ডলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিতরিত ব্রজভজনের কথা কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছি, মনে করিয়াছি! বরং অন্যান্য বিচারের কথা অপেক্ষা অর্থ-প্রবৃত্তির কথা অধিকতর বুদ্ধিগম্য বলিয়াই মনে ভাবি! এইরূপ প্রবল পুরুষাভিমান লইয়াই কি অষ্টকাললীলায় প্রবেশাধিকার পাইব? প্রতিষ্ঠা পয়ঃপ্রণালীতে পতিত থাকিয়া কি 'সিদ্ধপ্রণালী'র সন্ধান পাইব? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার ধুর বহন করিয়া কি গান্ধর্ব্বিকার স্বযূথে শ্রীললিতার গণে গণিত হইতে পারিব? কি করিয়াই বা শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগা যাবটগ্রাম-বাসিনী চিদানন্দময়ী কৃষ্ণযোষিৎ হইতে পারিব? সিদ্ধ-দেহ, সিদ্ধ-নাম-রূপ-বয়সাদি একাদশটি পর্ব্ব কি করিয়াই বা প্রকাশিত হইবে? প্রাকৃত নামের (প্রতিষ্ঠার) ভজন হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে কি করিয়াই বা 'মঞ্জরী' নাম প্রাপ্ত হইব? জড় হাড়-মাংসের রূপে মুগ্ধ থাকিলে কি করিয়াই বা শ্রীরূপের পাল্য কৃষ্ণকামোদ্দীপক সেবাময়-রূপ প্রকাশিত হইবে? আমি ক্রমে ক্রমে এত কুরূপ-গ্রস্ত হইতেছি যে, কৃষ্ণকামের পরিবর্ত্তে নিজেই প্রাকৃতকামে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছি। আমি এতকাল কি আত্মবঞ্চনা ও কৃষ্ণবঞ্চনাই করিলাম? কোথায় প্রাকৃত আর্য্যজন-বঞ্চনা করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কি আচার্য্য-বঞ্চনা করিলাম? কোথায় প্রাকৃত পতি-বঞ্চনা করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কি কৃষ্ণবঞ্চনা করিয়া

চিরবঞ্চিত হইলাম ?

আমার দিন কি চিরকাল এইভাবেই যাইবে ? আখেরের যতই পাকা বন্দোবস্ত করিয়া থাকি না কেন, চালাকি দ্বারা কি চেতন-রাজ্য জয় করিতে পারিব, সরস্বতীকে কি বোকা বানাইতে পারিব ? আমার বিমুখতা ও তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমার অতিচালাকি দেখিয়া ভক্তিবিনোদবাণী যেন ক্রমে ক্রমে স্তব্ধভাব ও জড় ভাব অবলম্বন করিতেছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু একদিন এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'শ্রীগৌর-বিমুখভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব
ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
বাতব্যাধি-ছলে মৌনী তবে ॥
অবলম্বি' জড় ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তি-শূন্য ধরা, দেখি প্রকাশিল জরা,
অন্তর দশায় ভজে সুখে ॥"

আমি চালকলার গল্প, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সন্দেশ চাহি দেখিয়া তিনি সেই সকল কথা ও তৎসাধক উপায় ও উপেয় দ্বারাই আমাকে বঞ্চনা করিয়া স্বীয় বীর্য্যবতী চেতনময় বাণীকে সংগোপন করিতেছেন। আমি যখন মুক্তপ্রাণ ও মুক্তপিপাসা লইয়া প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন আমার নিকট তাঁহার এই আত্মগোপন-ভাব প্রকাশিত হয় নাই—আমার মন-রাখা-কথা, দুনিয়ার সহিত

আপোষ করিয়া চলিবার কথা কোন দিনই তাঁহার অনবদ্য বাণীতে শ্রবণ করি নাই।

সাবধান! অমানিশা ঘনাইয়া আসিতেছে! 'সাধু সাবধানে'র ধ্বনিও যেন পূর্ব্বের ন্যায় মুক্তপ্রাণে দিতে পারিতেছি না। কেন না, নিজেই অসাবধান হইয়া পড়িয়াছি। ভুলিয়া গিয়াছি সেই সতর্কবাণী—"Take care swindlers, thieves. pick-pockets are abundant।" সূর্য্য অস্তমিত হইলেই দস্যু, তস্কর, পকেটমার, বাটোয়ার যাহারা আমার অতিনিকটে চতুস্পার্শ্বেই লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া গলা টিপিবে। কত পাষণ্ডতা, কতপ্রকার নাস্তিকতা, কতপ্রকার কপটতা, কতপ্রকার কুটিনাটি, কত অসংখ্যপ্রকারের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশার মূর্ত্তি, কত প্রকার লাম্পট্য-সুবিধাবাদ কেবল আচার্য্য-ভাস্করের অস্তাচল-গমনের প্রতীক্ষা করিয়া যেন পিপাসিত প্রাণে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে! গোলোকের যে কৃপারশ্মি আমার ন্যায় কুলাঙ্গারের ভাগ্যদোষে অস্তাচলে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সতর্কসঙ্কেত দিনান্তেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে কি? কেবল ত' কাজে ব্যস্ত, না হয় আলস্যে প্রমত্ত! এ কাজই বা কেন, আর আলস্যই বা কেন? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার প্রেরণায় কর্ম্মতৎপরতা ও কর্ম্মজড়ত্ব—উভয়ই এক নহে কি? শ্রীচৈতন্যবাণীর সেই মনঃশিক্ষার বড় আদরের গানটি, যাহা আমারই জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহা কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই ভুলিয়া গেলাম? শ্রীল রঘুনাথের শিক্ষামন্ত্রত' বহু আগেই জলে

ভাসাইয়া দিয়াছি।

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম
যতকাল করিবে নর্ত্তন।
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি, প্রভুপ্রেষ্ঠ পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ-প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥"

'তদর্থে যতন'কে 'কৃষ্ণার্থে যত্ন' না বুঝিয়া যদি 'শ্বপচিনীর অ[illegible] যত্ন' বুঝি, তাহা হইলে প্রভুপ্রেষ্ঠের পদ ধারণ করিতে পারিব না। প্রভু-সেনাপতির বিপুল বাহ্য সেবার ছলে তাঁহার বাণীতে উদাসী হইলে তাঁহার বিক্রম আমার অনর্থরোগ বিদূরিত করিবে না। আমাকে অকপটে ক্রন্দন করিতে হইবে ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভক্তি-বিনোদবাণীর নিকট আমার মঙ্গল যাচ্ঞা করিতে হইবে—বা[illegible] শ্রবণ করিতে হইবে।

আমার কপটতার খতিয়ান আংশিকভাবে আজ এখানে শেষ করিলাম। তের বৎসরের হিসাব একনিঃশ্বাসে শেষ ক[illegible] অসম্ভব। তারপর মায়াদেবীর অনেক চর আছে, যাহারা খতিয়া[illegible] প্রস্তুত করিবার সময় আমার কপটতাগুলিকে আচ্ছাদন করিবা[illegible]

অনেকপ্রকার পরামর্শ দিয়াছে। তাহাদের প্রভাবে কতটা প্রভা-বান্বিত হইয়াছি, বলিতে পারি না।

এইবার আর একটি কথা বলিয়া আমার খতিয়ান বন্ধ করিব। সময় সময় আমাকে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমি নাকি ব্যক্তিগত দৈন্যের ছলনায় এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিয়া অপরব্যক্তি-গণের উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়া থাকি। তাঁহাদের এই উক্তি আমার প্রতিষ্ঠাশার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আরও ইন্ধন প্রদান করে। অর্থাৎ আমি লোকের নিকট আমাকে ঐ সকল দোষ হইতে মুক্ত বলিয়া স্থাপন করিতে পারি এবং চালাকিদ্বারা অন্যের ঘাড়ে দোষগুলি চাপাইয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারি। কিন্তু আজ বড় দুঃখে, বড় ব্যথিত হৃদয়ে এই কথাগুলি বলিতেছি। আমার যশোলিপ্সা-রোগের লক্ষণ আমাকে ঐরূপ অনেক চালাকি শিক্ষা দিয়াছে বটে ; তবে আমার যে সকল অনর্থরোগের লক্ষণ আমাতে বর্ত্তমান আছে ও ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা আমার শুভানুধ্যায়ী গুরুবর্গ, ঐকান্তিক ভক্তি-বিনোদবাণীর একনিষ্ঠ সেবকগণ আমাকে ধরাইয়া দিয়াছেন। তাহা হয়ত গোপন করিয়া রাখিলে আমি ঐসকল কথা ভুলিয়া যাইতে পারি কিম্বা লোকের নিকট 'সাধু' সাজিয়া অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ও নিজকেও বঞ্চনা করিতে পারি,—এই জন্যই আমার স্বরূপ প্রচার করিয়া দিলাম। তোমরা সকলে জানিয়া রাখ, আমি এইরূপ কুৎসিতরোগের রোগী, আমার ঐসকল রোগকে 'বৈষ্ণবতা' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইও না। আমার দুর্ব্বলতা—

কেবল দুর্ব্বলতা নহে, সঞ্চিত ও সযত্নে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট অমার্জ্জনীয় অপরাধ ও পাপগুলি যেন ভক্তিবিনোদবাণীর আদর্শকে খর্ব্ব না করে। যদি এই সেবাটুকুও আমি পরোক্ষভাবে করিতে পারি, তবে আমি আমার এই খতিয়ান লেখা সার্থক হইল মনে করিব।

আর একটি কথা বলি, আমার কুৎসিত রোগ দেখিয়া তোমাদের গুরুসেবা হইতে বিন্দুমাত্রও নিরুৎসাহ হইবার কিছু নাই। বরং গৌড়ীয়-হাসপাতালে চৌদ্দ বৎসরকাল ঔষধ পথ্য গ্রহণের অভিনয়কারীও নিষ্কপট না হইলে মায়াদেবীর বঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইতে পারে না, ইহা জানিয়া মঙ্গলকামিগণ কোটিগুণ উৎসাহে গুরু-গৌড়ীয়ের সেবা করিবেন। বাস্তব সত্যে দোষ নাই—চেতনে অচেতনের ক্রিয়া নাই ;—দোষ আমার নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের। অচেতনতা আমার অনাদি-বহির্ম্মুখতার উপরই প্রভাব বিস্তার করে। এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীব কোটি অমঙ্গল, বিঘ্ন ও কণ্টকরাশির মধ্যেও সেবায় উৎসাহহীন হন না, বরং সেবার প্রগতি তাঁহাতে আরও প্রবলতরভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সুতরাং ভোগী ও অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ন্যায় আমি যেন পাষণ্ড ও নাস্তিক না হইয়া পড়ি, আমি যেন অতিবাড়ী না হই, আমি যেন 'হাম্ খোদাই' মত অবলম্বন না করি, শাসনের পথ ছাড়িয়া আমি যেন নিজে স্বতন্ত্র দলপতি হইবার বিন্দুমাত্রও পাষণ্ডতা হৃদয়ের কোণে স্থান না দিই। তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ

কর, যেন আমি কোটিগুণ বাস্তব অকৃত্রিম উৎসাহে অনবদ্যা ভক্তি-বিনোদবাণীর সেবা করিতে পারি। বাণীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সঙ্গে যেন আমার উৎসাহ বা উদ্যম বর্দ্ধিত না হয়। লোক দেখাইবার জন্য আমার কোন চেষ্টা যেন ধাবিত না হয়। আর বিনোদবাণীকে যেন আমি আমার ইন্দ্রিয়-বিনোদনের কার্য্যে না লাগাই। আজ এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও সকাতর প্রার্থনাটুকু লইয়াই আমি আমার খতিয়ানের মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

—:*:—

অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা

ভজন-পথে 'অসম্ভাবনা' ও 'বিপরীত ভাবনা' এই দুইটীই প্রধান অন্তরায়। অনেক সময় কপট-দৈন্য অসম্ভাবনার ছদ্মবেশে উদিত হয়। 'আমার হরিভজন হইল না, আমার অনর্থ গেল না, আমার দেহারামতা, গেহারামতা দূর হইল না, আমার কিছুই হইল না, আমার বৃথা-জীবন চলিয়া গেল'—এইরূপ অনেক আক্ষেপ অনেক সময় অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহারাও এইরূপ দৈন্য করিয়া থাকেন; আবার যাহারা কিছুতেই হরিভজন করিবে না, কিছুতেই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না, কিছুতেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে আত্ম-নিবেদন করিবে না,—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া রহিয়াছে,

তাহারাও ঐরূপই আক্ষেপের অভিনয় করিয়া থাকে। 'আমি কিছুতেই নোঙ্গর তুলিব না',—এইরূপ সঙ্কল্পকেই 'বিপরীত ভাবনা' বলে। বিপরীত-ভাবনাময়ী 'অসম্ভাবনা'ই কপট-দৈন্য বা আত্ম-বঞ্চনা; যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ অকৃত্রিম অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার হরিভজন হইতেছে না, তিনি তৎক্ষণাৎ 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিবার জন্যও সুদৃঢ়-সঙ্কল্প হইবেন; নতুবা, কেবল 'আমার কিছু হইল না'— মুখে এইরূপ বলিয়া নিজের অনর্থের উপর চূণকাম করিয়া দৈন্যের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার কপট-অভিসন্ধিই হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে, ইহা প্রমাণিত হইবে। উহাতে হরিভজনে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হওয়া যাইবে না; বরং হরিভজন হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া কপটতায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। যাঁহার সত্য-সত্যই হৃদয়ে নিষ্কপট হরিভজনের জন্য আর্ত্তি ও নিজের দুর্ব্বলতা, অসামর্থ্য বা অনর্থের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগেও যত্নবান্ হইবেন। 'বিপরীত ভাবনা'রূপ অর্গল খুলিয়া না দিলে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপালোক কিছুতেই হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। 'বিপরীত ভাবনা' সংরক্ষণ ও পোষণ করিয়া কেবল মৌখিকভাবে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-যাচ্ঞার অভিনয় কৃপা গ্রহণ না করিবারই প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি। স্বতন্ত্র জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে থাকিবে, বিমুখ থাকিবার সুদৃঢ়সঙ্কল্প ও ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা করিবে, বিমুখতার যাবতীয় অনুকূল অনুশীলন করিতে থাকিবে, অথচ 'আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইল না,' বা 'আমার কিছুই

হইল না',—এইরূপ বলিলেই কি তাহার মঙ্গল হইয়া যাইবে ? জীব কি অচেতন জড়পদার্থ ? অথবা কি কেবল হরিসেবার সময়েই তাহার অস্বতন্ত্রতা ? অন্য সময় ত' তাহার কোনরূপ যত্নের ত্রুটি লক্ষিত হয় না। যদি কেহ বলেন যে, অমুক স্থানে গেলে এখনই লক্ষমুদ্রা পাওয়া যাইবে এবং তাহা পাওয়া সুনিশ্চিত, তাহা হইলে আমরা সমস্ত 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রয়োজন-লাভে কিরূপ তৎপর হইয়া থাকি ! কিন্তু হরিভজনের সময় আমাদের সেইরূপ উৎসাহ নাই কেন ?

অনেকের মুখেই 'অসম্ভাবনা'র কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন। সকলেই 'কিছু হইল না, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইল না' বলিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করিব না বলিয়া হৃদয়-গুহায় লুক্কায়িত যে প্রচ্ছন্ন সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়-বৃত্তি রহিয়াছে, তাহা কেহই পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কেহ কেহ বলেন, 'পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারি না।' কিন্তু মহাজনগণ বলেন—'যদি সেই চেষ্টা নিষ্কপট ও আন্তরিক হয়, তবে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেইখানে প্রভূত বল দান করেন। আমরা কপট, মুখে বলি, গৃহব্রতধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ; কিন্তু কার্য্যতঃ উহাকেই সযত্নে পোষণ করিব, হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প-বিশিষ্ট। কেবল শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট কপটভাবে কৃপা-প্রার্থনা বা কৃত্রিম-দৈন্য-প্রদর্শনের দ্বারা মঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহারা যে 'স্বতন্ত্রতা' মহারত্ন দান করিয়াছেন,

তাঁহাদের কৃপায় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যিনি স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, 'বিপরীত ভাবনা' দূরে পরিহার করেন, তিনিই শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করেন। এই বিপরীত ভাবনা পরিত্যাগ করার নামই—'সাধন'। সেবাই—'কৃপা'। সেবোন্মুখতা ব্যতীত কৃপা লাভ হয় না। সেবোন্মুতাবিহীন কৃপা কপট-কৃপা বা বঞ্চনা-মাত্র। যাহারা 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ না করিয়া কৃপা-প্রার্থনার অভিনয় করে, তাহারা ভক্ত্যেতর বিষয়ের দ্বারা বঞ্চিত হয়। 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিয়া যে কৃপার প্রার্থনা ও আত্মদৈন্য, তাহাতেই ভজন-পথে দ্রুত অগ্রগতি ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। সাধক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিয়া সুদৈন্য ও সারল্যের সহিত ভক্তিপথে অগ্রসর হইবেন।

—:*:—

অকিঞ্চনের রূপ

যাঁহার কিছু নাই, তাঁহাকে 'অকিঞ্চন' বলা হয়। ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে যাঁহার কোনপ্রকার জড়ীয় অভিমান নাই,—তিনিই 'অকিঞ্চন'।

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।"

—চৈঃ চঃ অ ২০।১২

—ইহাই অকিঞ্চনতার যথার্থ স্বরূপ। উত্তম জন্ম বা কুল, ঐশ্বর্য্য বা ধন দৌলত, শ্রুত অর্থাৎ পাণ্ডিত্য, শ্রী অর্থাৎ জড়ীয় রূপ—এই সকল বাহ্যদৃষ্টিতে থাকা বা না থাকা সত্ত্বেও যাঁহার তত্তদ্বস্তুর অস্তিত্ব বা অভাবে কোনপ্রকার জড়ের অভিমান নাই, কেবল শ্রীহরিপাদপদ্মে যাঁহার ঐকান্তিকী রতি ও প্রীতি তিনিই যথার্থ 'অকিঞ্চন'।

'আমি কুলীন', 'আমি ধনী', 'আমি পণ্ডিত', 'আমি রূপবান্' —এইরূপ অভিমান যেইরূপ অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ বিচার, তদ্রূপ 'আমি উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই', 'আমার অর্থ নাই', 'আমি অতি দরিদ্র', 'আমার পাণ্ডিত্য নাই', 'আমার সৌন্দর্য্য নাই'—এইরূপ অভাববোধও অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ বৃত্তি। 'অকিঞ্চন' জড়ীয় সদ্ভাব বা অসদ্ভাবের মোহে মুগ্ধ নহেন। 'অকিঞ্চন জড়-মায়ামরুর পথিক নহেন, অথবা জড়ের কোন বস্তুর অভাবে—শোকে মুহ্যমান নহেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে "বড় আমি" অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ বিচার, তাহা বিরূপের কুরূপ।

স্বরূপের রূপই—অকিঞ্চনতা। বিরূপের কুরূপই—দাম্ভিকতা। অকিঞ্চনতা—সুশ্রী; দাম্ভিকতা—বিশ্রী। **অকিঞ্চনই—রূপবান্ —রূপাশ্রিত। শরণাগত-অকিঞ্চনই পরমহংস।** অকিঞ্চন না হইলে নিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ জীবকে 'অকিঞ্চন' করিয়া ব্রজের পথে লইয়া যান। জাহ্নবা ও নিত্যানন্দ অকিঞ্চনের সেবার রূপে আকৃষ্ট হইয়া জীবকে শ্রীরূপের সমীপে লইয়া যান। শ্রীরূপ তখন ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবা প্রদান করেন।

দাম্ভিকের পৈশাচিক মূর্ত্তি কখনই হরিগুরুবৈষ্ণব দেখিতে চাহে না। দাম্ভিক নিজে নিজেই ক্লেশ পায়। দাম্ভিকতা পর-ব্যোমে বা তদূর্দ্ধে যাইতে পারেন না।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবীররাঘব প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"নিষ্কাম" বৈষ্ণবের **২৬টি লক্ষণের** মধ্যে **'অকিঞ্চনতা'** একটি লক্ষণ। ঐ ২৬টি লক্ষণের মধ্যে আবার 'কৃষ্ণৈক-শরণত্বই'—স্বরূপ-**লক্ষণ**। 'কৃষ্ণৈকশরণত্ব' ও 'অকিঞ্চনতা' একই তাৎপর্য্যপর। 'অকিঞ্চন' হইলেই 'কৃষ্ণৈকশরণ' হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীসনাতন-শিক্ষায় উক্ত হইয়াছে,—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
'অকিঞ্চন' হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥
শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥"

—চৈ: চঃ মধ্য ২২।৯০, ৯৬

শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তির দ্বারা অকিঞ্চনই যে পরমহংস, অকিঞ্চনই যে কৃষ্ণৈকশরণ—ইহা প্রমাণিত হয়। 'অকিঞ্চন-ভক্ত' ও 'শরণাগত-ভক্ত'—এই দুইয়ের একই লক্ষণ। ইঁহাদের মধ্যে শরণাগতের 'আত্মসমপণ' রূপ একটি লক্ষণ অধিক। ভাগবতীয় সিদ্ধান্তে পরমহংসের অন্য কোন রূপ নাই। পরমহংস—অকিঞ্চন ও কৃষ্ণৈকশরণ। **যিনি কৃষ্ণৈকশরণ তিনিই যথার্থ পরম-হংস পদবাচ্য**। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী—ইঁহারা

কেহ কর্ম্মের শরণাপন্ন, কেহ নির্ভেদ জ্ঞানের, কেহ বা যোগের, কেহ বা ব্রতের, কেহ বা তপস্যার শরণাপন্ন বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণাপন্ন নহেন। এইজন্য তাঁহারা 'অকিঞ্চন' বা 'পরমহংস' পদবাচ্যও নহেন। তাই শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৪৯

"তৃণাদপি সুনীচ", "তরোরপি সহিষ্ণু", "অমানী মানদ", "সর্ব্বদাই হরিকীর্ত্তন-রত"— ইহাই অকিঞ্চনের 'রূপ'।

যাহারা জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমানে দৃপ্ত, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ত্যাগ বৈরাগ্যের দম্ভে দাম্ভিক এমন কি, যাহাদের তৃণের মত সামান্যভাবে মাথা উচু করিয়া থাকিবার চিত্তবৃত্তি আছে, তাহারা সকলেই বিরজাতে ডুবিয়া যাইবে। তৃণ হইতে সুনীচ বস্তুটি কি? ধূলিই তৃণ হইতেও সুনীচ। অকিঞ্চন আপনাকে সেই 'ধূলি' জ্ঞান করেন। কিসের ধূলি? প্রপঞ্চের 'ধূলি' নহে—শ্রীধামের ধূলি—তদ্রূপবৈভবের ধূলি—অপ্রাকৃত হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি। অকিঞ্চনের রূপ বা স্বরূপই—কৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলি। তাই শ্রীগৌর-সুন্দর অকিঞ্চনের রূপ তাঁহার গানে গাহিয়াছেন,—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত **ধূলী**-সদৃশং বিচিন্তয়॥
তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥

কৃপা করি' কর মোরে পদধূলী-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।৩২-৩৪

আশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত বিষয়-বিগ্রহের পদধূলি, শ্রীরূপের পদধূলি, বৈষ্ণবের পদধূলিরূপে অভিমানই—অকিঞ্চনের 'অভিমান'। আশ্রয়বিগ্রহের পদধূলিতে আত্মবোধই তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপের পাদপদ্মের ধূলিত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বীয় অসমোর্দ্ধ অকিঞ্চনতার রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ!
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,"

শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতেও আমরা শুনিয়াছি,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

—ভাঃ ৭।৫।৩২

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহৎ-বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ ব্যক্তিগণ অভিষিক্ত না হন, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের

পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না, (সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসার-বাসনাও অপগত হয় না,) বিশেষতঃ অনর্থরূপ সংসারের নিবৃত্তিই সেই ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শিনী মতির একমাত্র তাৎপর্য্য।

নিষ্কিঞ্চনের পদধূলির আশ্রিত হওয়াই মানব-জীবনের প্রয়োজনের পরাকাষ্ঠা লাভ। নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণের পাদপদ্ম-সংলগ্ন ধূলিগণও পরমহংস ও অকিঞ্চন। তাঁহাদের সেই স্বরূপের ভূষণের নাম 'দৈন্য'। অকিঞ্চনগণ 'দৈন্য' ও 'সহিষ্ণুতা'র অলঙ্কার পরিধান করেন। অকিঞ্চনগণ পূর্ব্ব-নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদধূলির মুকুট পরিধান করিয়া বৈষ্ণবসাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম-পদে অধিষ্ঠিত হন।

"বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥"

—ইহাই অকিঞ্চনের ধর্ম্ম। অকিঞ্চনগণের স্বভাব নিম্নলিখিত একটি শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

"ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুখণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তরূপং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে সজ্জনানাম্॥"

চন্দনকে যতই ঘর্ষণ করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার সৌরভের ক্ষয় না হইয়া বরং প্রসারই হয়, ইক্ষুখণ্ডকে যতই ছেদন করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার মাধুর্য্যের হ্রাস না হইয়া

প্রকাশই হয়, আর সুবর্ণকে যতই দগ্ধ করা হউক না কেন, তাহাতে দীপ্তির হানি না হইয়া বরং উজ্জ্বলতার বৃদ্ধিই হয়। এইরূপ সজ্জনগণের যে সৎস্বভাব, তাহা প্রাণান্তকর বিপত্তিকালেও বিকৃত না হইয়া বরং উৎকর্ষ-প্রাপ্তই হইয়া থাকে।

'তরোরপি সহিষ্ণু' একমাত্র ধরিত্রী। ধরিত্রীকে এইজন্য 'সর্ব্বংসহা' বলা হয়। মাটি বা ধূলি সব সহ্য করে। প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, ধূলিই আমাদিগকে সুখকর সূর্য্যা-লোক প্রদান করে। ধূলি না থাকিলে হয় সূর্য্যতেজ অসহনীয় হইত, না হয় এমন একটি কৃষ্ণচ্ছায়া পড়িত যাহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই যে আকাশ নীলবর্ণ দেখায়, প্রদীপের শিখা পীতবর্ণ দেখায় ধূলিকণাই তাহার একমাত্র কারণ। যতই উপরে উঠা যায়, ততই ধূলিকণা ক্ষুদ্রতর ও লঘুতর হইয়া আইসে। ঐসব ধূলিকণাতে কেবল নীলবর্ণ প্রতিফলিত হয়। এইজন্যই পরিষ্কার আকাশ নীলবর্ণ দেখায়।

ধূলিকণার সাহায্যে মেঘের সৃষ্টি হয়। এক একটি ধূলিকণার আশ্রয়ে এক একটি জলকণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যতগুলি ধূলিকণা থাকে, জলকণাও ঠিক ততগুলি হয়।

প্রাকৃত বিজ্ঞান অপ্রাকৃত বিজ্ঞানেরই হেয় ও খণ্ডিত প্রতিচ্ছবি। যাঁহারা আপনাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি বলিয়া উপলব্ধি করেন, সেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-পদরেণুগণ জগতে অবতীর্ণ না হইলে কৃষ্ণসূর্য্যের আলোক জগতে এইরূপ সুখকর-ভাবে প্রকাশিত হইত না। জগতে এমন একটি মায়ার তামসী

ছায়া পড়িত, যাহার মধ্যে কোন রূপই দেখিতে পাওয়া যাইত না। অতএব হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলিগণই আমাদিগকে কৃষ্ণসূর্য্যের আলোক ও অপ্রাকৃত রূপ প্রদর্শন করেন। এই সকল ধূলিকণে শ্যামবর্ণ প্রতিফলিত হয়। নির্ম্মল আকাশ অর্থাৎ পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত নীলদ্যুতি প্রকাশ করেন। তাই শ্রুতি গাহিয়াছেন,—

'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"

—ছান্দোগ্য ৮।১৩।১

"শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম শবল। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীর সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি।"

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।" —তৈত্তিরীয় ২।৭ অনুবাক্

কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ড তত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

অপ্রাকৃত ধূলিকণা-ব্যতীত জগতে গোলোক-মহোৎসবের কারুণ্যবৃষ্টির সৃষ্টি হইতে পারে না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দুকণ-সমূহ এই সকল অপ্রাকৃত ধূলিকণার সাহায্যেই বর্ষিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

দাম্ভিক রাবণ, যাহার 'বড় আমি' অভিমান, সে কখনও উপরে উঠিতে পারে না—সে বিরজায় ডুবিয়া যায়; কিন্তু বৈষ্ণবের পাদপদ্মধূলিকণাসমূহ বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইতে পারেন। ধূলিকণার ইহাই

বৈশিষ্ট্য যে, ইহা যতই উপরে উঠে, ততই আপনাকে ক্ষুদ্রতর ও লঘুতররূপে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ততই ইহার অকিঞ্চনের রূপ প্রকাশিত হয়।

ভক্তপদধূলি হইবার লালসা একমাত্র অকিঞ্চনগণেরই স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। প্রাচীন আলোয়ারগণের অন্যতম তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আলোয়ারের নাম "ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু"। ঠাকুর মহাশয়ের গীতিতেও শুনিতে পাই—

"বৈষ্ণবচরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত।"

বহু ক্ষুদ্র কণ লইয়া ধূলিসমষ্টি প্রকাশিত হয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলিগণ যখন সম্মিলিত স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রকাশ হয়। অপ্রাকৃত পদধূলিগণ সর্ব্বদাই হরিগুরুপাদপদ্মে সংলগ্ন থাকিয়া হরিকীর্ত্তনধর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি একই তাৎপর্য্যপর। ধূলিকণাগণ স্ব স্ব আত্মন্তরিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ধূলিকণত্ব বা স্বরূপের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট ও হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম হইতে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। ধূলিকণাগণ হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সংলগ্ন থাকিয়াও পরস্পর নতিপ্রিয়। তাঁহারা বহুভর্ত্তৃত্ব ও বহ্বয়নশাখিত্ব-ধর্ম্মকে পরিহার করিয়া একায়নস্কন্ধীত্ব-ধর্ম্মই স্বীকার করেন।

অকিঞ্চন একায়নস্কন্ধী। বহু শাখা বা বহুভর্ত্তার সেবক নহেন—ব্যভিচারী নহেন। অকিঞ্চন সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা দীনের—কাঙ্গালের রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন।

পরমহংস শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কথিত "কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী" আর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথিত "কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গালভক্তগণ"—(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৭৬) অকিঞ্চনের রূপ, স্বরূপ ও ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে। যাঁহারা অকিঞ্চন, যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাদের কোন প্রকার জড়ের দম্ভ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদ-ধূলিরূপেই তাঁহারা গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট প্রচার ও আচার্য্যের কার্য্য করেন। যেমন প্রাচীরে বিজ্ঞাপন লাগাইবার নিষেধাজ্ঞা প্রচারকারীকে নিজের প্রচারেরই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে 'বিজ্ঞাপন লাগাইও না, 'Stick No Bills' প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হয়, তদ্রূপ যিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন, হরিকীর্ত্তন করেন, গুরুপূজা করেন, শ্রীব্যাসপূজা করেন, গুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচার করেন, তাঁহাকেও তদ্রূপ নিজোক্তির আপাত বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াই যেন সকলের পূজা গ্রহণ করিতে হয়, নিজের বিজ্ঞাপন লাগাইয়া পরের বিজ্ঞাপন রহিত করিতে হয়। ইহাতে আচার্য্যের অকিঞ্চনত্বধর্ম্ম নষ্ট হয় না। শরণাগতিই অকিঞ্চনের রূপ। যিনি শরণাগত, তিনিই পরমহংস—তিনিই অকিঞ্চন। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী পুনরায় আবৃত্তি করিয়া আমরা অকিঞ্চন বা পরমহংসের রূপের মঙ্গলারতি করিতেছি—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ ॥"

—:•:—

"ইঙ্গিত বুঝা" ও "ইঙ্গিতে বুঝা"

"ইঙ্গিত বুঝা" ও "ইঙ্গিতে বুঝা"—এই দুইটী কথাই ভজন-পথের বিশেষ রহস্য। সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট স্নিগ্ধ শিষ্য শ্রীগুরুদেব-কথিত ভজনের গূঢ় রহস্যসমূহের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন এবং শ্রীগুরুদেবের সেই ইঙ্গিতের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়া বাস্তব-ভজনে নিযুক্ত থাকেন। যাহাদের চিত্ত নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ ও দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধাদিদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহারা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ও বিহ্বল থাকায় শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুবর্গের ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ হয় না এবং অত্যন্ত দুর্দ্দৈববশতঃ তাহাদের নিকট শ্রীগুরুদেবের কোনপ্রকার ইঙ্গিতও প্রকাশিত হয় না। একমাত্র যাঁহারা অকৃত্রিম সেবা-যোগের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সতত সংবদ্ধ, সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদাঙ্কানুসরণকারী, সমর্পিতাত্মা, সমচিত্ত-বিশিষ্ট, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট ইঙ্গিতে বুঝেন এবং শ্রীগুরু-দেবের ইঙ্গিতরূপ রহস্য ধরিতে পারেন। বহু সৌভাগ্যের ফলে শ্রীশ্রীরূপানুগবরগণের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায় ও ইঙ্গিতে তাঁহাদের অভীষ্ট বুঝা যায়।

রাগের পথে দণ্ডচালনা নাই ; তাহা স্বাভাবিক প্রীতির পথ। তথায় আইন-কানুন, শাসন বা অন্য কোনরূপ প্ররোচনা নাই। তথায় সমস্ত কার্য্যই ইঙ্গিতের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

যিনি যতটা ভজনে অগ্রসর হইবেন, যাঁহার হৃদয়গুণ্ডিচা

যতটা পরিমার্জ্জিত হইয়া সুনির্ম্মল ও সুশীতল হইবে, তিনি ততটা ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধি, মেধা, চতুরতা, পাণ্ডিত্য, তর্ক ও বিচারশক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভজনরাজ্যের ইঙ্গিত বুঝা যায় না। মনোধর্ম্মের দ্বারাও ইঙ্গিতের ধারণা হয় না। মনোধর্ম্মে বিহ্বলতা ও সমস্যার মধ্যে পতিত হইতে হয়।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণ সর্ব্বদাই ইঙ্গিতে উপদেশ প্রদান করেন। আধ্যক্ষিক স্থূলবুদ্ধি যাহাকে 'স্পষ্টভাষা' বা 'unequivocal language' প্রভৃতি বলে, তাহাদ্বারা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণের ইঙ্গিত পরিমাপ করা যায় না। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুবর্গ অপ্রাকৃত ব্যোমযানের বিদ্যুদ্‌গতিতে শ্রীব্রজের পথে অভিসার করিতেছেন। তাঁহারা সেই অভিসারের মুখে দুই-একটী অপাঙ্গদৃষ্টি কৃপাপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া যে ইঙ্গিত করিয়া যান, তাহাদের সহিত একান্ত, সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ও তাহাদের পদাঙ্কানুসরণে প্রগতিশীল সেবোন্মুখ ব্যক্তি সেই কৃপাদৃষ্টি হইতে ইঙ্গিত বুঝিয়া ও ইঙ্গিতে বুঝিয়া বাস্তব সেবা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। যাহারা সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না ও সেইসকল রহস্য ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিল না, সেইসকল ভারবাহী, স্থূলদৃষ্টি, দেহগেহাসক্ত গো-গর্দ্দভ দেবীধামেই পড়িয়া থাকিবে। তাঁহারা শ্রীগুরুবর্গের সুতীব্রা গতির অনুগমন করিতে পারিল না। শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুদেব মূঢ়, স্থূলবুদ্ধি, মন্দগতি, পঙ্গু, জড়, অন্ধ, পতিত জীবকে কৃপা করিয়া শ্রীগোলোকধামে লইয়া যাইবার জন্য দেবীধামে অবতীর্ণ হন বটে, কিন্তু যাহারা দেবীধামে অনাদি

অনন্তকাল জড়াসক্তির নোঙর পুঁতিয়া রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদিগের জন্য তিনি চিরকাল বসিয়া থাকেন না। তিনি মূঢ় জীবগণকে চিরকালই "অ-আ" শিক্ষা দিবার জন্য "পাঠশালার গুরুমহাশয়" হইয়া যষ্টিহস্তে 'গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিবার' ব্রত বরণ করেন না। তিনি পরব্যোমের অধিবাসী। তাঁহার এই ইতরব্যোম বা দেবীধামে অবতরণ লোকমঙ্গলের জন্য। অত্যন্ত ভারবাহী মূঢ় ব্যক্তিগণ যখন সেই অপ্রাকৃত চেতনের বিদ্যুদ্গতিতে দীক্ষিত হইতে না পারায় জড়ের অধোগতির স্রোতেই পতিত হয়, তখন শ্রীচৈতন্যের নিজজন স্বস্থানে আরোহণ করেন। এই আরোহণ বা অভিসারকালে কোন কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইঙ্গিতে তাঁহার অভীষ্ট বুঝিয়া সেবা-রাজ্যে অভিষিক্ত হন। মূঢ়ধীগণ অভিযোগ করিয়া থাকে,—'শ্রীগুরুদেব তাঁহাদের ন্যায় চিরকালই দেবীধামে নোঙর পুঁতিয়া পাচনবাড়িহস্তে গো-গর্দ্দভের রাখালগিরি করিলেন না কেন? ইঙ্গিতের অস্পৃষ্ট ও দ্ব্যর্থসূচক বাক্য, বিশেষতঃ ঐরূপ বিদ্যুদ্গতির সহিত তাঁহারা আপনাদিগকে খাপ-খাওয়াইতে অত্যন্ত অপটু!' এইরূপ অভিযোগ জড়াসক্তির প্রতি প্রীতি হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে; কিন্তু অপ্রাকৃত ব্যোমযানের গতি এই অভিযোগ শুনিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করে না। যাহারা কোটী কোটী ইঙ্গিতময়ী কৃপা বরণ করিল না, সেই সকল মূঢ় জীবগণের ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য জানিয়া অর্থাৎ তাহারা জন্ম-জন্মান্তর সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প জানিয়া শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রজের পথে চলিয়া যান।

শ্রীভগবান এই দেবীধামে প্রতিমুহূর্ত্তে নানাপ্রকার বিপদ্-আপদ্, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, ভোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিত্যরাজ্যের কোটী কোটী ইঙ্গিত প্রেরণ করিতেছেন। এই দেবীধামের অনিত্যতা ও শ্রীগোলোকের নিত্যানন্দময়তা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অজ্ঞানতিমিরান্ধ জীবকে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেইসকল ইঙ্গিত কত করুণা ও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেছেন। কতভাবেই না তিনি সতর্ক করিতেছেন। শত শত অতীত ও বর্ত্তমান উদাহরণের দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্ম-মরণ-মালার ক্লেশের কথা জানাইয়া দিতেছেন। কিন্তু জীব এমনই স্থূলবুদ্ধি ও মন্দমতি যে, কিছুতেই সেই নিত্যরাজ্যের ইঙ্গিত বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। ইহা ভীষণতম দুর্দ্দৈব ও দুরন্ত অপরাধের ফল।

অধিকারিভেদে ইঙ্গিতের তারতম্য আছে। ভারবাহী বদ্ধজীব অত্যন্ত স্থূল ইঙ্গিতের রহস্য ভেদ করিতে পারে না। বস্তুতঃ বাস্তব-ভজনরাজ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ স্থূল ও ব্যতিরেক ইঙ্গিত নহে। রাগপথে অপ্রাকৃত রাজ্যের যে সুসূক্ষ্ম ইঙ্গিত নির্ম্মল আলোক বিস্তার করে, তাহাই রাগানুগগণের উপজীব্য। রাগাত্মিকজনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া রাগানুগগণ রাগের পথে অভিগমন করেন। সেই ইঙ্গিতই ভজনের রহস্য। এইজন্য রাগাত্মিকজন হইয়াও শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 'রাগানুগ'-অভিমানে তাঁহার 'প্রার্থনা'য় গাহিয়াছেন,—

"সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥"

আবার 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় গাহিয়াছেন,—
"শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুনালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে, কস্তুরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥
এ-সবার অনুগা হঞা, প্রেমসেবা নিব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপ-গুণে ডগমগি', সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে ॥"

অতএব অপ্রাকৃত সেবারাজ্যে, চিদ্বিলাস ধামে, রাগাত্মিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া, সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারা এবং সেই ইঙ্গিতে সমস্ত সেবা সমাধা করাই শ্রীরূপানুগ ভজনের চরম কথা, পরম রহস্য।

—:※:—

"কৈয়া", "গাইয়া", "কৈরা",

অবধূতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রায়ই এই তিনটি শব্দ লোকশিক্ষাকল্পে বলিয়া থাকেন। সেইদিন কোন এক গোস্বামিনামধারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে আসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র নিম্নলিখিত পদটি গান করিয়া বলিতেছিলেন,—

"কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী-গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব ॥" ইত্যাদি

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ ঐ ব্যক্তির মুখে ঐ পদ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া ক্রোধলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ;— 'তনয়া হইয়া জনমিব'—ইহা কি "কৈয়া". "গাইয়া" না "কৈরা" ? পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় 'কৈয়া' শব্দে কহিয়া, 'গাইয়া' শব্দে 'গাহিয়া' ও 'কৈরা' শব্দে 'করিয়া' বুঝায় অথবা বানান ও উচ্চারণভেদে যথাক্রমে কথক, গায়ক ও আচরণকারীকেও বুঝায়। অর্থাৎ তুমি কি এই-সকল উক্তি কেবল মুখে 'কহিয়া' যাইতেছ অথবা সুর-তান-মান-লয়ে 'গাহিয়া' যাইতেছ—না, আচরণ 'করিয়া' বলিতেছ ? জগতে কথক, গায়ক অনেকেই হইতে পারে, কিন্তু আচরণকারী ব্যক্তি দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর ভাষায় 'সরাগ-বক্তা'ই আচরণহীন কথক, গায়ক, লেখক, সাহিত্যিক, কবি প্রভৃতিরূপে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া থাকে। তাহাদের

দ্বারা জীবের কোনও প্রকৃত কল্যাণ হয় না। আর 'নীরাগ-বক্তা' অর্থাৎ যিনি জড়াসক্তির নোঙ্গর তুলিয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক প্রচার করেন, তিনিই স্ব-পর-মঙ্গল বিধান করিতে পারেন। তাই শ্রীশ্রীল শ্রীজীবপ্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' (২.৩ অনুচ্ছেদ) শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মবক্তা দ্বিবিধ—(১) সরাগ ও (২) নীরাগ। সরাগ-বক্তা লোভী ও কামী; তাঁহার কথা হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন, নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না অর্থাৎ স্বয়ং আচরণ করিয়া উপদিষ্ট বিষয়ের সত্যতা ও ফল প্রত্যক্ষ করেন না। এইজন্য তাঁহার কথাগুলি প্রাণহীন উক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তোতাপাখীর ন্যায় কেবল মুখস্থ বুলির দ্বারা নিজের ও পরের মঙ্গল করা যায় না। পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোক-নাশার্থই হইয়া থাকে।

একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র এক একটি পদ উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিলেন,—

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।"

* * *

"সখীগণ-গণনাতে. আমারে গণিবে তা'তে
তবহুঁ পূরিব অভিলাষ॥"

—ইহা কি "গাইয়া" না "কৈরা"? শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ এইসকল কথা বলিয়া আমাকেই শাসন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও অনেক সময় ইহা বলিয়া আমার প্রতি অবঞ্চনাময়ী কৃপা করেন। কেবল টেবিল চাপড়াইয়া সময়-সেবক (time-server) বা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হওয়াকে তিনি সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করেন। সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়া শত শত সভায় বক্তৃতা দিয়া, ভাষা ও ছন্দের নানাপ্রকার কসরৎ দেখাইয়া জীব একবিন্দুও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জীবনটি আচরণমুখর হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল কথক, বক্তা, গায়ক বা লেখকের অভিনয় 'ভণ্ডামি' ব্যতীত আর কি? তদ্দ্বারা কিছু-কালের জন্য বহির্ম্মুখ বা ঐশ্বর্য্যলোলুপ লোকের নিকট সাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় বটে. কিন্তু নিজের ও পরের বাস্তব মঙ্গল-বিধান করা যায় না। নিজে জড়াসক্তির নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিয়া বাক্যচ্ছটা দ্বারা বিশ্বজয় করিবার চেষ্টা প্রত্যেক জড়প্রতিষ্ঠাকামী কর্ম্মী ও প্রাকৃত-সহজিয়ার চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্যই শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রায়ই বলিয়া থাকেন—

"বিষয়্যার বিশ. কীর্ত্তনীয়ার তিশ।
ভক্তের হৃদয়ে গুরু থাকে অহর্নিশ।"

অর্থাৎ গৃহব্রত বা বিষয়ী জড়াসক্তির নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিয়া

ধর্ম্মবক্তার অভিনয় করিয়া খুব জোর বিশ বৎসর বিষয় ভোগ করিতে পারে ; পরে ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িলে সে 'ভোগাভাবে দুঃখিত-অন্তর' হইয়া পড়ে। কালরূপ পেয়াদা তাহাকে জোর করিয়া বিষয়-ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু বিষয়ের প্রতি আসক্তি তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। কীর্ত্তনীয়া অর্থাৎ বক্তা, গায়ক, লেখক বা সাহিত্যিকাদির প্রতিষ্ঠা খুব জোর ত্রিশ বৎসর কাল এই জগতে থাকে। তাহার পরে লোক তাহার কথা ভুলিয়া যায় অথবা অন্য কোনও অধিকতর প্রতিভাশালী কীর্ত্তনীয়া, গায়ক বা লেখক আসিয়া পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনীয়ার প্রতিষ্ঠাকে ম্লান করিয়া দেয়। কিন্তু যিনি অন্যাভিলাষরহিত আচরণশীল ভক্ত, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগুরুদেব অহর্নিশ অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ বাস করেন। তিনি ত্রিকালে ত্রিজগতের মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁহার কীর্ত্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। কারণ—

"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি' ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২৪৬)

যে ব্যক্তি কেবল 'কহিয়া', 'গাইয়া', 'লিখিয়া', 'বলিয়া' লোকের চমৎকারিতা বিধান করিতে চাহে, কিন্তু নিজের আচরণের সময়েই তাহার ঐসকল উপদেশের প্রতি কতটা বিশ্বাস ও আন্তরিকতা আছে, তাহা ধরা পড়ে, সে ব্যক্তি কোনদিনই মঙ্গললাভ করিতে পারে না। দুরন্তাপরাধজনিত জড়াসক্তি, অসৎসঙ্গজনিত হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য ও অন্যাভিলাষ তাহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে।

সংসঙ্গ হইলে হৃদয়ে চিদ্‌বল পাওয়া যায়। সং বা সন্ধিনীশক্তির কার্য্যই বাস্তব-সত্যের সন্ধান প্রদান করা। সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ শ্রীবলদেব। সাধু বা সদ্‌ব্যক্তিগণ সেই শ্রীবলদেব প্রভুরই বৈভব-প্রকাশ। এইজন্য সংসঙ্গে বল ও অসংসঙ্গে দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি কেবল মুখে বা লেখনীতে সদুপদেশ দান করেন, অথচ স্ব-চরিত্রে তাহা আচরণ করিতে পারেন না, নিশ্চয়ই তিনি অসংসঙ্গে পতিত। সেই ব্যক্তির সমস্ত উক্তি ও লেখনী কেবল জড়শব্দের কসরৎমাত্র; উহা চেতনকে স্পর্শ করে না। সহস্র সহস্র গ্রন্থ বা লক্ষ লক্ষ প্রবন্ধ রচনা, শত শত সভায় বক্তৃতা বা সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া লোকরঞ্জন করা অপেক্ষা সাধু শাস্ত্র-গুরুদেবের যে-কোন একটি শাসন ও উপদেশ আচরণে প্রকাশ করার মূল্য অনেক বেশী। কারণ, সেই সামান্য আচরণ কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিবার প্রতিজ্ঞা বা দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ কুটিলতায় পর্য্যবসিত হয়। আচরণশীল না হইলে অন্যাভিলাষিতা ও কুটিলতা গ্রাস করিবেই করিবে। আচরণটী সাক্ষাৎ চেতনের বৃত্তি। আর আচরণহীণ বাগ্‌বৈখরী বা দক্ষতা প্রভৃতি চেতন-ধর্ম্মের বিকৃতি। উহা জড়ধর্ম্মবিশেষ।

পৃথিবীতে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে হাটে-বাজারে ধর্ম্মবক্তা, লেখক ও গায়কের অভাব নাই। এই সকল কোটী কোটী বক্তা, লেখক ও গায়কের মধ্য হইতে একজনও আচরণশীল ব্যক্তি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। আচরণশীলের বক্তৃতা, কথা, গান বা লেখনীই প্রকৃত কীর্ত্তনপদবাচ্য। তাহাই নবধা ভক্তির অন্যতম। আচরণহীন

অন্যাভিলাষযুক্ত, জড়াসক্তিবিশিষ্ট গৃহব্রত বা ফল্গুত্যাগীর বাগ্‌-বৈখরী জড়ের কীর্ত্তনমাত্র। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় উহাই অচেতন গ্রামোফনের কীর্ত্তন—ছুঁচোর কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের এইসকল উপদেশ কহিয়া ও গাহিয়াও আমার হৃদয় পাষাণের মত অবিকৃত থাকে—এক বিন্দুও গলে না। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন "যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে—হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

আমার অবস্থা ঠিক এইরূপ। হৃদয়ে অন্যাভিলাষের হিমালয় বদ্ধমূল থাকায় কেবল শ্রীশ্রীগুরুবর্গের উপদেশ কহিয়া ও গাহিয়া যাইবার অভিনয় করিতেছি, উহার এক কণিকাও স্বীয় আচরণে প্রকাশ করিয়া সেইসকল উপদেশের 'পরীক্ষা' করিতে পারিতেছি না। হৃদয়ের এইরূপ কাঠিন্য দুরন্ত অপরাধের ফল। এইরূপ অপরাধময় চিত্তে যে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনার অভিনয়, তাহাও কৃপা গ্রহণ না করিবারই সুদৃঢ় সংকল্পের একটি প্রচ্ছন্নরূপ বিশেষ। বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকট কোনও ব্যক্তি অনেকক্ষণ যাবৎ কৃপাপ্রার্থনা করিবার ফলে পরদুঃখদুঃখী শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ যখন একখণ্ড ছিন্ন কৌপীন প্রদান করিয়া ঐ কপট কৃপা-প্রার্থী ব্যক্তিকে কৃপা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি আর পশ্চাদ্দিকে না তাকাইয়া

উর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমার ন্যায় গৃহব্রত এইরূপই অপরাধকঠিন অন্যাভিলাষযুক্ত চিত্তে কৃপা-প্রার্থনার অভিনয় করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের অবঞ্চনাময়ী কৃপা অবতীর্ণ হইলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক উর্দ্ধ্বশ্বাসে নিরয়-বর্ত্মের দিকে পলায়ন করে। এইজন্যই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলেন যে, প্রাণহীনবাক্যসার কোটি কোটি বক্তা, লেখক, গায়ক বা সাহিত্যিক সম্প্রদায়-সংরক্ষণ বা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতে পারে না। একজন আচরণশীল ব্যক্তি থাকিলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ ও ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হইবে। আচরণশীল ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ। যিনি পূর্ণ আচারবান্, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলেই মৃতব্যক্তিরও প্রাণসঞ্চার হইতে পারে।

"কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২০৩ অনুচ্ছেদধৃত শাস্ত্রবাক্য)

কামক্রোধাদিযুক্ত, কৃপণ ও বিষাদযুক্ত ব্যক্তিও যাঁহার আচরণময়ী বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণে উৎফুল্লচিত্ত হয়, সেই বক্তাই পরমগুরু।

—:*:—

'কৃষ্ণ যদি মাপান'—'কৃষ্ণ মাপান নাই'

বঙ্গদেশের কোন কোন অঞ্চলে সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কথাটি সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণ মাপান নাই"—এই কথাটির মধ্যে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র জীবের কিছুই করিবার শক্তি নাই, কৃষ্ণই মাপিতে পারেন, কারণ, তিনি মায়াধীশ। জীব আপন ইচ্ছায় কোটি কোটি বাঞ্ছা করিলেও কৃষ্ণের ইচ্ছা না হইলে তাহা কখনও ফল ধারণ করিতে পারে না। যিনি কৃষ্ণকে সর্ব্বক্ষণ 'পরিমাপক' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারেন।

অনেক সময় আমরা মনে করি, 'যদি আমার অর্থের অভাব না হইত, তবে আমি সার্ব্বকালিক হরিভজন করিতে পারিতাম; যদি আমার সংসারের ভার অপরে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তভাবে হরিভজন করিতাম।'—এই সকল মনোভাব শ্রীভগবানের বিধানকে ভজনের অনুকূলরূপে বরণ না করিয়া মায়ার রাজ্যে অধিকতর প্রবিষ্ট হইবারই বিচার। শ্রীভগবানের যে-কোন বিধানকে তাঁহার করুণা বলিয়া বরণ করিয়া তাঁহার সেবায় সর্ব্বক্ষণ পরমোৎসাহে নিযুক্ত থাকিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে। ইহা কোন প্রকার কল্পনার কথা বা আরোপ-মাত্র নহে। শ্রীভগবানের সমস্ত বিধান সত্য সত্যই বাস্তব ও নিত্যমঙ্গলময়।

ভক্তিপথের পথিকের অভিমান করিয়াও অনেক সময় আমরা 'কৃষ্ণই আমাদের পরিমাপক"—এইরূপ বিচার হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর যদি এইরূপ না হইয়া ঐরূপ হইত, যদি এই সকল লোক বিরোধী না হইয়া স্বপক্ষে থাকিত, যদি বিচারকগণ এইরূপ বিচার করিতেন বা করেন, যদি এইরূপ হইত, এইরূপ না হইত, বা এইরূপ হয়, তবে ভাল হইত বা ভাল হয়,—এইরূপ কোন কথাই বদ্ধজীব কল্পনা করিলে কোন্‌টি প্রকৃত ভাল, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমরা যাহাকে 'খুব ভাল' মনে করি, তাহা হয় ত' আমাদের পক্ষে বাস্তবতঃ অত্যন্ত অনিষ্টপ্রদ; আবার যাহাকে 'খুব খারাপ' মনে করি, তাহা হয় ত' আত্যন্তিক মঙ্গল-জনক হইতে পারে। এই সম্বন্ধে আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সর্ব্বক্ষণই বলিতে শুনিয়াছি,—"শ্রীকৃষ্ণই কল টিপেন, শ্রীকৃষ্ণই বিধাতা, শ্রীকৃষ্ণই পরিমাপক। শ্রীকৃষ্ণ যাহা করেন, তাহাই সুমঙ্গলগর্ভ আশীর্ব্বাদ বলিয়া মস্তকে সর্ব্বক্ষণ বরণ করিতে হইবে। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় নিত্যমঙ্গলের বিচার করিতে পারে না।"

শ্রীকৃষ্ণ 'পরিমাপক' বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাও শরণাগতের লক্ষণ নহে। শ্রীকৃষ্ণই যখন চরমে সকল বিধান করিবেন, তখন শুদ্ধভক্তির অনুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বিষয়-বর্জ্জনে উৎসাহ ও উদ্যমহীন হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার অভিসন্ধি তমোগুণান্বিত ব্যক্তি-গণের কপটতাব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তির বিচার এই,—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ নিরলস হইয়া ভক্তির

অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-ত্যাগে সর্ব্বপ্রকার উদ্যম ও উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে। আলস্য, জাড্য, অচেতনতা, বিক্ষেপ, অন্যমনস্কতাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় পূর্ণ উৎসাহশীল ও সচেতন থাকিতে হইবে। ফলের কোন আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে না; কৃষ্ণই ফলদাতা। তিনি যাহা বিধান করেন, উহাকেই নিত্যমঙ্গলপ্রদ বলিয়া মস্তকে বরণ করিতে হইবে। এই বিচারই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতির' গানে দৃষ্ট হয়,—

"তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

* * *

ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছামত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "নহিব ফলের ভাগী"—এই পদ

গান করিয়া নিশ্চেষ্ট হইতে বলেন নাই; শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছামত সমস্ত চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন, "ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর" হইয়া বেগার শোধ দিবার চেষ্টা করিতে বলেন নাই, বা নিজ-প্রভুত্ব-কামনা ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষে উৎসাহী হইতেও উপদেশ করেন নাই। সেবার জন্য আনন্দে ডুবিয়া, সেবোৎসাহে ভরপুর হইয়া সর্ব্বদা অখিল চেষ্টা করিবারই শিক্ষা দান করিয়াছেন। সেইরূপ সেবা-চেষ্টায় শত শত দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাহা পরম সুখ বলিয়া বরণ করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, সেবা করিতে করিতে সুখ উপস্থিত হউক, অথবা আমাদের অনভিপ্রেত দুঃখই উপস্থিত হউক, উভয়ই অবিদ্যা-দুঃখকে বিনাশ করিবে। সব সময়ই জানিবে,—কৃষ্ণই পরিমাপক। কৃষ্ণ মাপান নাই, তাই অন্ন জোটে নাই; কৃষ্ণ মাপাইয়াছেন, তাই অন্ন জুটিয়াছে। তিনি অন্ন জুটাইয়াছেন বলিয়া 'ভাল কৃষ্ণ', আর জুটান নাই বলিয়া 'নিষ্ঠুর কৃষ্ণ', তাহা নহে। তিনি সকল সময়ই-মঙ্গলময়। কৃষ্ণ মাপান নাই,-এই মনে করিয়া যেন প্রাকৃত অভাবে হাহাকার না করি; কৃষ্ণকে মঙ্গলময় জানিয়া যেন তাঁহার অনুকম্পা বরণ করিতে পারি।

অনেক সময় আমরা মনে ভাবি, মুখেও বলি, কৃষ্ণের কৃপায় আমার কোন বিপদ ও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। ইহার দ্বারা এইরূপ মনে করা উচিৎ নয় যে, কোনপ্রকার বিঘ্ন বা বিপদ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ-কৃপার অসম্ভাব হইত। বস্তুতঃ কৃষ্ণের যে-কোন বিধান বরণ করাই কৃষ্ণের কৃপা বরণ করা; তাহা না করিয়া

কৃষ্ণের কৃপার দোহাই দেওয়া এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। কৃষ্ণের কৃপায় জাগতিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া হরিভজনে নিশ্চিন্ত থাকা—কৃষ্ণের কৃপার শোভা সন্দর্শন করা নহে। বস্তুতঃ পরিমাপক কৃষ্ণ যাহাই মাপান, তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে উৎসাহ ও উদ্যমশীল থাকাই তৎকৃপা-বরণ ও শরণাপত্তির লক্ষণ।

কৃষ্ণ যাহা মাপান, তাহাই বরণীয় মনে করিয়া ও উহার অসদ্-অনুকরণ করিয়া যেন আমরা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর একগুয়েমীর অনুসরণ না করি। বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কার্য্যে একগুয়েমী করা কিছু যে-কোন প্রতিকূল বিষয়কে সহ্য করার চেষ্টা নহে। যে-স্থানে বৈষ্ণবের প্রতি দ্রোহ উপস্থিত হয় তথায় চেতন-রাজ্যের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। প্রচ্ছন্ন গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ অনেক সময় নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নকে 'কৃষ্ণ-কৃপা' বলিয়া শুদ্ধভক্তের অবৈধ অনুকরণ করে। শ্রীধাম-বিদ্বেষী ব্র— তাহার একগুয়েমীকে ঐরূপ মনে করিয়া কত বিজ্ঞাপনই না প্রচার করিয়াছে! সে আত্মনির্য্যাতনকে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি বিধর্ম্মিগণের নির্য্যাতনের সহিত তুলনা করিয়াছে! প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও পরাভূত হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি শ্রীধাম-বিদ্বেষ ও শ্রীধাম-প্রদর্শক আচার্য্যবৃন্দের বিদ্বেষে উৎসাহ ও একগুয়েমী পরিত্যাগ করিতেছে না। ইহাকে বাস্তব-সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রীকৃষ্ণকে পরম করুণাময় বা পরিমাপকরূপে বরণের আদর্শ বলা যাইবে না। কতিপয় ব্যক্তি স্বভাবতই একগুয়ে হইয়া থাকে।

কতকগুলি লোক ভোগের ও প্রভুত্বের অপস্বার্থ একবিন্দুও যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিবার জন্য যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা ও বিপদ অম্লানবদনে সহ্য করিবার যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ, তাহা শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তি নহে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণের আদর্শে, রামচন্দ্র খাঁ, হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ প্রভৃতির চরিত্রে বৈষ্ণব-বিদ্বেষের ঐরূপ অমানুষিক সহ্যগুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শরণাগত-জনে যে সহিষ্ণুতা, হরিকীর্ত্তনে যে সহিষ্ণুতা প্রকাশিত হয়, তাহাতে হৃদয়ে অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচতা, অমানিত্ব, মানদত্ব, সুদৈন্য, সারল্য, সুসম্বন্ধজ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-জনে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, স্বাভাবিকী প্রীতি, প্রতিপদে হরিভজনে প্রগতি, অদম্ভ, কার্পণ্য, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি, জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। শরণাগতের সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, নিজ-প্রভুত্বস্থাপন ও বিষয় বর্দ্ধন বা ভাবের ঘরে চুরি করিবার জন্য নিযুক্ত হয় না। শরণাগতের সহিষ্ণুতা কৃষ্ণকীর্ত্তনে রতিবর্দ্ধনকারী, বৈষ্ণবে প্রীতি-বর্দ্ধনকারী ও জীবে দয়া-বিধানকারী। "খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম"—এই সুদৃঢ়তার অনুকরণ করিয়া ও ঐ বাক্যের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃত ব্যক্তিগণ অনেক সময় জাগতিক সুবিধাবাদ আহরণের জন্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি পার্থিব নীতির মধ্যে নানাপ্রকার

দৃঢ়তার আদর্শ প্রত্যক্ষ করা যায়। উহাতে শরণাগতির কোনও কথা নাই। শরণাগতের প্রথম ও প্রধান লক্ষণই অপ্রাকৃত শ্রীবৈষ্ণবে প্রীতি, অকপট আত্মদৈন্য, কৃষ্ণকে গোপ্তা বলিয়া বরণ। শ্রীকৃষ্ণকে গোপ্তা বলিয়া বরণের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণই যে পরিমাপক, এ সুবুদ্ধি ও সুবিশ্বাস আছে। যে স্থানে 'শ্রীকৃষ্ণই পরিমাপক' - এই বুদ্ধি, তথায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্রোহ বলিয়া কোনও কথাই থাকিতে পারে-না। আমি ক্ষুদ্র জীব. আমি পৃথিবীর একটি ধূলিকণাও সকল সময় মাপিয়া লইতে পারি না, আমি কি করিয়া বৈষ্ণবকে, গুরুকে মাপিয়া লইব? শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরিমাপক- ইহা যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি আধ্যক্ষিক থাকিতে পারেন না; তাঁহার হৃদয়ে অধোক্ষজ-জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক হরিভজনকারীর এই সুবুদ্ধি হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য। হরিভজনকারী নিজের বিচারের ভাল-মন্দের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। **কৃষ্ণের বিধান অবতীর্ণ হউন**. এই বিচারই হৃদয়ে পোষণ করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের বিধান শিরে ধারণ করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, ডাক্তারকে ডাকিয়া বা ডাক্তারকে ফি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া রোগী যেন তাহার প্রতি ডাক্তার কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা আদেশ বা নির্দ্দেশ না করেন। ডাক্তার তিক্ত. কি মিষ্ট ঔষধ দিবেন, তাহা ডাক্তারেরই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে মঙ্গল হইবে। গুরুকে ডাকিয়া নিজের রুচি-অনুসারে ব্যবস্থা করাইয়া লওয়া গুরুর গুরুত্ব স্বীকার নহে, গুরুকে শিষ্য

করিবার চেষ্টা। শ্রীভগবানের নিকট আত্মমঙ্গল প্রার্থনার সময় শরণাগত ব্যক্তি এইভাবে প্রার্থনা করেন,—"হে প্রভো, আমার কিসে ভাল হয়, তাহা আমি জানি না। আমি প্রেয়কে শ্রেয়ঃ মনে করি, শ্রেয়কে অপ্রিয় মনে করি। তুমি মঙ্গলবিধাতা, আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা তুমিই জান। তোমার যে-কোনও বিধান তোমার অনুকম্পা বলিয়া বরণ করিবার শক্তি ও বল দাও, তোমাতে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার বিধানের শক্তি দাও। আমি অতি অধম, আমাকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়া উত্তম করিয়া লও"।

—:০:—

"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই!"

কতকগুলি লোকের শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য যেন বড়ই বিরহ! যখন আত্ম-সুখ, সুবিধা বা সম্ভোগের অভাব লক্ষিত হয়, তখনই তাহাদের হৃদয়ে ঐরূপ বিরহের (?) উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়। ইহা বিরহ, না সম্ভোগ-পিপাসা? 'শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীভগবান্ শ্রীশালগ্রাম কোথায় লুকাইলেন? তাঁহার দ্বারা যে আমার ভোগের বাদাম ভাঙ্গিতে পারিতেছি না!' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরও আমার এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের সময়ের সুখসুবিধা এখন কোথায়? কিরূপ নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন, কিরূপ নিত্য মহামহোৎসব—ছানার ডাল্‌না, কাণিকা, বাগবাজারের রসগোল্লা, রসমালাই, আইসক্রিম

সন্দেশ, একাদশী-দিবস আরও অধিক পরিমাণে নানা উপহার-দ্রব্য বহুবার ভোজন, কত লোকের প্রদত্ত ঝুড়ি ঝুড়ি সম্মান, স্থানে স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ গমন, নানা দেশ-ভ্রমণ, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা শ্রবণের নামে একটি জাতি- বিশেষের শ্রমবর্দ্ধন অথবা বৈদ্যুতিক বিজন-যন্ত্রের সুকৃতি উৎপাদন, দেহ-পরিচর্য্যা, দেহজাত স্বজনাদির পরিচর্য্যা, প্রভুপাদকে প্রশংসা করিবার ছলে স্ব মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপন প্রভৃতি এখন কিছুই নাই! 'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।'

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল কথা বলিতেন, তাহা ত' বাতাসে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অথবা পুস্তক-পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! ঐ সকলের কিছু বাস্তবতা নাই! তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সুবিধাবাদের যে-সকল কায়ব্যূহ রচনা করিয়াছিলাম, তাহাই বাস্তব। কিন্তু এখন তাহা কোথায়? যদি কেহ পুনরায় সেই সকল সুবিধাবাদ প্রদান করিতে পারেন, তবেই তাহার আনুগত্য (?) করিতে পারি!

হরিকথায় চিড়ে ভিজে না! হরিকথা প্রয়োজন নয়! উহা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার্জ্জনের উপায় মাত্র! কনকাদিই ফল বা প্রয়োজন! দৈন্যের পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতা, পরমার্থের পরিবর্ত্তে অনর্থ, প্রপত্তির পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তি, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মাপিয়া লইবার পাশবিকতা প্রভৃতি অপরাধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বিরহের নামে ঐরূপ সম্ভোগবাদ প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আমার হৃদয়কে ঐরূপ এক পাষণ্ড পিশাচ গ্রাস করিয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যতই কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সংশোধন ও শাসন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই আমি সেই কৃপাকে পরিহার করিবার জন্য "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই"—এই বিলাপপ্রতিম বন্ধ্যা যুক্তি দেখাইয়া বৈষ্ণবানুগত্য পরিবর্জ্জন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছি। যাহারা (আমরা) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঐশ্বর্য্যে কিংবা গৌড়ীয়-ঔষধাগারের show-bottle এর শোভায় মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলাম, তাহারা (আমরা) তিক্ত ঔষধ সেবন করিবার বাস্তব পরীক্ষা প্রদানকালে ঐরূপ বিদ্রোহ-ব্যঞ্জক বিলাপ ব্যক্তভাবেই হউক, আর অব্যক্তভাবেই হউক, উত্থিত করিয়াছি।

সাধক-জীবনে এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হইলে তাহা সাধুসঙ্গের দ্বারা বিদূরিত হয়; কিন্তু সাধুর চরণে অপরাধময় চিত্তবৃত্তিতে যদি ঐরূপ বিচার উদিত হয়, তাহা হইলে হরিভজন হইতে চিরতরে বিচ্যুতি ঘটে। যিনি সর্ব্বদা আত্মমঙ্গল অভিলাষ করেন, তিনি নিজের ত্রুটী-বিচ্যুতিই সর্ব্বদা লক্ষ্য করেন। 'আমি ঠিক আছি, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শক্তির অভাব হইয়াছে',—ইহা আত্মঘাতীর মনোভাব। জগতের বহির্ম্মুখ সম্ভোগবাদিগণ সকলেই এই বিচারে ধাবিত। নিজের অযোগ্যতা ও শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন করুণার চিন্তা প্রবল হইলেই কৃপা লাভ করা যায়। কৃষ্ণ যখন যে বিধান করেন, তাহাকেই হরিভজনের অনুকূলরূপে বরণ করিলে কৃপার অনুভব হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ চিরদিনই মাপিয়া

লইবার চিত্তবৃত্তিকে নিরাস করিয়াছেন। মাপিয়া লইবার চিত্ত-বৃত্তিই নাস্তিকতা।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা-পুরীতে নিত্যকালই অবস্থিত আছেন। যাহারা অযোধ্যা-পুরীকে ভোগচক্ষে দর্শন করে, তাহা-দের চিত্তবৃত্তি রাবণের ন্যায় সম্ভোগবাদে পরিপূর্ণ। শ্রীঅযোধ্যা-পুরীতে নিত্য শ্রীরামচন্দ্রের বিলাস যাহাতে দর্শন হয়, যাহাতে শ্রীঅযোধ্যা পুরীকে দ্রষ্টৃরূপে ও আমাকে দৃশ্যরূপে অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ শরণাগত-বুদ্ধির জন্য অনুক্ষণ অভিনিবেশ আবশ্যক।

অনর্থযুক্ত সাধক প্রতি-মুহূর্ত্তেই নিজেকে দৃশ্য অভিমান করিতে ভুলিয়া যায়, ইহাই তাহার বিক্ষেপ। সেবোন্মুখতার সহিত নিত্য সাধুসঙ্গ করিলে এই বিক্ষেপ দূর হয় ও নিজেকে দৃশ্য ও তদীয় বস্তুকে দ্রষ্টা বলিয়া অভিনিবেশ স্বতঃই উদিত হয়। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীগুরুদেবকে যখন আমরা আমাদের দৃশ্য বস্তু বিচার করি, তখনই তাঁহাদিগকে পুতুল, প্রস্তর, বৃক্ষ, জল, গ্রাম ও মনুষ্য বিচার করিয়া থাকি; আর যখন তাঁহাদের দ্রষ্টৃস্বরূপকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করি, আমা-দিগকে দৃশ্য বলিয়া উপলব্ধি করি, তখনই তাঁহাদের কৃপা লাভ করা যায়। **স্বয়ং 'দ্রষ্টা' সাজিয়া অপ্রাকৃত বস্তুকে 'দৃশ্য' মনে করিলে কোটিজন্ম তাঁহাদের সন্নিধানে অবস্থানের অভিনয় করিলেও কৃপা লাভ করা যায় না, তাঁহারা আত্মসাৎ করেন না।** ইহা একটি নিত্যসিদ্ধ অখণ্ডনীয় সত্য। "সে রামও নাই,

সে অযোধ্যাও নাই"—এই প্রকার চিত্তবৃত্তিতে "শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আমার দৃশ্য'—এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহাদের কৃপা-সান্নিধ্য হইতে চিরদিনের তরে দূরে থাকিবার চেষ্টা হয়। এইরূপ আরোহপন্থি-গণের বিচার নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তগণ বিচার করেন,—

'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।'

যাঁহার যতটা নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিনিবেশ হইয়াছে, তিনি ততটা সকল অবস্থার মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের লীলা, ইঙ্গিত ও কৃপা উপলব্ধি করিতে পারেন। এখনও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমা-দিগকে কৃপা করিতেছেন। আমি তাঁহার একটি জঘন্যতম কুলাঙ্গার কুপুত্র। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা যে, তাঁহাকে আমার দৃশ্যরূপে বিচার না করিয়া নিত্যকাল তাঁহাকে যেন দ্রষ্টৃরূপে বিচার করিতে পারি। তিনি মদ্দ্রষ্টা, মদীশ্বর; অতি গোপনে, অতি নির্জ্জনে মনকে ফাঁকি দিয়া আমি যে-সকল কার্য্য করি, তাহাও তিনি দেখেন। তিনি আমার নিত্য-শাসক ও নিয়ামক; তবে তিনি প্রেমময়, কৃপাময়, সর্ব্বমঙ্গলময়। তাঁহার সেই বাণীটী যেন না ভুলি,—যে বাণী তিনি কোন এক দ্রষ্টৃ অভিমানী জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আপনি কোন দিন দেখেন নাই; কোন দিন আপনি তাঁহার নিকট গীতা পড়েন নাই।"

তাঁহার এই বাণীটী প্রহেলিকা বা আজ্‌গুবী কথা নহে, ইহা

বাস্তব সত্য। দ্রষ্টৃ-অভিমানই—'পুরুষাভিমান'; দ্রষ্টৃ-অভিমানই 'দাম্ভিকতা', দ্রষ্টৃ-অভিমানই—'স্বতন্ত্রতা', দ্রষ্টৃ-অভিমানই- 'অসূয়া', দ্রষ্টৃ-অভিমানই—'আত্মহত্যা'। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেই আত্মহত্যার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে যে চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বদা অভিনি থাকিতে বলিয়াছেন, তাহা যেন এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত না হই,—

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি',
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সে ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, **জীবার উচিত নহে,**
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে॥

(প্রার্থনা দৈন্যবোধিকা—৭

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥

যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥

সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন॥

(ঐ—৮)

সাধুমুখে শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ করিয়াও যদি আমাদের চিত্ত বিমল না হয়; শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় না হয়; ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তির উদয় না হয় তাহা হইলে সাধুর চরণে নিশ্চয়ই ভীষণ অপরাধ রহিয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতে বর্ত্তমানকালেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সমীপে আমরা ত' হরিকথা শ্রবণের অভিনয় কম করি নাই; তাঁহারা ত' হরিকথা-কীর্ত্তনে কোনও দিন কৃপণতা করেন নাই; তথাপি ত' চিত্ত বিমল হইতেছে না, ধিক্কার ও দৈন্য আসিতেছে না! ইহাতে বুঝিতে পারিতেছি—সাধু-সঙ্গের অভিনয়ই সাধুসঙ্গ নহে। এই সম্বন্ধে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে এইরূ
উপদেশ করিয়াছেন,—

"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির ক
যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেব
তাঁহার প্রসাদ-সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুস
হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মান হয় বটে এ
তাহাতে কোন-না-কোন-প্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই
সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। * * * কেবল শুদ্ধভক্ত সাধুগণের স্বভা
ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসর
করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধু
নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,— 'হে দয়াময়, আমাকে কৃপ
করুন, আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসারবুদ্ধি কিরূপে দূ
হইবে?" **বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য মাত্র। তি
মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়
সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহঙ্কা
জাগ্রত আছে।** কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও সাধুগণে
শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহা
নিকট কপট-দৈন্য ও কপট-ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি
সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে তোমার বিষ
বাসনা দূর হইক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক'; তখনই
বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এইরূপ
আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এইরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র

সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।' এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এইরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা-মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ন-পূর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী)

সঃ তোঃ ১৫।২

"সাধুর নিকট গিয়া 'এই দেশে বড় গরম, সেই দেশে শরীর ভাল থাকে, ঐ বাবুটি বড় ভাল, এই বৎসর চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে'? — ইত্যাকার মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' প্রশ্নকারীর কথার দুইএকটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় না কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয়? **সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।"**

—'সাধুজন-সঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।৪

অবধূতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকট আমরা অনেকেই সাধুসঙ্গ করিবার জন্য গমন করিতে ইচ্ছুক হই। কিন্তু তিনি স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' স্বেচ্ছায় তরজা প্রহেলিকা-প্রতিম কিছু কিছু কথা বলেন. কিংবা দুই চার পাঁচ ঘণ্টা নিকটে বসিয়া থাকিলেও তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় না। এইরূপ অবধূত মহাভাগবতের সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি সকল সময় সাধুসঙ্গে পর্য্যবসিত না হইয়া কৌতূহল-নিবৃত্তিরূপ অন্যাভিলাষে পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য আমার ন্যায় অত্যন্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তির অধিকারে যে মহাভাগবতবর শ্রীগুরু-পাদপদ্ম মধ্যমাধিকারের লীলা প্রকট করিয়া আমাকে শাসন ও সংশোধন করেন. তাঁহারই সঙ্গ অধিক মঙ্গলজনক। শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের অতি পুরাতন শিষ্যাভিমানী 'অযাত্রা প –' অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ করিবার জন্য কুলিয়া নবদ্বীপে গমন করিত। সেই অবধূতবরের আচার. ব্যবহার প্রভৃতি দ্রষ্টৃ অভিমানে দেখিয়া সেই ব্যক্তির এই দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া-ছিল যে. 'শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বৈরাগ্য ও অধিকার অনেক উচ্চ, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে তাঁহার গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য ও সঙ্গ অপেক্ষাও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সঙ্গের দ্বারা অধিক লাভবান হওয়া যাইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রচারাদি কার্য্য করেন, বিষয়াদির কথা বলেন, কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সর্ব্ব সময় স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন, অতএব তাঁহার সঙ্গের দ্বারা অধিক মঙ্গল

হইবে!' সেই ব্যক্তি পরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিকৃত আনুকরণিক হইয়া কাপালিক পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব কোন সময়ই দ্রষ্টৃ-অভিমানে সাধুসঙ্গ হয় না। এইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'জৈবধর্ম্মে' বলিয়াছেন,—

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।"

(জৈবধর্ম্ম ৭ম অধ্যায়)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অন্তরে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। দ্রষ্টৃ-অভিমান ছাড়িয়া দৃশ্য অভিমানে আমাদের অভিনিবেশ হইলেই অর্থাৎ সেবোন্মুখতা ও অকপট দৈন্য হৃদয়ে আসিলেই আমরা তাঁহাদের স্নেহময় কৃপানুভব লাভ করিতে পারি। এখনও সেই রাম আছেন, এখনও সেই অযোধ্যা আছেন। অসাধুতা, কুটিলতা, পৈশুন্য, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির নিকট 'সেই রাম, ও 'সেই অযোধ্যা'র অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ সেবোন্মুখতা, সরলতা ও আত্মমঙ্গল-বরণে ঐকান্তিকতার নিকট 'সেই রাম ও সেই অযোধ্যা' নিত্যই প্রকাশমান। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,— "কাণ দিয়া সাধু দেখ।"

—:০:—

চেতনোৎসব

(প্রাপ্ত)

সাতদিন ধরিয়া অনুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের আবাহনমুখে সঙ্কীর্ত্তন বিগ্রহ পরমারাধ্যতম নিত্যাভীষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই উৎসবে যোগদান করিবার দুর্ল্লভতম সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ইহার অপূর্ব্ব প্রাণময়তা, অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং অসামান্য মৌলিকত্ব হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব আমাদের চিরাচরিত রীতিনীতি, গতানুগতিক চিন্তাধারা এবং পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অন্ধ ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া একটা বিপ্লবের স্রোত আনিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই উৎসবের প্রত্যেকটি অঙ্গ একটা নূতন আলোক, নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে।

উৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের যে অষ্টোত্তরশত বৈভব কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাতে ভজনরাজ্যের ক্রমপন্থায় অবস্থিত সকল স্তরের বিষয়েরই আলোচনা আছে। ভজনপথের প্রথম সোপানের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম সোপানের কথারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক শব্দে চেতনরাজ্যের অনন্ত বিচিত্রতার আভাস উপলব্ধি করিবার সুবর্ণ সুযোগ সকলেই পাইয়াছেন। কিন্তু এই সকলের মূলে আছে একটি কথা—

'নিজেকে জান"। "স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও"—এইটিই সর্ব্বপ্রথম কথা। "প্রাকৃত অভিমান, ভোক্তার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। তুমি স্ত্রী নও, পুরুষ নও, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, কুৎসিত, রূপবান, সুস্থ, রুগ্ন, ধনী, দরিদ্র—জড়জগতের বিচারে যত কিছু সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কোনটাই তোমার স্বরূপের পরিচয় নহে, তুমি জড়-বিলক্ষণ অণু-আত্মা, তুমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবক, দাস। প্রাকৃত অস্মিতায় যে ক্ষুদ্রত্ব অথবা মহত্ব আছে তাহা তোমার স্বরূপের ধর্ম্মে নাই, সুতরাং জড় অহঙ্কারে গর্ব্বিত অথবা কুণ্ঠিত, হৃষ্ট অথবা শোকগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন তোমার নাই, তুমি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। কেবলমাত্র প্রাণহীন শ্রবণের অভিনয় নহে—অথবা কেবলমাত্র অনুভূতিহীন আবৃত্তি নহে- সত্য সত্যই তুমি ইহা শুদ্ধ চিত্তে উপলব্ধি কর। তাহা না হইলে সমস্তই বৃথা।

আমি হয় ত' তর্ক করিয়া বলিব- কেন, আমি যে নিত্য কৃষ্ণদাস, এই কথা কি আমি কখনও শুনি নাই—না, শুনিয়াও বিশ্বাস করি নাই? কিন্তু কেবলমাত্র শুনিয়া যাওয়া এক জিনিষ, আর তাহার অনুভূতি অন্য আর একটা জিনিষ। তর্ক আমি করিতে পারি - কিন্তু সত্য সত্যই আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে— এইকথা নিষ্কপটে বলিতে পারি কি? নিজেকে নিজে যখন দেখিতে যাই, তখন মায়া আসিয়া আমার কর্ণে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে—চক্ষুতে আবরণ টানিয়া দেয়। জড় চক্ষুর্দ্বারা নিজের অপ্রাকৃত স্বরূপ (?) দেখিয়া ফেলিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠি,

মনে করি, আমার জড়ের নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। কি
যখন অহৈতুকী করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আমা
যথার্থ রূপ, আমার দৈন্যদারিদ্রময় মূর্ত্তি আমাকে দেখাইয়া দে
তখন কি দেখিতে পাই ? চির বঞ্চিত আমি জানিয়া শুনিয়া
নিজেকে নিজে বঞ্চনা করি, মায়াও তাহার কৃতদাস জানিয়া নানা
ভাবে আমাকে বঞ্চনা করে; আবার কপট ভোগপিপাসু জানি
শ্রীগুরু বৈষ্ণবও আমাকে বঞ্চনা করেন। এতদিন মনে করিয়াছি-
অনেক কথা শুনিয়াছি, অনেক কথা জানা হইয়া গিয়াছে, সুতরা
অনেক কথাই আমি বলিতে পারি। কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণব বলিলেন
আজ পর্যন্ত আমার একটি কথাও জানা বা বোঝা হয় নাই, সুতরা
কোন কথাই আমি প্রকৃতপক্ষে বলিতে পারি না। বর্ত্তমানের
আমি ও আমার যথার্থস্বরূপের মধ্যে বিরজার অপার ব্যবধান
রহিয়াছে। সেই ব্যবধান দূর না হওয়া পর্যন্ত, অন্ততঃ দূর করিবার
জন্য হৃদয়ে তীব্র ব্যাকুলতা না আসা পর্য্যন্ত আমি যাহা শুনি বা
যাহা বলি, সমস্তই ছলনা।

যতক্ষণ চেতনধর্ম্মের—সেবাধর্ম্মের উন্মেষ না হইতেছে, ততক্ষণ
শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ, সেবকের প্রকৃত স্বরূপ, সেবাবৃত্তির
স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের
আবির্ভাব ও তিরোভাবের রহস্য আমার নিকট প্রহেলিকাময়
থাকিয়া যাইবে। চেতনময় চক্ষুদ্বারাই চেতন রাজ্যের দর্শন লাভ
হয়। অচিৎপ্রতীতি-অভিনিবিষ্ট আমি, ভোগ ও ত্যাগের মানদণ্ড
দ্বারা অপ্রমেয়কে মাপিয়া লইতে গিয়া কেবল বহির্ম্মুখতাই সঞ্চয়

করি। ভোগ-ত্যাগ ও সেবা, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অক্ষজ ও অধোক্ষজের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা আমি শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কেবল অচিৎ-এর ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া সেই পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য যে কোথায়, তাহা আমার উপলব্ধির বিষয় কি করিয়া হইবে? ভোগের পিপাসাকে আমি সেবা মনে করি, জড় অভিজ্ঞতা অনুভূতিহীন পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে অপ্রাকৃততত্ত্বের অনুশীলন করিতে যাই, খেয়ালী মনের কৌতূহলকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মনে করি, ভোগলোলুপ জড় মনকে আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস বিচার করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা এই যে, যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার নিতান্ত অযোগ্যতা বা আমার অপরাধের কথা জানিয়াও সমস্ত ক্ষমা করিয়া আমাকে অমায়ায় কৃপা করিতে উদ্যত হন, তখন আমি নানাপ্রকার কপটতার আবাহন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকি। ভোগলিপ্সা আমি কিছুতেই ছাড়িতে চাই না— আমার মূল গলদ্ সেইখানে।

কত দূর দূরান্তর হইতে সেবকগণ আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠতলে সমবেত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক। সপ্তদিবসব্যাপী এই যে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল, ইহা সমস্তই চেতনময়। যাঁহার কীর্ত্তন, যিনি কীর্ত্তন করিতেছেন, যেই স্থানে যেই-কালে এই কীর্ত্তন-যজ্ঞের উদ্বোধন, সমস্তই চেতনময় ভূমিকায় অবস্থিত। জড় অভিমানে আবদ্ধ থাকিয়া

আমি ইহার কি উপলব্ধি করিব ? জড় কর্ণ চিদ্‌বস্তুর কথা কি করিয়া শুনিবে ? আমি শুনিলাম মাত্র কতকগুলি বিচিত্র শব্দ-ঝঙ্কার, যাহা উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুরাশিতে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই চেতনোৎসব শুদ্ধ সেবকের হৃদয়ে প্রভুসেবার জন্য নিত্য নব উদ্দীপনার যে অফুরন্ত প্রবাহ আনিয়াছে, যাহার হৃদয়ে যে সংশয়ের, আশঙ্কার অথবা জাড্যের লেশ-টুকু ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ জগদ্‌গুরুবরের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল প্রভু-পাদের অনুকূল সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে যে চির অমৃতের রাজ্যের সন্ধান দিয়াছে, গুরু গৌড়ীয়ের গভীর শঙ্খরব যাহার কর্ণে এই পর্যন্ত প্রবেশ করে নাই—এইরূপ ব্যক্তিকেও শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ মহিমায় 'আকৃষ্ট করিয়া, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বাত্ম নিয়োগ করিবার প্রেরণা দিয়া যে মহা উদার লীলা প্রকাশ করিয়াছে—হতভাগ্য আমি তাহাতে নিতান্তই বঞ্চিত। আমার হৃদয়ে প্রভুর সেবার জন্য একবিন্দু নিষ্কপট আর্ত্তি জাগিল না। যাঁহারা সেবোন্মুখ কর্ণ-দ্বারা শ্রবণ করিলেন, তাহাদের অনুভূতি আমার নিকট অনন্নুভবনীয় রহিল। বিজাতীয় ভিন্ন তন্ত্রের চিত্তবৃত্তি লইয়া আমি দূর হইতে শ্রবণের অভিনয় করিয়া গেলাম মাত্র।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত চেতনের বাণী সেই সময়ের জন্য অনাদিকালের অপরাধ-কঠিন হৃদয়ে হয়ত' একটু স্পন্দন জাগাইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—সত্যই ত' আজ পর্যন্ত আমি

কেবল ছলনাই করিয়া আসিতেছি—প্রকৃত মঙ্গলের পথ সুদূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য এই খেদ আমার মনে হয়ত' উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য সত্য সরল হৃদয়ের আর্ত্তি নহে, ভাবপ্রবণ মনের সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র, তাহার মূলে আছে কপটতা। তাই সেই খেদ প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইয়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করিবার প্ররোচনা আমাকে দেয় নাই, জল-বুদ্বুদের মত তাহার অস্তিত্ব উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিয়াছি। বিশ্বগ্রাসী ভোগপিপাসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে, আত্মমঙ্গল-লাভের ইচ্ছা সেইখানে সহসা স্থান পাইবে কেন? জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমি কেবল বঞ্চনা করিয়া ও বঞ্চিত হইয়াই আসিতেছি, সুতরাং বঞ্চনাই আমার ভাল লাগে। তাই এই চেতন-মহা-মহোৎসবে এই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিবার ভাগ্য আমার হইল না। আমার অনন্ত দুষ্কৃতি আমাকে গৃহব্রত-ধর্ম্মেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবকবৃন্দ যখন গৌরবাণীর ভূরিদান-মহাসিন্ধুতীর্থের প্রকটকারী, গৌরবাণী-সেবাবিগ্রহ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে নিজেকে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের সমিধ রূপে সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র, আমি তখন সেই গোকুল-মহামহোৎসব হইতে সুদূরে আত্মগোপন করিয়া নিজের ঘৃণিত কামপিপাসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিয়াছি। আমার অন্তরের পরিচয়, আমার জঘন্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় আমি আর কি দিব। কবে আমার এই মোহ

কাটিবে, কবে আমি শুদ্ধসত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রবর্ত্তিত নিত্য সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের অতি নগণ্য, তুচ্ছ হইতে অতি তুচ্ছ সমিধ্‌রূপে পরিগণিত হইতে পারিব, তাহা একমাত্র সর্ব্বদর্শী শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণই জানেন।

—ঃ*ঃ—

বৈষ্ণব চিনিতে হইবে

জীবের মুখ্য প্রয়োজন-লাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাফলেই জীবের পক্ষে সদনুগ্রহ—শ্রীভগবানের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করা সম্ভব, ইহা আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি। ইহাও শুনিয়াছি, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী, জগতের কোন বস্তু বা জাগতিক কোন বস্তুর নির্ব্বিশেষ ভাব ঐ কৃপার উৎপত্তির কারণ নহে। এই হৈতুকতার বিপরীত বস্তুটী যে কী ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের করুণাকে আমরা একটা কাল্পনিক রূপ দিয়া বসি। আমরা মনে করি, "আমাদের পক্ষে সেবানিষ্ঠা বা তজ্জন্য যত্নাগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা আমাদের মত চলিতে থাকি, একদিন আকস্মিক ভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে।" ভজনাগ্রহটী যেন মিছা ভোক্তৃ-অভিমানী, মনোধর্ম্মী, বদ্ধজীব আমরা সাধুগুরু-কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেই করিতে পারি!

যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহারা সাধুর কৃপা ও জীবের পক্ষে সেবার আগ্রহ যে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা বুঝিতে পারেন না। সাধুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা সত্য সত্য অন্তরের সহিত আর্ত্তি বিশিষ্ট নহেন, ইহাও তাঁহাদের ঐরূপ কপটতাপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যায়। বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিবার উপায়-সম্বন্ধে মহাজনগণ এইরূপ বলেন—

"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে ॥"

যিনি যেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিমার্গ যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেইরূপ যোগ্যতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তম অধিকারীর প্রাপ্য সম্মান দিলে বা মধ্যম অধিকারীর সহিত কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করিলে আদর সুষ্ঠুরূপে হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী, অমায়ায় কৃপার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়।

সুতরাং বৈষ্ণব চিনিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য, চিনিতে পারিলেই আদর বা মমতা স্বতঃই উদিত হয়। নিজের ভ্রাতাকে 'ভ্রাতা' বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের

মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা করে না। এই চেনা বা আপনজ্ঞানে, স্বজনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপন জ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, উহা অন্তরের অন্তরালে উপস্থিত ভোগপিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমত্ব বুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্ব্বসিদ্ধি অভ্যুদয়ের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয় বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণব চেনা বা তাঁহার প্রতি মমত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কয়েকটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত-দৃষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে যেমন দোষ দেখিতে পাই, সেইরূপ নানাপ্রকার গুণও দেখিয়া থাকি। বৈষ্ণবের স্নেহ, বিনীত ব্যবহার, স্বভাবসুলভ ক্ষমা ও উদারতা অনেক সময় আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। ঐ গুণগুলি বিচার করিয়াই আমরা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে উদ্যত হই। ঐ গুণগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি একটা মমত্বাভাসের জন্ম দান করে। এই প্রকার বাহ্যগুণদর্শনে স্বরূপ-বিচার ও সেই সকল অনুকূল গুণের প্রতি আকর্ষণজনিত মমত্ব-বোধ, উহাদ্বারা বাস্তবিক বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় কি না আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বৈষ্ণবকে চিনিতে

হইবে, আদর করিতে হইবে—তাঁহার বৈষ্ণবতার দিক্ দিয়া। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিকী সেবাপরতা। উহাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্য—ময়তা কি পরিমাণে আছে, তাহাই দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে **কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ,** বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। অন্য পঁচিশটী গুণ ঐ স্বরূপ-লক্ষণের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া উহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণগুলি থাকিবেই। বৈষ্ণব, অথচ তিনি মৃদু বা সুশীল নহেন এইরূপ হইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবতার তারতম্যানুসারে ঐ গুণগুলির বিকাশের তারতম্য হইতে পারে। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ঐ সকল গুণ সম্বন্ধে আমাদের যেইরূপ সাধারণ ধারণা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেইরূপ বলেন নাই। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে আমাদের এইরূপ ধারণা হয় যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবের যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, সেই সকল গুণ বৈষ্ণব ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ ইতর ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের গুণ কিছু অবৈষ্ণব ব্যক্তিতে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বৈকুণ্ঠশব্দের বাচ্যবস্তু এই জগতের বস্তুর ন্যায় সংকীর্ণ, অনিত্য বা স্থূল নহে। এই জগতে শব্দ যে সকল বস্তুকে উদ্দেশ করে, সেই সকল বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ। সুতরাং একই

গুণ বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিতে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব, এইরূপ বিচার নিতান্ত স্থূলদর্শিগণের নিকটেই আদর পাইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে "বদান্যতা" বৈষ্ণবের একটী গুণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন। "বদান্য" এই শব্দটী এইজগতে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে যে অর্থ নির্দ্দেশ করে, তাহা সাধারণ মানবে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে ঐ শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহা একমাত্র বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবের এই গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন কে? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতাকে আদর করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হইয়াছেন। **নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তির নিকটই বৈষ্ণবের গুনসকল যথার্থস্বরূপে প্রকাশিত হয়।** বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত এবং অনন্যসাধারণ গুণ তিনিই দর্শন করেন, তিনি উহাকে প্রাকৃতগুণসাম্যে দর্শন করিয়া অপরাধের আবাহন করেন না। সেবাবিমুখ আমরা কিন্তু এই বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে বৈষ্ণবকে দেখিবার রহস্য বুঝিতে পারি না। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবের স্নেহময়তা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসাও করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, **বষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে।** বৈষ্ণবের স্নেহ বা তাঁহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ, যাহা আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি আমাদিগকে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় প্রবুদ্ধ না করে, ঐ

সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বাস্তবিকপক্ষে বৈষ্ণবের গুণ আমাদের দর্শন হয় নাই। বৈষ্ণবোচিত গুণসকল বৈষ্ণবেই থাকিবে। প্রাকৃত চক্ষে দেখিতে গিয়া যদি বলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কবি ছিলেন, কিন্তু শিবানন্দ সেন অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সেইরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কবিত্বগুণটী দর্শন হইল না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে সাধারণ সাহিত্যিক মনে করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত কবিত্বরূপ একটী প্রাকৃত, আকস্মিকগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা হইল মাত্র।

প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব কৃষ্ণৈক-শরণতার দিক্ হইতে বৈষ্ণব দেখিতে পারেন না, বৈষ্ণবকে সাধারণ মানবসাম্যে দেখিতে গিয়া তাঁহাতে দোষ গুণাভাস ইত্যাদি দেখিয়া ফেলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের গুণাভাস দর্শনেই বৈষ্ণবতার বিচার করিয়া থাকেন। কোন বৈষ্ণবে সাধারণ মানবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, ঐ দিক্ দিয়াই তাঁহার বৈষ্ণবতা বিচার করেন। যদি কোন বৈষ্ণব তাঁহার ঐ গুণটী অপ্রকাশিত রাখেন, তাঁহাকে আর বৈষ্ণব বলেন না; আর যদিই বলিলেন, তাহা হইলে বলিবেন—ইনি বৈষ্ণব সত্য, কিন্তু ইহার অমুক বৈষ্ণবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য নাই। উহা সোনার পাথরবাটীর ন্যায় নিরর্থক বাক্য। বৈষ্ণবের দোষাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের অরুচিকর বলিয়া তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবের প্রতি অসূয়া-পরবশ হওয়া যেমন নিরয়-প্রাপক, বৈষ্ণবের গুণাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর

বলিয়া ঐ গুণ দর্শনে বৈষ্ণবের প্রতি মমতামুক্ত হওয়াও তদ্রূপ অপরাধজনক। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শকের দৃষ্টি প্রাকৃতত্বেই বদ্ধ। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে গিয়া আমরা যেন প্রাকৃতগুণবিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত গুণহীন কোন ব্যক্তি বিশেষ না চিনিয়া বসি।

অনেকে বলিয়া থাকেন—বৈষ্ণব চিনতে নারে দেবের শকতি।" আমরা অসহায় দুর্ব্বল মানব, অজ্ঞ ও মূর্খ, বৈষ্ণব কি প্রকারে চিনিব? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা কি প্রকারে বুঝিব? সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবের কৃপায় অবিশ্বাস যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন অনুরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক আসিয়া বৈষ্ণবের কৃপালাভে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। কোন বৈষ্ণব এই প্রশ্নের অতি সুন্দর এবং সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন – দেবগণও বৈষ্ণব চিনতে পারেন না এই কথা সত্য। কিন্তু সেইজন্য আমি কেন ভীত হইব? দেশের সম্রাট্ আমার জননীকে না চিনিতে পারেন, কিন্তু সেইজন্য ক্ষুদ্রশিশু আমার পক্ষে আমার জননীকে চিনিতে বাধা নাই। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন জননীকে জননী বলিয়া জানিতাম না, তাঁহার স্নেহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। কিন্তু আমি জানিতাম না বলিয়াই যে আমার জননী তখন জননী ছিলেন না বা আমি মাতার স্নেহ হইতে তখন বঞ্চিত ছিলাম, তাহা নহে। মাতাকে মাতৃরূপে আমি না চিনলেও তখন মাতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার স্নেহ হইতে তখনও আমি

বঞ্চিত হই নাই। মাতার স্নেহে পুষ্ট হইয়াই আমি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া মাতার সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এবং মাতৃস্নেহ কি বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছি। শিশুকালে মাতাকে চিনিতাম না, তজ্জন্য মাতার স্নেহ আমার প্রতি বর্ষিত হইলেও উহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু মাতার স্নেহ যত্নে যখন পরিণতবয়স্ক হইলাম, তখন মাতার স্নেহ ও কৃপাতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি মমতাযুক্ত হইলাম। সাধক ভক্ত মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া" তাঁহার প্রতি মমত্ব স্থাপন করেন। তখনই তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। মধ্যম অধিকার লাভ করাও বৈষ্ণবেরই কৃপাসাপেক্ষ। বৈষ্ণবের কৃপা সর্ব্বকালেই ক্রিয়াবতী। অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখ জীব কনিষ্ঠাধিকারে নাম সেবা করিবার প্রবৃত্তিও বৈষ্ণবের কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী উহা উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহাই তাহার কনিষ্ঠত্ব। কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যম অধিকারে উন্নীত করায়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদর যুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য; তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটী উপলব্ধি করাই আমাদের প্রয়োজন। তাহা তাঁহাদের কৃপাবলেই হইয়া থাকে; তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইব কেন?

বৈষ্ণবকে আত্মীয় জ্ঞানে কতটা আদর করিতে পারিয়াছি,

ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে – অবৈষ্ণবে অনাত্মীয়-জ্ঞানে কতটা ঔদাসীন্য বা অনাদর করিতে পারিয়াছি – এই জ্ঞান অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয় জ্ঞান হইবার আশা নাই। যে পরিমাণে অবৈষ্ণব-কে পর বুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে এ কেবল মুখের কথা নহে। সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এবং তথাকথিত আত্মীয় স্বজন এমন কি আমাদের দেহ বা মনও যদি বৈষ্ণব সেবার বিরোধী হন, তাহা হইলে সেই চৈতন্য-বিমুখ নিজজনগণকে প্রকৃতপক্ষে পর জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবকে আত্মীয় জ্ঞান করা – কেবল ছলনা মাত্র। অবৈষ্ণবকে আত্মীয় জ্ঞান নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয়বুদ্ধি আছে ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, আত্ম এবং পরবঞ্চনামূলক বাক্য।

জ্ঞান, কর্ম্মাগ্রহ ও অন্যাভিলাষ, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্ত, ইহাদের সম্বন্ধে যাঁহার যে পরিমাণ দুর্ব্বলতা আছে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহাদের অপেক্ষা যাহার যে পরিমাণে আছে – বৈষ্ণবের সহিত প্রীতি সম্বন্ধ-যুক্ত হইবার আশা তাঁহার তত কম। আমাদের হৃদয়স্থিত অনর্থ-রাশি বৈষ্ণবের প্রতি আত্মীয় বুদ্ধি হইবার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। ঐ সকল অনর্থের প্রতি যদি মমতা থাকে অর্থাৎ ঐ সকল অনর্থ

দূর করিবার নামে যদি হৃদয়ে ক্লেশ বোধ হয়, যদি উহা দূর করিতে না চাই, তাহা হইলে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসে না। অনেক সময় আমাদের হৃদয়স্থিত অনর্থগুলিকে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তজ্জন্য সেগুলিকে পরিহার করা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য এই অনর্থগুলির বাহ্য প্রতীক কতকগুলি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। কনক-পিপাসা, কামিনী-লোভ, প্রতিষ্ঠাশা, লাভ, পূজাপ্রাপ্তি- বাসনা, বৈষ্ণবরূপে, গুরুরূপে হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রাপ্য যাবতীয় বস্তু আত্মসাৎ করিবার দুর্ব্বাসনা প্রভৃতি সকল প্রকার অনর্থ রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়া থাকে। আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি যদি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে ঐ অনর্থটী আমাদের হৃদয় কলুষিত করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে। কে কোন্ অনর্থের প্রতিমূর্ত্তি, তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জানিতে পারা যায়। অনর্থ-পরিহারে, দুঃসঙ্গপরিত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না।

—:০:—

অভিনিবেশ

গত শ্রীঊর্জ্জাব্রতকালে শ্রীমথুরায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিজের দুর্দ্দৈব ও দুঃখের কথা নিবেদন করিয়া কি ভাবে আমার মঙ্গল হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলাম—"পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি অশেষ-পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌর-জন আচরণ, শিক্ষা ও বাণীর দ্বারা আমাদিগের জন্মজন্মান্তরের কত কত সন্দেহ নিরাস করিয়া বাস্তব জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, কিন্তু আমি এতটা আত্মম্ভরি হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহাদের বাণী-সমূহ একঘেয়ে ও পুরাতন বলিয়া মনে হয়, অথচ এই দেহ-গেহা-শক্তি আর পুরাতন হইতেছে না। 'শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম' - শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নিকট এই কথা সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিবার পরিবর্ত্তে 'আমি বুঝ্‌দার' এই বুদ্ধি যাইতেছে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা—'**বড় আমি হইও না, ভাল আমি হও।**' – ইহা মুহুর্ত্তের জন্যও কর্ণে গ্রহণ করিতেছি না। কেবল কতকগুলি বুলি শিখিয়াছি, পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করিতে জানি, আচরণ করিবার সময় আমার স্বরূপ ধরা পড়ে। কোন কোন সময় শরণাগত হইবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করি-বার অভিনয় করি বটে, সময় সময় অন্তর হইতে আকাঙ্ক্ষাও জাগে, কিন্তু সেই শরণাগতি ও কৃপার প্রার্থনা 'হস্তিস্নানে'র ন্যায় সাময়িক হয়। এই আর্ত্তি, এই আকাঙ্ক্ষা কিরূপে সুতীব্র ও চিরস্থায়ী হইতে পারে?"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, – 'অভিনিবেশ না হইলে স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-লীলা-চরিতাদিতে অভিনিবেশ প্রয়োজন। এই অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে বাস্তব (positive) মঙ্গল পাওয়া যাইবে। অভিনিবেশই - অর্থ-প্রবৃত্তি। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিক-ভাবেই হইয়া যায়।'

অভীষ্টবস্তুর শ্রীশ্রীনাম-রূপ-গুণ-চরিতাদি সম্যক্ ও অনুক্ষণ অনুসরণাদিতে চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া ও তাঁহাদের অনুরাগী জনগণের অনুগামী হইয়া জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই সমস্ত উপদেশের সার। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশেও আমরা পাইয়াছি,—

"সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা করিবে, তাহা হইলে জড়বিষয়জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না।" —(পত্রাবলী ৩য় খঃ ৩১ পৃঃ)

আশ্রয়জাতীয় অভীষ্ট অর্থাৎ শ্রীগুরুবর্গের সেবা রসের আলোচনা সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের শ্রীনাম, শ্রীগুণ ও শ্রীচরিতাদি আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীচরিত-আলোচনার মধ্যে তাঁহাদের শ্রীরূপ দর্শন হইবে। নতুবা কৃত্রিমভাবে শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাদি শ্রীগুরুবর্গের রূপ কল্পনার দ্বারা মনে মনে অঙ্কন অথবা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদাদি গুরুবর্গের আলেখ্য মাংসচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের

প্রতি জরাদি-ধর্ম্মের আরোপ করিলে মর্ত্ত্যবুদ্ধিজনিত দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হইবে। আমাদের অদ্বিতীয় অভিনিবেশ প্রয়োজন। একমাত্র সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণচরিতাদি সাধুসঙ্গে অকপটে শ্রবণ কীর্ত্তন ও অনুস্মরণাদির দ্বারা সেই অভিনিবেশ উপস্থিত হইতে পারে। শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাবে অভিনিবেশ হয়। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গেই নৈরন্তর্য্য না হইলে অভিনিবেশ হইতে পারে না। সাময়িক উচ্ছ্বাস অথবা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তি-মুক্তির লোভে সাধুজীবন-যাপনের শুভেচ্ছা-মাত্র, — অভিনিবেশ নহে।

কোন বিশেষ আশ্রয়বিগ্রহের সেবাদর্শের অনুসরণে লোভ উদিত হইলে অতি শীঘ্র অভিনিবেশে প্রগাঢ়তা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীতুলসী, শ্রীযমুনা, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি তদীয় বস্তুর সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত অবস্থান করিলে অভিনিবেশের আনুকূল্য হয়। এই জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদির অনুশীলন করিতে করিতে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাই মঠ— "মঠন্তি বসন্তি ছাত্রা যস্মিন"। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদির সম্যক্ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুক্ষণ অনুস্মরণাদিতে মনকে নিযুক্ত করিয়া শ্রীব্রজে বাস। **এইরূপ মঠে বাস ও ব্রজে বাস একই কথা।** মঠবাস কালে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের দর্শন— অকপটগণের পক্ষে সুদুর্ল্লভ নহে। আমাদের কোন যোগ্যতা, প্রাকৃত দক্ষতা থাকুক্, আর না-ই থাকুক্, যদি সম্পূর্ণ অকপটতা ও সেবোন্মুখতা থাকে, তাহা

হইলে পরম কৃপাময় পরদুঃখদুঃখী শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহার সঙ্গ-দানের জন্য তথায় পরিভ্রমণচ্ছলে শুভাগমন করিবেন, অথবা যে-কোনরূপেই হউক আমাকে সঙ্গদান করিবেন। আমরা যে-কোন মঠে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করি না, ইহা **বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপার অভাব নহে, পরন্তু আমাদের অকপট সেবোন্মুখতার অভাব।** যে-স্থানে সেবোন্মুখতা ও সরলতা, তথায় বৈষ্ণবঠাকুরগণ অযাচিত-ভাবে বিজয় করেন, ইহা ধ্রুব সত্য। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের দর্শন যে মঠে সুলভ হয় না, তথায় যাহাতে সেই মঠের সেবকসূত্রে আমরা অকপট, সরল ও সেবোন্মুখ হইতে পারি, তজ্জন্য অনুক্ষণ আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। তথায় **শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবরূপী শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীশুদ্ধভক্তি-গ্রন্থসমূহের শিক্ষা, উপদেশ ও শ্রীগুরুবর্গের ব্যাখ্যা ও বিবৃতিকে শিক্ষক ও গুরুজ্ঞানে নিজের কুতর্ক-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ শাসনযোগ্য শিষ্যাজ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গ** অর্থাৎ সেই শিক্ষা ও উপদেশানুসারে বাস্তবভাবে অকপটে নিজের জীবনযাপনের অকৃত্রিম প্রযত্ন এবং **মঠরূপী শ্রীশ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবাভিন্ন শ্রীধামের প্রতি অকৃত্রিম, অকপট হার্দ্দী আর্ত্তি ও দীনতার সহিত শ্রীনাম-প্রভু, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীতুলসীর সেবনরূপ সঙ্গ হইলে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চেতনময় অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ ও অনুশীলন হয়।** এইরূপভাবে মঠে-বাস করিলে আশ্রয় বিগ্রহগণের শ্রীপাদপদ্মে অভিনিবেশ হইয়া থাকে।

কিন্তু মঠ বাসের অভিনয় করিয়াও আমাদের শ্রীব্রজে বাসের

পরিবর্ত্তে গ্রামে বাস, শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিনিবেশের পরিবর্ত্তে লঘুতে অভিনিবেশ, অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়াভিনিবেশ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার মূল কারণ, আমাদের ভক্তিরাজ্যের মূল ভিত্তি ও প্রথম সোপান 'শ্রদ্ধা'র অভাব। শ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদিতে শ্রদ্ধা নাই, তাহাতে পূর্ণমাত্রায় মর্ত্ত্যবুদ্ধি রহিয়াছে। কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়া আমরা বঞ্চিত হইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিপদের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"কোমল-শ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ। তাঁহারা অন্তর্দ্দর্শী নহেন, তাঁহারা কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।"

—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৭০ পৃঃ)

শ্রীগুরুবর্গের প্রতি, আশ্রয়বিগ্রহগণের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হইলে শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদির অনুশীলন-রূপ সঙ্গ হয় না, অতএব অভিনিবেশও হয় না। যাহার যে-বিষয়ে রুচি ও লোভ, সেই-বিষয়েই তাহার অভিনিবেশ উদিত হয়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, কামুকের কামের প্রতি লোভ আছে বলিয়া তত্তদ্‌বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে অভিনিবেশ হয়, শাসন বা দণ্ডের প্রয়োজন হয় না।

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

(শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা—১২)

মূঢ় ব্যক্তিগণের বিষয়-সকলে যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি,

তোমার নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন অবগত না হয়।

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥

যুবতীগণের মন যুককে এবং যুবকগণের মন যুবতীতে যেইরূপ রত হয়, আমার মন আপনাতে তদ্রূপ রত হউক।

লালসা অভিনিবেশের জননী। আমাদিগের দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত যে সুতীব্র ও নৈসর্গিক সহজ অভিনিবেশ, তাহা বিদূরিত করিতে প্রকৃত প্রস্তাবে অনুরাগের পথই অধিক শক্তিশালী। কিন্তু অনুরাগ অত্যন্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নিকট বন্ধ্যার পুত্রস্নেহের ন্যায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনুভূতিহীন বলিয়া তাহার পক্ষে বিধি অধিক উপযোগী। অনুরাগের পথের অনুকরণ করিতে গিয়া অনর্থযুক্ত জীব বিধি-পথের নিশ্চিত ক্রম-মঙ্গলকেও হারাইয়া ফেলে। এইজন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনর্থযুক্তকে অনুরাগের কথা খুব সতর্কভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। ক্রমশঃ মঙ্গল-লাভ বরং লাভ, তথাপি শীঘ্র শীঘ্র মঙ্গল-লাভের ছলনা করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হওয়ার ন্যায় দুর্ভাগ্যের চরম সীমা আর কিছুই নাই। বিধি-পথে ধাপে ধাপে ভক্তিসৌধের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠা যায়। কিন্তু রাগের পথটি বৈদ্যুতিক সোপানের (Electric lift) ন্যায় সুতীব্র গতিতে সেই স্থানে অবিলম্বে পৌঁছাইয়া দেয়। আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে

রাগ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব অদ্বিতীয় বিষ
রাগ ও অভিনিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশ হই
নিষ্কৃতি নাই।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ বহু শাখায় বিভক্ত হইলেও উহা দুই
প্রধান শাখা-অবলম্বনে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই-
(১) জাত্যভিনিবেশ ও (২) ক্ষিত্যভিনিবেশ।

জাত্যভিনিবেশ হইতে দেহাত্মবোধ, স্বজনাত্মবোধ, জাতীয়
সামাজিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সুনীতি ও দুর্নীতি
পোষাকে পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষিত্যভিনিবেশ অর্থাৎ এই পৃথিবী
মাটির প্রতি অভিনিবেশ; তাহা হইতেই গৃহাত্মবোধ, দেশা
বোধ প্রভৃতি দ্বিতীয়াভিনিবেশ-সমূহ কখনও দুর্নীতি, কখনও
সুনীতির পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়।

এই সকলই বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। বদ্ধজীব বদ্ধাবস্থাকে চিরস্থা
মনে করিয়া তন্মধ্যে সুবিধা করিয়া লইবার জন্য যে-সকল নীতি
ধর্ম্ম, আইন-কানুন ও সুযোগ-সুবিধার অনুসন্ধান করে, তাহা
দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্মের অনুশীলনে বদ্ধজীবে
স্বাভাবিকী রুচি হয় ও দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনেবেশ অধিকত
বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

এইরূপ নৈসর্গিক অভিনিবেশ হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে
হইলে অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত শ্রীবিষয়বিগ্রহে
অভিনিবেশ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশ্রীআশ্রয়বিগ্রহবর্গের
আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলা এই অভিনিবেশকে পরিপুষ্ট করে।

বিরহে অভিনিবেশ অধিকতর সহজ ও সুতীব্র হয়। পার্থিব বা লৌকিক গুরুবর্গের শোকে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, আর আশ্রয়বিগ্রহগণের অপ্রাকৃত বিরহানুভূতিতে অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়। আশ্রয়বিগ্রহগণের বিরহ-জনিত বিলাপ, আক্ষেপ, কার্পণ্য-পঞ্জিকা, দর্শন-লালসা, বিজ্ঞপ্তি, আর্ত্তি-নিবেদন, কৃপা-প্রার্থনা যদি অকপটভাবে হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে অতি সহজে অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ সঙ্কুচিত ও বিলীন হইয়া যাইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই অভিনিবেশের কথা তাঁহার "গীতমালা"য় (যামুনভাবাবলী—১২) গান করিয়াছেন,—

তব পদ-পঙ্কজিনী জীবামৃত-সঞ্চারিণী
অতি ভাগ্যে জীব তাহা পায়।
সে অমৃত পান করি' মুগ্ধ হয় তাহে, হরি !
আর তাহা ছাড়িতে না চায়॥
নিবিষ্ট হইয়া তায় অন্যস্থানে নাহি যায়
অন্য রস তুচ্ছ করি' মানে।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত মধুব্রত কদাচিত
নাহি চায় ইক্ষুদণ্ড-পানে॥
এ ভক্তিবিনোদ কবে সে—পঙ্কজস্থিত হ'বে
নাহি যাবে সংসারাভিমুখে।
ভক্তকৃপা, ভক্তিবল এ দুইটী সুসম্বল
পাইলে সে স্থিতি ঘটে সুখে॥

—ঃ ০ ঃ—

স্বারসিকী সেবা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া একটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব্ব, ২লঃ, ২৭২) 'স্বারসিকী' 'পরমাবিষ্টতা' কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

"ইষ্টে **স্বারসিকী** রাগঃ **পরমাবিষ্টতা** ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্‌ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

অভীষ্টবস্তুতে যে স্বাভাবিকী ও তদভিনিবেশময়ী সেবাপ্রবৃত্তি, উহার নাম 'রাগ'। এইরূপ রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধভক্তি-সাহিত্যে 'রাগাত্মিকা' বলিয়া কথিত।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু 'দুর্গম-সঙ্গমনী'তে 'স্বারসিকী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'স্বাভাবিকী' অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বভাব হইতে উদিতা সেবাপ্রবৃত্তি। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' স্বারসিকী শব্দের তাৎপর্য্য বলিয়াছেন,—'স্বীয় সিদ্ধরসোপযোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ় তৃষ্ণাময়ী (সেবন প্রবৃত্তি)।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রূপপাদের উপরি-উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদে বলিয়াছেন,—

"ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা—তটস্থ লক্ষণ কথন॥

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৬-১৪৮)

অতএব 'স্বারসিকী সেবা' নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের রসোপযোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণাময়ী ও অপ্রাকৃত-ব্রজবাসীর আনুগত্যময়ী সেবাপ্রবৃত্তি। স্বারসিকী সেবা অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধরাগাত্মিক ব্রজ-জনগণেরই একমাত্র সম্পত্তি। যে অপ্রাকৃত সহজ-সেবা প্রবৃত্তিতে রাগাত্মিকব্রজ-জনের আনুগত্যপূর্ণ স্বাভাবিক গাঢ়তৃষ্ণারূপ স্বরূপ-লক্ষণ আছে, তাহাই স্বারসিকী সেবা।

'স্বারসিকী সেবা' কথাটির যথেষ্ট ব্যভিচার বিদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে ও তাহাদের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার 'অনর্থ-গ্রস্ত, কামক্রোধাসক্ত বদ্ধজীব তাহার ইন্দ্রিয়তর্পন বা প্রেয়ঃকে যদি স্বারসিকী সেবার কৃত্রিম ময়ূরপুচ্ছ লাগাইয়া সাজাইতে চাহে, তাহা হইলে উহাকে 'স্বারসিকী সেবা' বলা যাইতে পারে না। অনর্থগ্রস্ত জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণময়ী যথেচ্ছাচারিতা 'স্বারসিকী-সেবা' নহে।

অন্তরে-নির্বিবশেষবাদী এক প্রসিদ্ধ বক্তা তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে 'স্বারসিকী সেবা'র আদর্শ উদাহরণরূপে তাঁহার নিজের মহিমা প্রখ্যাপন করিয়া এক সময় বলিতেছিলেন যে, তিনি

গোপালের সেবা করেন এবং গোপালকে জীবন্ত পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। তিনি এক শীতকালের রাত্রে বক্তৃতা করিবার জন্য নিজের গৃহ হইতে কএক মাইল দূরে গমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করিতে করিতে তাঁহার গোপালের কথা স্মরণ হইল, তিনি সেদিন ভুলক্রমে গোপালের ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন; শীতকালের রাত্রিতে শিশুরূপী-গোপালের ঠাণ্ডা লাগিতেছে ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন এবং বক্তৃতা অর্দ্ধসমাপ্ত হইতে না হইতেই সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণ-পিপাসা অতৃপ্ত রাখিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে নিজ-গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন ও অবিলম্বে গোপালের ঘরে গিয়া গোপালের ঠাণ্ডা লাগিয়াছে ভাবিয়া অতি সত্বর 'চা' প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া গোপালকে চা খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইলেন ও স্বয়ং গোপালের অবশেষ 'চা' প্রসাদ পান করিলেন।

উক্ত কথকের এই 'স্বারসিকী সেবা'র আদর্শ দৃষ্টান্ত শুনিয়া সভাশুদ্ধ সকল লোকই করতালি-ধ্বনির দ্বারা উক্ত সেবকের জয়-গান করিয়াছিলেন। উক্ত কথকের সহিত আলাপ করিয়া পরে জানা গিয়াছে যে, তিনি একজন মায়াবাদী যোগীর শিষ্য ও চরমে অর্থাৎ সিদ্ধিতে তিনি ও স্বয়ং 'গোপাল' বা 'ব্রহ্ম' হইয়া যাইবেন এইরূপ বিচার-বিশিষ্ট! আর একজন "গোস্বামী" নাম ধারী গুরু (?) জনৈক প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিনীকে 'মা' ডাকিয়া গোপালভাবে ঐ রমণীর ক্রোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক স্তন্য পান করিতেন এবং উক্ত রমণীও গোপালভক্তকে কখনও প্রহার,

কখনও চুম্বন, কখনও নানাভাব-মুদ্রা স্নেহ প্রদর্শন করিয়া স্বারসিকী সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেন! পূর্ব্বোক্ত কথকটি কিছু শাস্ত্র দেখিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার ঐরূপ স্বারসিকী সেবা শাস্ত্রসম্মত কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

"লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৮)

এই বাক্যদ্বারা উক্ত পণ্ডিত বক্তা বলিতে চাহিতেছিলেন যে, তিনি ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তিনি শাস্ত্রযুক্তির ধার ধারেন না! যাঁহারা এই বিচারের শ্রোতা ছিলেন, তাঁহারাও উক্ত কথককেই সমর্থন করিয়া বলিলেন,—'ইনি মহাভাগবত, গোপালের সহিত কথা বলেন, গোপালও ইহার সহিত কথা বলেন, ইহার কাছে আবার শাস্ত্রযুক্তি কি? গোপালের সেবায় এইরূপ পরমাবিষ্টতা কি রাস্তা ঘাটের লোকে দেখিতে পাওয়া যায়?

পাঠকগণের কেহ কেহ উক্ত সেবকের সেবা-চেষ্টাকে 'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া সমর্থন করিবেন কি না, জানি না! কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপরি উক্ত পদ্যানুবাদের মধ্যেই সকল কথার সমাধান করিয়াছেন। আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ। তাহা রাগের স্বরূপ-লক্ষণ নহে। বিশেষতঃ আবিষ্টতার প্রতিবিম্ব ও কৃত্রিমতা বা অচেতন ভোগ্যদর্শনে যে জড় আবিষ্টতা, তাহা রাগ

হইতে বহুদূরে অবস্থিত। গোপালের ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বলিয়া হৃদয়ে দুঃখানুভব ও তজ্জন্য আবিষ্টতার বাহ্য অভিনয় দেখিয়াই উহাকে স্বারসিকী সেবা বলা যাইবে না। অঘটনঘটন-পটীয়সী মোহিনী মায়া এমনই মনোহারিণী ছদ্মবেশী হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে যে, আমরা ভোগকেই 'সেবা' বলিয়া মনে করি। নিজের চা-পানে 'গাঢ়তৃষ্ণা' হয় ত' অনেক সময় লোকমনোহারিণী স্বারসিকী সেবা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। আবার নিজের শৈত্য-বোধকেই হয়তো 'গোপালের শৈত্য (?) বলিয়া বিবর্ত্তও হইতে পারে। যাহার ইষ্টবস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানই হইল না, তাহার গাঢ়তৃষ্ণা বা আবিষ্টতার অভিনয় কেবল আত্মছলনা পরবঞ্চনা মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদী, কর্মী, জ্ঞানী: যোগী বা মিছাভক্তের গোপাল (?) তাঁহাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ছাঁচে গড়া অনিত্য পুতুল, তাহা গো-পাল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পালক বা নিয়ামক নহে। যে গোপাল (?) জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়মিত অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য, তাহা জীবের ইন্দ্রিয়ের আসামী মাত্র। দ্বিতীয়তঃ গোপাল-ভক্ত কখনও নিজে গোপালের আসন গ্রহণ করেন না। আমরা অপ্রাকৃত গোপাল-ভক্তের আদর্শ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের মধ্যে দেখিতে পাই, – 'লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।' এই দুইটি পদের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ভবভীত ব্যক্তিগণের জন্য যে সকল শাসন-বাক্য বা শাস্ত্র, তদ্দ্বারা নিয়মিত হইয়া নন্দনন্দনের সেবাতে প্ররোচিত হন না। শ্রীল পুরীপাদ নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ব্রজবাসী। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে যে নন্দাদি অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের আনুগত্যময়ী নিজ-সিদ্ধরসোপযোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণা আছে, তাহাই অবিকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্তরূপে শোভা বিস্তার করিয়া প্রকাশিত হয়। অতএব সেই অপ্রাকৃত সেবাশোভা কিছু শাস্ত্র বা মহাজনগণের আচরণ বিরুদ্ধ নহে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী নিজে বিষয়বিগ্রহ 'গোপাল' বা বিষয়বিগ্রহ গোপালের মূল বাৎসল্যরসাশ্রয়বিগ্রহ 'নন্দ' হইবার কু-বুদ্ধির আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কখনও নন্দের আনুগত্য-ব্যতীত নিজের স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বতন্ত্রভাবে গোপালের সেবা করিতে যান নাই। রাগাত্মিক নন্দাদি ব্রজবাসিগণ যেইভাবে গোপালের সেবা করেন, তাঁহাদের সেই নিত্যসিদ্ধা রাগাত্মিকা সেবার যে আনুগত্য, উহারই নাম ব্রজবাসীর ভাবে লোভ। শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরী গোপালকে ক্ষীর ভোগ লাগাইবার জন্য যে ক্ষীরের আস্বাদ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, উহাতে 'তাঁহার কি ব্যক্তিগত লোভ উপস্থিত হইল ?' এইরূপ বিচার করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া তিনি যে লোকশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত স্বারসিকী সেবার সেবকের আদর্শ। নেশাখোরের চা পান করিবার গাঢ়তৃষ্ণা ও তজ্জন্য

ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইবার চেষ্টাকে স্বারসিকী সেবা বলা যাইতে পারে না। অপ্রাকৃত শ্রীনন্দের গোপাল, শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল অনিত্য গোপাল নহেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী বা নেশা-খোরের কল্পিত গোপাল (?) অনিত্য কাঠ পাথর বা পিতলের পুতুল।

অনেক বালক বালিকা বাল্য বয়সে গোপাল-মূর্ত্তি প্রভৃতি লইয়া শিশু স্থলভ পুত্তলক্রীড়া করিয়া থাকে এবং গৃহব্রত-ধর্ম্মী মাতা-পিতার অনুকরণ করিয়া ঐরূপ পুতুলের পরিচর্য্যাদিও করিয়া থাকে। তাহাতে ঐ সকল শিশুর বেশ (ভোগ্য জড়) আবিষ্টতাও লক্ষিত হয়। কিন্তু কিছু বয়স হইলেই অর্থাৎ বালিকার বিবাহাদি হইলে কিংবা বালকের অধ্যয়নাদিতে অধিক আবিষ্টতা হইলে তাহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রীড়নক-স্বরূপ ভোগ্য পুত্তল-সদৃশ গোপাল-মূর্ত্তি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে।

জনৈকা বালিকা প্রত্যহ গোপাল-মূর্ত্তিকে দুগ্ধপান না করাইয়া নিজে কিছু ভোজন করিত না। নিজে অলঙ্কার না পরিয়া, মাতা-পিতাকে অনুরোধ করিয়া গোপালের অলঙ্কার গড়াইয়া দিত। বালিকাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিল এবং সর্ব্ববিষয়ে প্রথম হইতে লাগিল। পরীক্ষকগণ যখনই ঐ বালিকার পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিতেন, তখনই দেখিতে পাইতেন, খাতার পাতায় পাতায় গোপালের নাম লেখা ও প্রত্যেক পাতায় তুলসী, চন্দন ও পুষ্প। কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য পরী-ক্ষকগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে,

বালিকাটী গোপালের পরম সেবিকা এবং ঐ সকল ফুল-তুলসী-চন্দনাদি গোপালেরই নির্ম্মাল্য। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থিনী বালিকাটি বিশেষ অসুস্থা হইয়া পড়িল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিল না। ইহার পর হইতে বালিকা গোপালের যাবতীয় 'স্বারসিকী সেবা' (?) ছাড়িয়া দিল। যাঁহারা এতদিন বালিকার ঐরূপ ভোগচেষ্টাকে অর্থাৎ গোপালের দ্বারা পরীক্ষা পাশ করাইয়া লইবার দুরভিসন্ধিকে স্বারসিকী সেবার আদর্শ বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে এইবার কিছু জল গেল। তথাপি তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না ; কিন্তু যাঁহারা অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহাদের এইরূপ অসংখ্য প্রকার কপটতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আত্ম-ভোগেচ্ছা কিরূপ ভাবে স্বারসিকী সেবার সজ্জা পরিধান করিয়া লোকবঞ্চনা করে, তাহা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী একজন অবসর-প্রাপ্ত ও প্রসিদ্ধ জজ সাহেবের বিশিষ্ট বন্ধু পরমগৌরভক্ত বলিয়া প্রচারিত ছিলেন। জজসাহেব এক সময় লক্ষ্ণৌতে আমাদের গুরুদেবের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বন্ধু পূর্ব্বে গৌরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সকল সময় 'গৌর' 'গৌর' নাম উচ্চারণ করিতেন, গৌর ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না ; কিন্তু যখন তাঁহার একমাত্র কন্যা মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন, তখন হইতে তিনি মহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত চটিয়া গিয়া-ছেন। তাঁহার কন্যাকে যে-মহাপ্রভু বাঁচাইতে পারিলেন না,

জজ সাহেবের বন্ধুর বিচারে সেই মহাপ্রভুর অস্তিত্বই নাই! তদুত্তরে আমাদের আচার্য্যদেব উক্ত বিজ্ঞ জজ বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর গৌরভক্তি কতটা অকৃত্রিম বা কৃত্রিম ছিল, তাহা মহাপ্রভু জজসাহেবের বন্ধুর কন্যাকে সরাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্তাবকগণকে চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিবার বিশেষ সুযোগ দিয়াছেন। অনেক সময় পুত্র-কন্যাসক্তি ভগবদাবিষ্টতা বলিয়া বঞ্চিত লোকগণের বিবর্ত্ত উৎপাদন করে। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৌরভক্তি কিন্তু জজ সাহেবের বন্ধুর গৌরভক্তির ছলনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক সময় বদ্ধদশাগ্রস্ত আমাদের যে সকল বস্তু খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়, সেইগুলিকে আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবার ছলনাকে 'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া থাকি! কেহ কেহ বলেন, ইহাদ্বারা অনর্থযুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল সম্ভাবনা। যেমন, – আমার হয় ত' মোচা খাইবার লোভ আছে, আমি মোচা পাক করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবায় লাগাইলাম, তাহাতে মোচার প্রতি আমার ভোগ্যবুদ্ধি হ্রাস হইল অর্থাৎ মোচা আমার ভোগে না লাগাইয়া কৃষ্ণের ভোগে লাগাইলাম, ইহা মন্দের ভাল বটে, অর্থাৎ কর্ম্মীর মত নিজের জন্যই মোচাটি সংগ্রহ করিয়া নিজেই উহাকে ভোক্তৃ অভিমানে ভোজন করিবার চেষ্টার ন্যায় ভোগেচ্ছা আপাততঃ দেখা না গেলেও ইহাতে কপটতা প্রবেশ করিলে ইহা প্রচ্ছন্ন কর্ম্মচেষ্টাও হইয়া যাইতে পারে; এমন কি, কর্ম্মচেষ্টার কপট হীন সংস্করণও হইতে পারে। মোচাটি আমি খাইব বা কোন না কোনভাবে মোচার ভাগ পাইব, এইরূপ

ভোগানুসন্ধানের সহিত মোচা সংগ্রহ-পূর্ব্বক উহা একবার ঠাকুরকে দেখাইবার ছলনা করিয়া যদি ভোগ্যবুদ্ধিতে ভোগ করি, তবে শ্রীবিগ্রহকে ঐরূপ দেখাইবার ছলনাটি 'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া গণিত হইবে না : তাহা কপটতা ও ভোগবুদ্ধি। স্বারসিকী সেবার ছলনা করিয়া অনেকে অনেক প্রকার স্বপ্নাদিও দেখিয়া থাকেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহজ-সমাধিরূপ স্বপ্নে গোপালের জন্য মলয়জ-চন্দনাদি-সংগ্রহ চেষ্টা এক কথা, আর কেহ স্বপ্নে ভগবান্‌কে পায়সান্নভোগ, কেহ বা 'চা' ভোগ, কেহ বা 'রাবড়ী, ভোগ দিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে অন্তরের অন্তঃপুরে অতি গুপ্তভাবে লুক্কায়িত কোন প্রকার কপটতা আছে কিনা, তাহা সদ্‌-গুরুপাদপদ্মের বাণীরূপী রঞ্জনরশ্মি-দ্বারা পরীক্ষা করা আবশ্যক। রাবড়ী বা পায়সান্ন ভোগ দিবার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া উহা প্রকৃত বৈষ্ণবকে নিঃশেষে ভোজন করাইয়া দিলে হয় ত' ভোগবুদ্ধি সঙ্কু-চিত হইতে পারে। যদি প্রকৃত বৈষ্ণব উহা কৃপা-পূর্ব্বক গ্রহণ করেন- তবে আমার কপটতাময়ী ভোগবুদ্ধি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে পারে।

এক সময় অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক উকীল ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিতে কুলিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু উক্ত উকীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন – 'আপনি কোথায় আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন ?' উকীল বাবু বলিলেন, 'আমি মহাপ্রভুর পাড়ায় অমুক গোস্বামীর বাড়ীতে মহাপ্রভুর প্রসাদ

গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছি।' তাহাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন. 'আপনি উহাদের হাতের রাঁধা অন্ন খাওয়া পরিত্যাগ করুন ; নিজ হাতে রাঁধিয়া খান। তাঁহারা মৎস্য আহার করেন আবার মহাপ্রভুর সেবার ছলনাও করিয়া থাকেন ! যখন তাঁহাদের কন্যা বা জামাতা কিংবা বৈবাহিক বাড়ীতে আসেন, তখন তাঁহারা মহাপ্রভুকে ভাল ভাল ভোগ দেন। কন্যা বা জামাতাকে খাওয়াইবার জন্য মহাপ্রভুকে পায়স ভোগ দিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ীর হাতে মহাপ্রভু কিছু গ্রহণ করেন না। ইহাদের অপরাধের ভয় নাই, ইহাদের সহিত বাক্যালাপেও ভজন বিনষ্ট হয়।'

ইহার পর আর একদিন উক্ত ভট্টাচার্য্য উকীলবাবু কিছু মিষ্ট দ্রব্য মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণের জন্য অত্যন্ত সকাতরে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজ বলিলেন,- 'আমি মিষ্টদ্রব্য ভোজন করি না' ; তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, – মহাপ্রভুর প্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই।' ইহাতে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"যাহারা মৎস্যাদি খাইয়া মহাপ্রভুর ভোগ (?) দেয়, অথবা যাহারা কোন প্রকার অন্যাভিলাষের সহিত মহাপ্রভুর ভোগ দিবার ছলনা করে, তাহাদের দ্রব্যে মহাপ্রভুর ভোগ হয় না নিজে মোচার ঘণ্ট খাইবার ইচ্ছা করিয়া, মহাপ্রভুর মোচার ঘণ্টের প্রতি প্রীতির উদাহরণ দেখাইয়া মোচার ঘণ্ট ভোগ দিবার ছলনা করিলে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন না।

তাহা 'স্বারসিকী সেবা' নহে। সেইরূপ কপট ভোগিব্যক্তি প্রকারান্তরে তাহার উচ্ছিষ্টই মহাপ্রভুর ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মহাপ্রভু শ্রীধরের মোচা গ্রহণ করেন। মোচার দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা একমাত্র শ্রীধরই করিতে পারেন। মহাপ্রভু শ্রীধরের মোচা প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীধর যে মোচা দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করেন, তাহা স্বারসিকী সেবা। খোলাবেচা শ্রীধরের অনুগত না হইলে কেহ ঐ স্বারসিকী সেবায় অধিকার পায় না।"

স্বারসিকী সেবার নামে নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়েও অনেক প্রকার কপটতা ও ভেল্কী চলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক স্থানে এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার এক একনিষ্ঠ ভক্ত বলিলেন যে, "তিনি নিত্য আত্মপূজা করিতেন এবং তাঁহার যে-সকল দ্রব্য ভাল লাগিত, সমস্ত ভোজন ও গ্রহণ করিয়া বলিতেন—ইহা দ্বারা আত্মপূজা হইতেছে।" ইহাও স্বারসিকী সেবার একপ্রকার ব্যভিচার-বিশেষ। অনেক গ্রাম্য লোক অনেক সময় "আত্মাকে কষ্ট দিতে নাই' বলিয়া ভোগোন্মুখ মনের কামুকতার ইন্ধনস্বরূপ মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য, এমন কি, পরস্ত্রী গমনাদি কার্য্যকে স্বারসিকী সেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া থাকে। কর্ত্তাভজা বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্বারসিকী সেবার নামে অনেক প্রকার ব্যভিচার পাষণ্ডতা চলিয়াছে। এই পাষণ্ডতা নিবারণের জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—

বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্ন তু কৃষ্ণবং।
ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥
রামাদিবদ্বর্ত্তিতব্যাং ন কচিদ্রাবণাদিবং।
ইত্যেয মুক্তি-ধর্ম্মাদিপরাণাং নয় ঈর্য্যতে॥

(উজ্জ্বলনীলমণি কৃষ্ণবল্লভা ১৪।১৫)

তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোক তদনুগামী হইয়াই চলে—এই ন্যায়ে সম্ভোগ বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাসাদিলীলা করিয়াছেন। জীবগণও ঐ আদর্শের অনুকরণ করিবে, ইহা বিচার করিলে অমঙ্গল হইবে। যে সকল মানব কল্যাণ ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অকৃত্রিম সেবকগণের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, কখনও কৃষ্ণতুল্য আচরণ করিবেন না। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে। তবে যে 'রামচন্দ্রাদির ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, রাবণাদির ন্যায় আচরণ করিবে না' এইরূপ নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুক্তি ধর্ম্মাদিপর ব্যক্তিগণের প্রতি উপদেশ, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের প্রদর্শিত সদাচার মাত্র শান্তাদিরসের রসিক আংশিক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে পারেন। বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিজ-লক্ষ্মী সীতা দেবীর প্রতি আসক্তির উদাহরণকে প্রাকৃত পতি পত্নী গ্রহণ করিলে পরম অমঙ্গল লাভ করিবে। ভগবদ্ভক্তগণ বিষয়-বিগ্রহের কোন প্রকার অনুকরণ করেন না। বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যখন পরমৌদার্য্যময় গৌরাবতার আবিষ্কার করিয়া ভগবদ্ভক্তের

আচরণ শিক্ষা প্রদান করেন, তখন আত্ম মঙ্গলকামী, তাঁহার কেবল ভক্তবৎ আচরণটি মাত্র অকপট গৌর ভক্তগণের আনুগত্যে অধিকারানুযায়ী অনুসরণ করেন, অনুকরণ করেন না; কিংবা গৌরসুন্দর তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য সময় সময় যে বিষয়-বিগ্রহের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন উহারও অনুকরণ করিতে যান না।

নিবৃত্তানর্থ সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে যে অপ্রাকৃত ব্রজজনের নিত্যসিদ্ধ সেবানুসারে স্বারসিকী ভাব-সেবা, তাহাই আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপায় ও অন্তরঙ্গ আশ্রয়বিগ্রহানুগ-গণের শুভদৃষ্টির ফলে 'স্বারসিকী সিদ্ধি' প্রদান করিয়া থাকে। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"**স্বারসিকী সিদ্ধি** ব্রজগোপী-ধন,
পরম চঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি॥
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী।
যখন যে সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধাচরণে ধনী॥

ঐ উক্তিগুলি শ্রীরূপমঞ্জরী স্বারসিকী সেবায় লুব্ধ নিজ-জনকে উপদেশ করিতেছেন। যাঁহার স্বারসিকী সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে, তিনি শ্রবণদশা, শ্রবণদশার পূর্ণত্বলাভে বরণদশা, ক্রমে

স্মরণদশা, ভাবাপনদশা ও প্রেম সম্পত্তিদশা লাভ করিয়া থাকেন। ভাবাপনদশাই স্বারসিকীসিদ্ধি বা স্বরূপসিদ্ধি। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ভাবাপনদশায় অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি উদিত হয়, তখন ভক্ত নিজসখী ও যূথেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোকনাথ কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে-পর্য্যন্ত তাঁহার লিঙ্গ ও স্থূলদেহ-বিধ্বংসরূপ সম্পত্তিদশা না হয়, সেই পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অনুভব হয় না। ভাবাপনদশায় জড়ের স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহের উপর শুদ্ধজীবের আধিপত্য জন্মে, কিন্তু কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবান্তর ফল এই যে, জীবের সহিত প্রাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপনদশার নাম স্বরূপসিদ্ধি এবং সম্পত্তিদশা হইলে বস্তুসিদ্ধি হয়। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টাদিগের চক্ষে যে-সকল মায়া প্রতারিত ব্যাপার উদিত হয়, তাহা স্বরূপসিদ্ধির সময় থাকে না।"

স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এই বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের আচার ব্যবহার অন্য অপ্রাকৃত স্বরূপ-সিদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া অপরের নিকট দুর্ব্বোধ্য হয়। অতএব স্বারসিকী সেবা বা স্বারসিকী সিদ্ধি স্বরূপসিদ্ধ মহাভাগবতই উপলব্ধি করিতে পারেন। অপর সাধারণের নিকট উহা কেবল দুর্ব্বোধ্য, এমন কি, দুরাচার-প্রায় মনে হয়, কিংবা একবস্তুতে আর একবস্তু ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

"জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ॥"

ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূ ৩য় লঃ ৫৭ ও ৪র্থ লঃ ১৭ শ্লোক)

তাৎপর্য্য - জাতভাব ভক্তে যদি বহির্দুরাচারের ন্যায় কোন প্রকার বৈগুণ্যও দেখা যায়, তপাপি তাহাতে অসূয়া করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনাসক্তিহেতু তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। যাঁহাদের চিত্তে এই নবপ্রেম উন্মীলিত হন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অতিশয় দুর্ব্বোধ্যা। যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহাদিগেরই চিত্তে এই নব প্রেম উদিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট এই নব প্রেমের সুষ্ঠু পরিপাটি দুরবগাহ।

—ঃ০ঃ—

অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতা

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "বৈষ্ণব গোসাঞিও"কে 'অদোষদর্শী' বলিয়াছেন। পরের 'অ-দোষ' অর্থাৎ গুণ দর্শন করাই প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বভাব। বৈষ্ণব - গুণ-গ্রাহী; তিনি পরের দোষ পরিত্যাগ করিয়া অল্প সেবোন্মুখতাকেই বহু করিয়া দেখেন। আর নির্দ্দোষের দোষ দর্শন করা, অল্প

দোষকেও বহু করিয়া দেখা ও তাহা লইয়া সমালোচনা করা অবৈষ্ণবের স্বভাব। বৈষ্ণব ঠাকুর কখনও কাহারও নিন্দ্যকর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কর্ণের কণ্ডূয়ন পরিতৃপ্তি করেন না। কারণ, তাঁহার কর্ণাঞ্জলি সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের পরম-পাবন শ্রীকথামৃত-পানে নিযুক্ত।

বৈষ্ণব অদোষদর্শী হইলেও সর্ব্বদা স্বদোষদর্শী। যে ব্যক্তি স্বদোষদর্শী নহে, সে কখনও অদোষদর্শী বা গুণগ্রাহী হইতে পারে না; অর্থাৎ যে সর্ব্বক্ষণ নিজের দোষ দেখে না, সে ব্যক্তি পরের দোষ দেখিবেই দেখিবে। যাহার হৃদয়ে **সর্ব্বক্ষণ আত্মধিক্কার-বৃত্তি** নাই বা আত্মধিক্কারের অভিনয়ের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা প্রবেশ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি কখনই অদোষদর্শী বৈষ্ণব হইতে পারে না। স্বীয় প্রতিষ্ঠাকামনা, দাম্ভিকতা ও মাৎসর্য্য হইতেই পরের দোষ-দর্শন-বৃত্তি উদিত হয়। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ এবং সর্ব্বদা সাবরণ শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তনকারী। যিনি তৃণাদপি সুনীচ, তিনি পরদোষ-দর্শী হইতে পারেন না; তিনি অদোষদর্শী, স্বদোষদর্শী ও পরগুণ-গ্রাহী। যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু "বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞা মৈলেহ কা'রে পানী না মাগয়॥"—তিনি স্বনিন্দুকের বা নিজের প্রতি উৎপীড়নকারীর, এমন কি, নিজের বিদ্বেষী ও প্রাণঘাতীর পর্য্যন্ত দোষ দর্শন না করিয়া অদোষ অর্থাৎ গুণ ও স্বদোষই দর্শন করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্যবর শ্রীকুরেশাচার্য্যপাদ কৃমিকণ্ঠের ন্যায় নৃশংস, বিদ্বেষী, পাষণ্ডী, চক্ষুরুৎপাটন-

কারী, প্রাণঘাতীর অনুচরগণেরও দোষ দর্শন না করিয়া তাহাদের অদোষ অর্থাৎ গুণ এবং স্বদোষ অর্থাৎ নিজেরই দোষ দর্শনপূর্ব্বক কৃমিকণ্ঠের অনুচরদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব; যেহেতু যে চক্ষু-দুইটি সর্ব্বদা আমাকে জাগতিক-রূপজ-মোহে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রীগুরুপদনখের সৌন্দর্য্য-দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত, তোমরা আমার মাংস-দর্শনকারী সেই চক্ষু-দুইটিকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন।"

ইহা বক্তৃতায় বা লেখনীর মধ্যে প্রদর্শিত লোক দেখান সাময়িক উচ্ছ্বাস নহে। বাস্তবতায় চক্ষু উৎপাটিত হইলে নির্য্যাতনকারীর প্রতি এইরূপ বিচার ও নিজেরই দোষ-দর্শন কতটা তৃণাদপি সুনীচতা ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতার পরিচায়ক তাহা আমার ন্যায় সর্ব্বদা পরদোষদর্শীর কল্পনার অতীত। অমানী-মানদ হরিকীর্ত্তনকারী কখনও পরদোষ-দর্শন বা পশ্চাতে পরদোষালোচনা কিম্বা অপরকে স্বীয় দোষদর্শনকারীরূপে সন্দেহ করিয়া তৎপ্রতি দোষারোপ করেন না।

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর পরের দোষ দেখিবার সময় কোথায়? অমানী ব্যক্তি নিজেরই দোষ দর্শন করেন। মানদ ব্যক্তি অপরের প্রকৃত দোষকেও গুণরূপে অর্থাৎ নিজের শিক্ষকরূপে দর্শন করেন। শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তাঁহার দোষদর্শনকারী ও নির্য্যাতনকারী পাষণ্ডিগণের ব্যবহারকে নিজেরই দোষের ফল বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। তিনি দোষদর্শনকারী ও নিজের নির্য্যাতনকারিগণের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করেন নাই,—

"প্রভুনিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তা'র শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬-১৬৬-১৬৯)

আমরা পরের বিন্দুসম দোষকে যেইরূপ সিন্ধুতুল্য করিয়া দর্শন করি, তদ্রূপ নিজের সিন্ধুসম দোষকে উহার কোট্যংশের এক অংশরূপেও দর্শন করি না। পরদোষদর্শন-ব্যাপারটা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-নিন্দার প্রতিবাদ-স্বরূপ বা অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া আমাদের মাৎসর্য্যানলের ইন্ধন যোগাইয়া থাকে; অর্থাৎ আমরা মুখে বলি ও বিবেককে আশ্বস্ত করিয়া থাকি যে, অমুক ব্যক্তি যখন শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিন্দক, তখন তাহার দোষ দর্শন করাই কর্ত্তব্য ও তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুতঃ এইখানে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবে মিছাভক্তিকে 'শিখণ্ডী' করিয়া আমাদের কল্পিত বৈষ্ণব-তারই ধ্বজা উড্ডীন করিতে চাহি; আমরা মনকে ফাঁকি দিই, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করি! যিনি স্বদোষদর্শী ও অদোষদর্শী বৈষ্ণবঠাকুর, তাঁহার চরিত্র কখনও এইরূপ নহে।

দোষদর্শন-বৃত্তিটি দোষদর্শিগণের সঙ্গে ইন্ধনপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অবিলম্বেই আকাশ-পাতাল আচ্ছন্ন করিয়া সমগ্র-বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার, অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে যতই আত্মধিক্কারের বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই অদোষদর্শনের বৃত্তি জাগিতে থাকে। যিনি সর্ব্বদা আত্মধিকার প্রদান করেন, তাঁহার অপরের দোষ দেখিবার অবসর কোথায়? আত্মম্ভরী নিজদোষ-দর্শনকালে অন্ধ; কিন্তু পরের দোষদর্শনে সহস্রলোচন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন যে, মধ্যম মহাভাগবত ও উত্তম মহাভাগবতগণ নিজের বিদ্বেষীর প্রতি উদাসীন। শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতের প্রতি বিদ্বেষীর ব্যবহারে চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলেও তাহাতে তাঁহাদের অভিনিবেশ নাই। উত্তম মহাভাগবতের নিজশত্রু, এমন কি, ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীতেও ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয় মহাভাগবতবর শ্রীল উদ্ধব মহারাজের পাণ্ডববিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদির বন্দনাই তাহার প্রমাণ। উত্তম ভাগবতগণের ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি শাসনাদির মধ্যেও স্বীয় ইষ্টদেবেরই-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্ব্যবহার-দর্শনে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজের হৃদয়ানুসারে এইরূপ বিচার করেন,—"এইরূপ চেতন কে আছে যে, সর্ব্বানন্দকন্দস্বরূপ, নিরুপাধিক প্রেমরসাস্পদ, সর্ব্বানুগ্রহকারী সদ্-গুণমণি-বিভূষিত, সর্ব্বলোকের পরম হিতকারী ও ভজনামৃতময় সেই পুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি না করে? পরন্তু শ্রীভগবান ও শ্রীভাগবতগণের প্রতি দ্বেষের কারণ

কি ? তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সকলেই পুরুষোত্তমে সত্য সত্যই অনুরক্ত।”

যাঁহারা দোষদর্শী থাকিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন যে, মহাভাগবতবর শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণ—“বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এইমাত্র জানে।” (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৩৩) অথবা শ্রীল উদ্ধব, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীকুরেশাচার্য্য প্রভৃতি মহাভাগবতগণের পাষণ্ডী অপরাধীতে পর্য্যন্ত অদোষদর্শন-বৃত্তির অনুকরণ করিলে ‘অসংসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার’ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে এবং মহাভাগবতগণের অনুকরণ করিতে গিয়া দুঃসঙ্গকেই বহুমানন করিতে হইবে।

যাঁহারা ঐরূপ যুক্তি প্রদান করেন, যদি বুকে হাত দিয়া তাহাদিগকে অকৈতব সত্যকথা বলিতে বলা হয়, তবে তাঁহারাও বলিতে বাধ্য হইবেন যে, যেস্থানে আত্মরক্ষার জন্য দুঃসঙ্গের নিন্দা, তথায় অসদ্বৃত্তির গর্হণই হইবে ; কিন্তু শতকরা প্রায় শতস্থানেই অসদ্বৃত্তির নিন্দা না হইয়া উহা যখন কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থূলরূপ ধারণ করে, তখন সেই ব্যক্তিত্বের বিদ্বেষই প্রবল হইয়া উঠে, অর্থাৎ কু-বিষয় হইতে আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে বিষয়ীর বিদ্বেষ করিতে করিতে তাহাতে আনন্দবোধ ও মাৎসর্য্যানলের ইন্ধন সংগ্রহ করা হয়। গর্হণ ও বিদ্বেষ এক নহে। জড়-বিষয় ও জড় বিষয়ীও অদ্বয়জ্ঞান নহে। বিষয়ের মল-পরিহার অধিক

স্থানেই হয় না, বিষয়ীর বিদ্বেষই চরম প্রয়োজনরূপে পর্যাবসিত হয় এবং তৎফলে নিন্দাকারী নিন্দিতের মধ্যে সাযুজ্য লাভ করিয়া নির্বিশেষগতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ যে-ব্যক্তি দোষদর্শন করিতে করিতে বিষয়ীর বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিল, সেই ব্যক্তিই চরমে অত্যন্ত বিষয়ী ও পাষণ্ডী হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, মহাভাগবতের বা বৈষ্ণবোত্তমের অবৈধ অনুকরণ করিতে হইবে না বলিয়া তাঁহার আদর্শ, বিচার ও চিত্তবৃত্তির অনুগমন. অনুসরণ ও তৎপ্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি ও সাধন করিতে হইবে না, উহা করিলেই 'আনুকরণিক পাষণ্ডী হইয়া যাইতে হইবে, এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ কাপট্যপূর্ণ মতবাদ।

দোষদর্শন-বৃত্তিদ্বারা কাহারও উপকার করা যায় না। তাহা 'জীবে দয়া'বৃত্তির অত্যন্ত বিরোধী। অত্যন্ত কৃপাময় অদোষদর্শী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমার ন্যায় অনন্ত-দোষে দোষী ব্যক্তিকে যদি নিজগুণে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ না করেন, তবে আমার এমন কতটা সাধন-ভজন-বল থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা আমি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া তাঁহার কৃপাকর্ষণ করিতে পারি? একমাত্র আমার অকৃত্রিম আর্ত্তি ও দৈন্য থাকিলেই তিনি জগাই-মাধাই হইতে পাপিষ্ঠ-পুরীষের কীট হইতেও লঘিষ্ঠ, অত্যন্ত নির্ঘৃণ পতিতাধম আমাকে নিজগুণে কৃপা করেন। অতএব, যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অদোষদর্শী, সেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা আমরা কখনও পরের দোষদর্শী হইয়া কোটিজন্মেও লাভ করিতে পারিব না; পরের দোষদর্শী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীগুরুদেবের স্তুতিগান অহর্নিশ

করিলেও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কখনও কৃপা করেন না। তিনি একমাত্র স্বদোষদর্শীকেই কৃপা করেন। তাই, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৫-২০৯)

শ্রীনিত্যানন্দভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু, ভালে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৪১-৪৩)

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলীয়সী মায়ার এমনি বিক্রম যে, দোষদর্শন-প্রবৃত্তি ঠিক এইসকল শাস্ত্র-মহাজনবাক্য উদ্ধার ও তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াই পরিবর্দ্ধিত হয়। একপক্ষ যাহাকে 'বৈষ্ণবোত্তম' বলেন, আর একপক্ষ তাহাকে 'পাষণ্ডীর অগ্রণী' বলিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। আবার, আর এক সম্প্রদায় যাহাকে 'মহাপাষণ্ডী' বলে, অপর সম্প্রদায় তাহাকে 'বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ' বলিয়া থাকে এবং প্রকৃত পাষণ্ডী ও তাহার অনুচরগণও মনে করে যে, তাহারাও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরেরই ন্যায় অপর সম্প্রদায়ের নির্য্যাতন, উৎপীড়ন, রোষ, দ্বেষ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতেছে! এইরূপভাবে দোষদর্শন-প্রবৃত্তি ধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীন করিয়া রক্ত-বীজ-দৈত্যের মত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইজন্যই মহাজনগণ পরের অদোষদর্শন ও নিজের দোষদর্শনকেই প্রকৃত বৈষ্ণবদর্শন বলিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা দিয়াছেন,—

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।

না দেখি তারণ-লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঁঞি কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ-বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজপাশ ॥"

* * *

"অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥
অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার'।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥"

প্রীতির অভাব হইতেই দোষদর্শন-প্রবৃত্তি উদিত হয়। যাহার প্রতি যাহার স্বাভাবিক প্রীতি নাই, তাহার শতশত গুণও দোষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই সম্পর্কে

"ন্যাংটা পেঁচো"র একটি গল্প বলিতেন। পঞ্চানন বাবু জজ্ হইবার পরও গ্রামের মৎসর ব্যক্তিগণ বলিত,—"সেদিনকার ছোঁড়া পেঁচো যা'কে আমরা ন্যাংটা দেখেছি, সে আবার জজ্ সাহেব!" যখন পঞ্চানন বাবুর নাম গেজেটে প্রকাশিত হইল, তখনও তাহারা বলিত,—"ন্যাংটা পেঁচো জজ্ হইলেও মাহিনা পায় না।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আর একটি কথা বলিতেন যে, কোন এক ব্যক্তি তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে জোর করিয়া ভূরি-ভোজন করাইত এবং পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অসাক্ষাতে তাহা-দিগকে "পেটুক" বলিয়া দোষারোপ করিত; অর্থাৎ লোকের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে হেয় করাই তাহার স্বভাব ছিল। তজ্জন্য সেই ব্যক্তি অর্থাদি ব্যয় করিতেও কৃপণতা করিত না। কাহারও পশ্চাতে দোষের সমালোচনা এবং সম্মুখে কপট করিয়া প্রীতি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভিনয়ের ন্যায় নীচবৃত্তি আর নাই।

জড় সাম্প্রদায়িক ভেদ বা জড় প্রাদেশিকতার ভেদ হইতে যে পরস্পর দোষদর্শন-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা একমাত্র হরিবিমুখ-সমাজেই সম্ভব। অহিন্দু হিন্দুকে, হিন্দু অহিন্দুকে, অবাঙ্গালী বাঙ্গালীকে, বাঙ্গালী অবাঙ্গালীকে, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গকে, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গকে, এক সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী আর এক সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মীকে যে দোষারোপ করিয়া থাকে এবং তাহা হইতে যে সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা সমস্তই মায়ার তাণ্ডব। ত্যাগীর প্রতি ভোগীর দোষারোপ, ভোগীর প্রতি ত্যাগীর দোষারোপ— সমস্তই প্রভুত্বকামনা, প্রতিষ্ঠাশা, মাৎসর্য্য, কৌটিল্য ও হরিভজনে

বিমুখতা হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরের রাজ্যে, শ্রীগৌর-জনগণের চরিত্রে উহার বিন্দুবিসর্গও নাই।

প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক সীমাদ্বারা প্রাকৃত ভেদ সৃষ্ট হয়। ব্রহ্মদেশবাসী অব্রহ্মদেশবাসীকে বা পাশ্চাত্ত্যদেশবাসী প্রাচ্যদেশ-বাসীকে যে বিদ্বেষ করিয়া থাকে, সেইরূপ বৃত্তি অপ্রাকৃত রাজ্যের সেবকগণের মধ্যে নাই। শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী শ্রীগৌরজনগণ, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলবাসী বা শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী শ্রীগৌরজনগণকে সাম্প্র-দায়িক বা প্রাদেশিক জড়ভেদদৃষ্টিতে দর্শন করেন না।

এই কৃষ্ণবিমুখ জড়জগতে পুরুষাভিমানিগণ প্রকৃতি-অভিমান-কারী ব্যক্তিগণকে এবং প্রকৃতিগণ পুরুষগণকে পরস্পর দোষারোপ ও বিদ্বেষ করে এবং সমাজে পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভুত্ব, কখনও বা সমানাধিকারলাভের জন্য কতই না আন্দোলন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীগৌরভক্তগণ সেইরূপ জড়ের পুরুষ ও প্রকৃতির জড়াভিমানের দ্বারা চালিত নহেন। ভগবদ্ভক্তগণ স্ত্রী-বিদ্বেষী বা বৈষ্ণবশক্তিগণ পুরুষ-বিদ্বেষী নহেন। অতএব, বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর কোনরূপ প্রাকৃত-ভেদ-দর্শন না থাকায়, দোষদর্শন-প্রবৃত্তিও সম্ভবপর নহে; এইজন্যই তাঁহারা অদোষদর্শী।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তির প্রত্যেকটী পথে অদোষদর্শী ও স্বদোষদর্শী হইবার শিক্ষা রহিয়াছে। বৈষ্ণবঠাকুর যখন অদোষদর্শী, তখন আমরা পরদোষদর্শী হইয়া বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপা পাইতে পারিব না। শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীগৌরভক্তগণের স্বভাবের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথুথুৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—২৪)

তৃণ-অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থুৎকারিতা, শ্রীহরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এইসকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র শ্রীগৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

যাহারা সর্ব্বদা পরদোষ দর্শন করে, অথচ বাহিরে কপট করিয়া আঁকুপাঁকুভাব দেখাইয়া থাকে—যাহার নিন্দা বা দোষদর্শন করে, তাহার প্রতিই আবার লোকদেখান শ্রদ্ধার অভিনয় করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় পাষাণ হইতেও অপরাধ-কঠিন এবং মাৎ-সর্য্যের ভাণ্ডার। তাহারা যতই আত্মগোপন করুক, তাহাদের হৃদয়স্থ মাৎসর্য্য-হলাহল মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, তাহাদিগের সহজ-সৌম্যমুগ্ধাকৃতি নাই। "দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ,"—এই আদর্শ কেবল গুণগ্রাহী ও অদোষদর্শী বৈষ্ণবের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। তাঁহাদের অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষণ, অথচ ভগবৎ-সম্বন্ধরহিত বিষয়ের গন্ধে অনাদর যুগপৎ

দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কৃষ্ণেতর-বিষয়ের গন্ধলেশও সহ্য করিতে পারেন না, বিষয়ীর বিদ্বেষও করেন না। কারণ, বিদ্বেষ অনুরাগেরই প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি। বিষয়ীর একটি দল, আর বৈষ্ণবের আর একটি দল— এইরূপ বিচার নহে। বিষয়ীর দোষদর্শনই বৈষ্ণবের কৃত্য, ইহাও নহে।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য়, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট" প্রভৃতি মনঃশিক্ষাসূচক কীর্ত্তনে ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'নির্জ্জনে অনর্থ'-শীর্ষক সঙ্গীতে "দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব ?" প্রভৃতি পদের দ্বারা স্বদোষদর্শী হইবার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন। পরমকারুণিক আচার্য্যবৃন্দ যে জীব-শিক্ষার জন্য শাসন-দণ্ডাদি প্রদান বা অসৎসঙ্গের স্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা দোষ-দর্শনবৃত্তি নহে; উহা তাঁহাদের পরদুঃখকাতরতা-প্রবৃত্তিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবের অবৈধ অনুকরণ করিয়া পরের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিহীন হইয়া কেবল মাৎসর্য্যের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন বা বৈষ্ণবের নিন্দার তীব্র প্রতিবাদ করিবার নামে পরদোষ-দর্শনের আবর্জ্জনাস্তূপ হৃদয়ে সংরক্ষণ করিলে তাহা হইতে যে তুষানল উদ্ভূত হয়, তাহা আমাদিগের কোমলা ভক্তিলতিকাকে অন্তরে অন্তরে ম্লান করিতে থাকে।

শুভানুধ্যায়ী ও অকৃত্রিম সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শাসন ও দণ্ডরূপ কৃপা কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহা দেখিয়া

যাহারা ঐরূপ দণ্ডরূপ-কৃপা-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে চিরদোষী ও নিত্য অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার দোষের সমালোচনায় আনন্দবোধ করে এবং শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শাসনবাক্যসমূহের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শ্রীগুরুদেবের শাসনযোগ্য শিষ্যকে অনন্ত নরকের পথের পথিক বিচার করিয়া তাহাকে আরও অধিকতর দ্রুতগতিতে নরকে প্রেরণ করিবার জন্য উৎসাহী হয়, তাহাদের চিত্তবৃত্তি কখনই আত্ম-মঙ্গলকারী বা পরের মঙ্গলবিধায়িনী হইতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুবর্গ যে শিষ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহার দোষ ও ত্রুটী প্রদর্শন করেন, তাহা হইতে ঐ শিষ্যকে দোষী বিচার না করিয়া আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি নিজের প্রতি সেই মঙ্গলময়ী শিক্ষা বরণ করিয়া লইয়া লাভবান্ হন। আর আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি অপরকে দোষী মনে করিয়া আপনাকে নির্দ্দোষজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরুবর্গ যখন আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক শাসন করেন, তখন সেইসকল শাসনবাক্য অপরে শ্রবণ করিলে আমাদের সম্মান বা প্রতিষ্ঠার লাঘব হইবে, —এইরূপ মনোভাব এবং শ্রীশ্রীগুরুবর্গ যখন অপরকে শাসন করেন, তখন সেই শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণানন্দ উপভোগ করিবার চিত্তবৃত্তি—পরদোষদর্শী ও স্বদোষের প্রতি অন্ধ মৎসর ব্যক্তি-গণেই স্বাভাবিক। ঐরূপ চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে চিত্ত হইতে বিতাড়িত করিয়া অদোষদর্শী ও স্বদোষদর্শী হইতে হইবে।

যাহারা পরদোষদর্শী, তাহারা শাস্ত্রীয় উপদেশের অবতারণাকেও সন্দেহের চক্ষে দর্শন করে। কোন শাস্ত্রের কথা আলোচিত হইলে তাহারা মনে করে যে, তাহাদিগকেই আক্রমণ করিবার

উদ্দেশ্যে ঐরূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যে
পরদোষদর্শী সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র আপনাকে "আক্রান্ত" আশঙ্কা করিয়
শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তনকে আক্রমণ করে। সর্ব্বত্র দোষদর্শনের দুর
রোগ্য সংক্রামক ব্যাধি যাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার
সেই সংক্রামক রোগ সর্ব্বত্র বিস্তারার্থ পরমোৎসাহী। দোষদর্শ
সমৎসর ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে "নিখুঁত" বা "ভাল আমি" কল্পন
করিয়া শ্রৌতবাণীকেও তাহাদের কল্পিত "ন্যায়-অন্যায়ে"র আসামী
করিয়া থাকে অর্থাৎ শ্রৌতবাণীসমূহ যদি তাহাদের মতবাদকে ও
মনোভাবকে সমর্থন না করে, তবে হয় শ্রৌতবাণীর কৃত্রিমতা
প্রতিপাদন, না হয় উহার ব্যাখ্যান্তর করিয়া নিজেদের বা দলের
কথিত বিচারই শ্রৌতসিদ্ধান্ত বলিয়া ধারণা করে। পরদোষদর্শন-
প্রবৃত্তিকে সমর্থন করিবার মধ্যে যে গোঁড়ামি (?) আছে, তাহা
ভজনশীল বৈষ্ণবের দৃঢ়তাকেও তিরস্কার করিতে পারে।

বস্তুতঃ, গুণগ্রাহিতা-দ্বারাই সাধক আপনাকে ও অপরকে জয়
করিতে পারে। যে-ব্যক্তি সর্ব্বদা দোষদর্শন করে, সেই-ব্যক্তি সর্ব্বদা
অসৎসঙ্গ ও অসদ্‌বস্তুরই ধ্যান করিয়া থাকে। আর, যিনি অপরের
দোষ পরিহাব করিয়া গুণ গ্রহণ করেন, তিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র অন্বয়
ও ব্যতিরেকভাবে সাধুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু
শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীল
হরিদাস পণ্ডিতের গুণকীর্ত্তনমুখে বলিয়াছেন,—

"সেবার অধ্যক্ষ— শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁ'র যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর চেষ্টা, মহাধীর॥
সবার সম্মানকর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁ'র চিত॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৫৪-৫৬)

শ্রীল পণ্ডিত হরিদাসের শ্রীগুরুদেব শ্রীল অনন্তাচার্য্য— যিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য, তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৬২)

'বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ'— এই বাক্যের মধ্যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বভাব বর্ণন করিয়াছেন; অর্থাৎ বৈষ্ণব গুণগ্রাহী ও অদোষদর্শী। পরের দোষদর্শী কখনও 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য নহে।

কেহ কেহ "বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী" বাক্যের বলে বিচার করিয়া থাকেন যে, "বৈষ্ণবেরই গুণ-গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং আমাদের বিচারে যিনি বা যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাদের দোষই দেখিতে হইবে; অথবা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পৃথিবীতে বৈষ্ণবের অস্তিত্ব নাই, সকলেই অবৈষ্ণব; সুতরাং অবৈষ্ণবগণের দোষ দর্শন না

করিলে অবৈষ্ণব-সঙ্গ ও অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে!" এইরূপ বিচার অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ অনুক্ষণ পরের দোষই শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে ধ্যান করিয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মবন্দনা-মুখে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"নিন্দেত্যক্ষরয়োর্দ্বয়ং পরিচয়ং প্রাপ্তং ন যৎকর্ণয়োঃ
সাধূনাং স্তুতিমেব যঃ স্বরসনামাস্বাদয়ত্যন্বহম্।
বিশ্বাস্যং জগদেব যস্য ন পুনঃ কুত্রাপি দোষগ্রহঃ
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ॥

(শ্রীস্তবামৃতলহরী, শ্রীগুরুচরণাষ্টকম্—৫।

'নিন্দা' এই অক্ষরদ্বয় যাঁহার কর্ণযুগলের সহিত পরিচয় লাভ করে নাই, যিনি প্রত্যহ স্বীয় রসনাকে সাধুসকলের স্তুতি আস্বাদন করাইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র জগৎকেই বিশ্বাস করেন, যিনি কোন-স্থলেই দোষ গ্রহণ করেন না, সেই গুরুবর শ্রীরাধারমণপ্রভুকে আমি ভুলুণ্ঠিত হইয়া সানন্দে বন্দনা করিতেছি।

শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের অন্যান্য শত শত গুণের কথা থাকিতে আমাদের পূর্ব্ব শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতাকে এইরূপ প্রাধান্য প্রদান করিলেন কেন? শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের কর্ণযুগলের সহিত 'নিন্দা' এই অক্ষরযুগলের পরিচয়ও নাই; তিনি কেবল সাধুগণের স্তুতি করেন, কোনস্থলেও দোষ গ্রহণ করেন না। ইহাদ্বারা কি শ্রীরূপানুগবর শ্রীআচার্য্যগণ

পরদোষদর্শিতাকে সমৎসর ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম এবং অদোষদর্শিতাকে নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই ?

অনেক সময় কুটিল ব্যক্তিগণ মাৎসর্য্যোত্থা পরনিন্দাপ্রবৃত্তিকে পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যগণের অকৃত্রিম অহৈতুক কৃপাপূর্ণ শাসনদণ্ডের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া স্ব-স্ব দুষ্ট-বৃত্তিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু উভয় বৃত্তির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ফলের দ্বারাই প্রমাণিত হয় ; অর্থাৎ সাধুগণের দণ্ড ও কৃপার ফলে সংসার নাশ ও ভক্তিবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সমৎসর ব্যক্তিগণের পরদোষদর্শিতা ও পরচর্চ্চার ফলে পরস্পর ভেদ ও নানাপ্রকার কলির তাণ্ডবলীলা বৃদ্ধি হয়। একটির ফল মধুময়, আর একটির ফল বিষময় হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ স্ব-স্ব অসচ্চেষ্টাসমূহ আবরণের জন্য 'অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতা'-গুণের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের মনোভাব এই যে, যদি অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতা প্রচারিত হয়, তবে তাহাদের শত শত বাস্তব দোষও গুণ বলিয়া প্রচারিত থাকিবে এবং তাহারা সেই আবরণে দোষগুলিকে চালাইতে পারিবে।

মায়ার এমনি শক্তি যে, এই সকল সত্য-সিদ্ধান্তের মধ্যেও কুটিল ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার কুটনীতি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তের মধ্যে সংশয় ও সমস্যাবাদের অবতারণা করিয়া থাকে। বহুরূপিণী মায়ার অশেষ প্রকার তাণ্ডবের মধ্যে ইহা একটি তাণ্ডব-বিশেষ। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এবং

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি গুরুবর্গ অনিন্দক হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার কথা পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে' ॥
আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট', কহে শাস্ত্র সব ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৪৫, ১৪৭)

"নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ ॥
অনিন্দুক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪৫-৪৬)

"কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥
'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয় ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩১৩-১৪)

—ঃ * ঃ—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

অদ্য শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-বাসর। শ্রীবলদেব বলদানের দেবতা। মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

বলহীন জীব পরাৎপরপুরুষকে লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই অভিন্ন-শ্রীবলদেব। যিনি গুরু-পদাশ্রয় করেন নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন না। আদৌ শ্রীগুরু-পূজা। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। অবিনাশী সত্ত্ব বা বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ বসুদেবে শ্রীবলদেব-বাসুদেবের আবির্ভাব।

আমরা বলহীন, হৃদ্‌দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের কবলে কবলিত; তজ্জন্যই আমাদের হরিভজনে উৎসাহ, একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও সমগ্র জীবনীশক্তিকে প্রয়োগ করিবার অকপট আন্তরিকতার অভাব লক্ষিত হইতেছে। নিজের চেষ্টায় ব্রহ্মাদি দেবতাও মায়া জয় করিতে পারেন নাই। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের কথা আর কি? মায়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া মায়াবশযোগ্য জীব জয়ী হইতে পারে না। মায়ার বিক্রম অনেক বেশী। একমাত্র মায়াধীশ শ্রীবলদেবের শ্রীপাদপদ্ম যদি বরণ করা যায়, তবেই তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া জীব মায়ার কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। মায়াধীশের শ্রীপাদপদ্মের রেণু-

গণের বল ব্যতীত অণুচৈতন্য জীব কিছুতেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল॥"

(চৈঃ চঃ অ ১৬৬০)

বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি, শ্রীচরণামৃত ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ,—এই তিনটি সাধনের বল। ঐ তিনটি বস্তুই অপ্রাকৃত। ঐ অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া দর্শন করা যায় না। অনেকে বৈষ্ণবের পদধূলি, শ্রীচরণামৃত ও উচ্ছিষ্ট-সেবনের অভিনয় করিয়াও ভক্তদ্রোহী ও ভগবদ্দ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। শুদ্ধবৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া একমাত্র তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হওয়াই সাধন-রাজ্যে বল-লাভ। যিনি যতটা অকপটে কৃপা প্রার্থনা করেন, তিনি ততটা অধিক বল লাভ করিতে পারেন।

অনেক সাধক গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী নহেন, সত্যানুসন্ধিৎসু ও হরিভজন পিপাসুও বটেন; তথাপি ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারেন না কেন? শুভেচ্ছা থাকিলেও অন্যাভিলাষ যায় না, দুঃসঙ্গ-ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প থাকিলেও সেই সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত অটুটভাবে রক্ষা করিতে পারেন না, দেহ-গেহারামতার অকিঞ্চিৎ-করতা বুঝিয়াও অবশে উহাদের কবলে কবলিত হইয়া পড়েন।

সংসার হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না; দুর্ব্বলতার যবনিকা আসিয়া শুভেচ্ছা ও সংসঙ্কল্পসমূহকে আবরণ করিয়া ফেলে। সেই সময়ে বলের প্রয়োজন—প্রাকৃত বল নহে, দৈহিক ও মানসিক বল নহে; চিদ্বল—শ্রীবলদেবের বল—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা হইতে পারে।

দেহবল ত' পাশবিক বলের মধ্যে গণ্য। উহা ভোগী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। যাহারা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্রুতি-মন্ত্রকে শরীর-চর্চ্চা, ব্যায়াম, বিন্দুধারণ প্রভৃতি প্রাকৃত দৈহিক বল-লাভের উত্তেজনামূলক বাক্যরূপে পর্য্যবসিত করিতে চাহে, তাহারা ছান্দোগ্যোপনিষদের বিরোচনের ন্যায় ভ্রান্ত ও দেহাত্মবাদ-প্রচারক অদৈব-সম্প্রদায়। অনেক ব্যায়ামের আখড়ায় বজ্রাঙ্গজী বা মহাবীরের পূজা (?) করা হয়। কুস্তী ও নানাপ্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া দৈহিক বল-সঞ্চয়ের জন্য দেহাত্মবাদিগণ মহাবীরকে আদর্শ মনে করিয়া থাকে। ইহা বজ্রাঙ্গজীর শ্রীচরণে অপরাধের পরকাষ্ঠা। দৈহিক বল-লাভের জন্য মহাবীরের পূজার ছলনা—পাষণ্ডতা। এইরূপ অনেক অন্যাভিলাষী নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা ও আশ্রয়ের অভিনয় করিয়া থাকে। তাহারা ইতরবস্তু লাভ করিয়া বঞ্চিত হয়। যে মহাবীর বা বজ্রাঙ্গজীর কৃপালাভে অনায়াসে দুস্তরা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী রতি লাভ হয়, যে বল চতুর্দ্দশ

ভুবনে, এমন কি ব্রহ্মলোকেও লাভ হইতে পারে না, সেই বৈকুণ্ঠ বলের প্রার্থী না হইয়া বৈষ্ণববর বজ্রাঙ্গজীর নিকট দৈহিক ও পাশবিক বলের কামনা যে কিরূপ মূর্খতা, তাহা বর্ণনাতীত।

দৈহিক বল কেন, মানসিক বলও মায়ার বলের সহিত অধিকক্ষণ যুঝিতে পারে না। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও মায়ার বিক্রমের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে। নির্ভেদজ্ঞানী ও রাজযোগীগণ প্রভূত মানসিক বল সঞ্চয় করিয়া থাকেন। স্ত্রী-পুত্রাদি-পরিজন, দেহ ও গৃহের আরাম, কামিনী-কাঞ্চন ইত্যাদি পরিত্যাগ করা কম মানসিক বল নহে। ইহা পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন লোকই পারে না; কিন্তু এত মানসিক বল সঞ্চয় করিয়াও অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেব-বলদেবের সেবাবল লাভ করিতে না পারায় তাহারা মায়ার বলের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায়ের কথা আর কি, ভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিয়া সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের অভিনয়; মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, স্বজনাদি-পরিত্যাগের অভিনয়; ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসাদি-গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদিপালনের অভিনয়ে প্রচুর মানসিক বল সঞ্চয় করিয়াও শ্রীবলদেবের বলে অর্থাৎ শ্রীআচার্য্য বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ না করায় সেই সকল ব্যক্তিও বহুরূপিণী মায়ার বিক্রমের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

বলদেবের বল দাম্ভিকতার দ্বারা লাভ হয় না। বলদেব দম্ভদৈত্যকে বিনাশ করেন। "আয়, মা সাধন-সমরে, দেখি, মা হারে কি পুত্র হারে"—এই জাতীয় বিচার শ্রীবলদেবের কৃপা-

প্রার্থীর বিচার নহে; অথবা 'আমি নিজের বলের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা মায়াকে জয় করিতে পারি, পারিয়াছি বা পারিব'.—এইরূপ বিচারও শ্রীবলদেবের কৃপাপ্রার্থীর বিচার নহে। যিনি যতটা বলদেবের কৃপা লাভ করেন, তাঁহার হৃদয়ে ততটা দীনতা-দেবী আত্ম-প্রকাশ করেন; তাঁহার কৃপা-প্রার্থনার বৃত্তি ততটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই কৃপা-যাচ্ঞার বিরতি নাই, প্রতিপদে আরতিই বর্দ্ধিত হয়। বলদেবের বল অকৃত্রিম অহৈতুক দৈন্যের মধ্যে লাভ হয়; দাম্ভিকতার মধ্যে লাভ হয় না। শ্রীবলদেব ধেনুকাসুরকে বধ করেন। স্বরূপ-জ্ঞান-বিরোধ, তত্ত্বান্ধতা ও আধ্যক্ষিকতাই ধেনুকাসুরের প্রতীক। আর বলরাম বধ করেন—'প্রলম্ব'কে। ছদ্মবেশী মিছাভক্ত, ত্যাগী, সন্ন্যাসীর অভিনয়কারী ভণ্ডব্যক্তিগণ প্রলম্বের প্রতীক। শ্রীবলদেব বধ করেন—মুষ্টিকাদি মল্লকে। শৈলরাজ-সদৃশ মুষ্টিক মল্ল বলদেবের মুষ্টি-প্রহারে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূপতিত হয়। শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নরাশিকে অতি সহজে ভূপাতিত করিয়া দিতে পারেন। শ্রীবলদেব দ্বিবিদ বানরের বিনাশ-সাধন করেন। নরকাসুরের মিত্র মৈন্দ বানরের ভ্রাতা দ্বিবিদ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শক্তি-মদ্‌বিগ্রহ রমণীমধ্যগত বারুণী-পানোন্মত্ত বলদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল। বলদেব মূষল ও লাঙ্গলের দ্বারা দ্বিবিদের কণ্ঠ ও বাহুমূলে প্রহার করিয়া উহাকে ভূপতিত করেন। দ্বিবিদ-সদৃশ নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ আনুকরণিক ঢঙ্গবাদী হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অঙ্গভঙ্গী, তাঁহার নিন্দা ও দ্রোহাচরণ করিয়া

থাকে। শ্রীবলদেবপ্রভু কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের বন্ধু রুক্মীকে দ্যূত ক্রীড়ায় পাশাঘাতে বিনাশ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী ও তাহাদের সহচরগণ শ্রীবলদেবের দ্বারা কিরূপে বঞ্চিত হয়, তাহার আদর্শ-লীলা প্রকট করেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটন-লীলায় নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে রোমহর্ষণ সূতকে বধ করিয়া 'অর্দ্ধজরতীর ন্যায়াবলম্বী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-পূজাবিমুখ ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক বিষ্ণুপূজকের দাম্ভিকতা চূর্ণবিচূর্ণ করেন। অসুর-মারণাদি-কার্য্য অংশী বলদেবে প্রবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু সন্ধিনী-শক্তি-প্রভাবে নিত্যচিদ্ধামের নিত্য প্রাকট্য-বিধান, মহা-সঙ্কর্ষণ হইতে মহতের স্রষ্টা প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবিষ্কার এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষ হইতে নানাবিধ লীলাবতার তথা ব্রহ্মা, অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ করিয়া অদ্বয় জ্ঞানোপলব্ধির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ" (চৈঃ চঃ আ ৫।১৫২) এই বাক্যের আদর্শ ও "কৃষ্ণের সমতা হৈতে ভক্তপদ বড়"—এই বাক্যের সার্থকতা প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব প্রভু কৌরবগণের ঔদ্ধত্য-দর্শনে হস্তিনা কর্ষণ করেন। তিনি—'মূলসঙ্কর্ষণ'। সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জীবের হৃদয় কর্ষণ করিয়া থাকেন। গুরুদেবের কার্য্যই – কর্ষণ-কার্য্যরূপ কৃপা-বিতরণ—**বৈধ-মার্গে কর্ষণ ও রাগ-মার্গে আকর্ষণ ; লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ ও বংশীর দ্বারা আকর্ষণ।** শ্রীবলদেব গোকুলে মধু ও মাধব মাসে যমুনার উপবনে নিজ-গোপীগণের সঙ্গে রাসরসোৎসব এবং যমুনাকর্ষণ-লীলা প্রকাশ করেন। ক্লীব ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-

বাদিগণ শ্রীবলদেবের রাসলীলার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। এইজন্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।
বলে,—বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৪০-৪১)

এই বলদেব প্রভুই—'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু'।

"অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাইপদ পাশরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি॥"

"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,"—ইহাই শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর মহাশয়-কর্ত্তৃক "নায়মাত্মা" শ্রুতিমন্ত্রের পদ্যানুবাদ। আত্মাই—অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলধন, সর্ব্বজীবের জীবন; তাঁহা বলদেব-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবাহীন ব্যক্তির পক্ষে লভ্য নহে। সেই বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান-প্রদাতা সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ। তিনি দশ দেহে অর্থাৎ মর্য্যাদা-মার্গে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবক—'গুরুদেব'।

শ্রীবলদেব প্রভুই 'মূলসঙ্কর্ষণ'। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিনি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া 'রাম', আর বলের আধিক্য-হেতু 'বলভদ্র' নামে কথিত। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ

এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার যিনি সাধারণতঃ 'সঙ্কর্ষণ' নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত শ্রীসঙ্কর্ষণ বা শ্রীশেষই তাঁহার সহস্রফণ মস্তকের একটী ভাগে একটী সর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এই সঙ্কর্ষণাবতার শেষ মহাবাগ্মী। সনকাদি মুনিগণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করেন। হরিকীর্ত্তনকারি-গণের বাগ্মিতার মূল কারণ এই মহাবাগ্মী শেষ প্রভু।

তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য 'অনন্তবদন', অতএব যিনি চিদচিজ্জগতের সত্তাবিধায়িনী শক্তির শক্তিধর, সেই বলদেবের পূজা নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীবমাত্রেরই একান্ত ধর্ম্ম। যাঁহারা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া জগতে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃত বল-সঞ্চয়-পিপাসু হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যদি বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির অনুসরণ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা শিক্ষা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রকৃত বল-প্রাপ্তি ঘটিবে। অবলা স্ত্রীগণ যদি মনসাদি গ্রাম্য দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী মহাবীর্য্য প্রভাবশালী ধরণীধর শ্রীশেষসর্পের আরাধনা শিক্ষা করেন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ শিশুগণ যদি প্রহ্লাদের ন্যায় বলদেব প্রভুর কলাবিকলা-স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা শিক্ষা করিয়া চিদ্বল সংগ্রহ করেন, পুরুষগণ যদি প্রাকৃত বাহুবলের হেয়তা, নশ্বরতা ও ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অনন্তমুখ মহাবাগ্মী শ্রীসঙ্কর্ষণের নিকট হইতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনবল প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ—বিশ্ববাসী সকলেই প্রকৃত নিত্য বলে বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন,

সন্দেহ নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

তাই অশোক-অভয়ামৃত-সেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-রাম-পদাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করিয়া আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

"সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৭৭)

—ঃ০ঃ—

সুমেধোজন-সেবানুসরণ

সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের সপ্তশিখ কীর্ত্তনযজ্ঞের মূল ঋত্বিক্-শ্রীরূপাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের সুকল্যাণময়ী 'ব্রজ-বিজয়ানুসন্ধান'পরা সুমেধস্তিথি আমাদিগকে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে পূর্ণ আত্মাহুতি দিবার জন্য বিশ্বে প্রকটিতা হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নস্বরূপ করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এইদিনে তদাশ্রিতজনের নিকট তাঁহার উরুকৃপার দানসত্র খুলিয়া দিয়াছেন।

"বিপ্রলম্ভময় সম্বোধনাত্মক শ্রেষ্ঠনাম (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল নাম), সম্ভোগবাদরূপ সংসারের মোচকমন্ত্র, বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার বিপ্রলম্ভের পরিপোষক দ্বিতীয়স্বরূপ

শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগৌরহরির দয়িতস্বরূপ শ্রীরূপ, শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভযুগ, ভক্তিরস-ভাণ্ডারের মালিক শ্রীসনাতন, বিপ্রলম্ভ-রসপীঠ 'মধুরা' মথুরা, মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সভ্যারাম গোষ্ঠবাটী, বিপ্রলম্ভ-রসহিল্লোলময়ী শ্রীরাধা-সরসী, শ্রীগান্ধর্ব্বার কেলিকলাবান্ধব শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ এবং শ্রীরাধামাধবের আশাবন্ধরূপ স্বভজন যিনি বিতরণ করিয়াছেন, সেই গৌরপ্রিয়-তমের বিপ্রলম্ভরসমণ্ডিতা ব্রজবিজয়তিথি শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর বাণীর অকপট আশ্রিত সম্প্রদায়কে রক্ষা করুন।"—(গৌঃ ১৭। ১০।১৯ সং)

শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের এই স্বজন-বৎসল হৃদয়ের সুস্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ কাহার প্রতি ও কিসের জন্য ? তাঁহার বাণী হইতে আমরা পাই – ব্রজযাত্রী শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অকপট আশ্রিত সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁহার আশীর্ব্বাণীধারা বর্ষিত হইয়াছে। বিগত শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরদিবসের (শ্রীধর অঙ্গনে) বক্তৃতায় (গৌঃ ১৭।৩২-৩৩) ব্রজভজনের বাধাপ্রদান-কারী অসুরই যে আশ্রিত সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারক এবং তাঁহার হৃদয় কেবলমাত্র উহা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ব্যাকুল, ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

সুমেধোমস্তকমণি শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর আশ্রিত সম্প্রদায় সুমেধা ভিন্ন হইতে পারেন না। শ্রীল আচার্য্যদেব সুমেধার পরিচয়ে জানাইয়াছেন—"প্রপঞ্চে শব্দাকারে অবতীর্ণ বিষয়-বিগ্রহের অনুকূল কীর্ত্তনমুখে যজনই একমাত্র পরমধর্ম্ম। সেই

যাজ্ঞিকগণই মঠসেবক ও সুমেধা।” আরও একটু বিস্তৃত পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—“তাঁহার (শ্রীল প্রভুপাদের) মঠ-মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ কৃষ্ণকীর্ত্তন-কুঞ্জপ্রকাশের উদ্দেশ্যেই সাধিত হইয়াছিল। তিনি বাহিরে একনিষ্ঠ বিষয়ীর মত থাকিয়া—‘পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥’—এই বাক্যের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে স্বভজনে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। ইহা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের পার্ষদ ও সুমেধা।”

সুমেধোগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনযজ্ঞের যাজ্ঞিক, সেইজন্যই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের মূল ঋত্বিকের অন্তর তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন।

“পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্যহুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥
সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত’ সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥”

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই সুমেধার লক্ষণই বিরহকাতরতা, অলস আরামপ্রিয়তা নহে। বিরহী ব্যতীত কীর্ত্তনকারী হইতে পারেন না।

“এই সংকীর্ত্তনকারী মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই * * সংকীর্ত্তনকারী নিজকে আশ্রয়-ভেদাংশরূপে ভোগ্য-সেবক-দৃশ্য-

দাস-জ্ঞানে * * বিরহদ্যোতক সম্বোধনপদে আশ্রয়-বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহকে আহ্বান করেন। দূরস্থিত বস্তুকে আহ্বান বিরহকাতর-ব্যথিতেরই সহজাত ধর্ম্ম। বিরহবিধুর ব্যক্তি বিরহাস্পদকে অনুক্ষণ আহ্বান না করিয়া এক মুহূর্ত্ত ও অন্যমনস্ক বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না"—(শ্রীল আচার্য্যদেব – গৌঃ ১৬।২২)

বিরহী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ভোগী চিন্তাহীন ('ভাল মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন')। কোন্ চিন্তাবিহীন? "কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল" ।—এই চিন্তাটি তাহার নাই। তাই বলিয়া কি কোনও চিন্তাই নাই? কোন চিন্তা না থাকিলে তাহার ভোগের চরম অবসানরূপ মৃত্যুটি যে শিয়রে করাল বদন ব্যাদন করিয়া দণ্ডায়মান, তাহাও ভুলিয়া যায় কিরূপে? তটস্থাবস্থায় সে ত' নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। পরক্ষণেই দেহ, গেহ, কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দেহ-গেহ-কলত্র-চিন্তাই সুমেধার প্রতিবন্ধন। "জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত"। এই হতবুদ্ধিতাই কুবুদ্ধিতা বা কুমেধা।

গেহ বা দ্রবিণ ও কলত্রই—কনক এবং কামিনী। ইহাদের মূল—দেহ। দেহারামতার সহিত উহাদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। আবার প্রতিষ্ঠা সূক্ষ্মভাবে দেহ-গেহ-কলত্রাদির ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে বিজড়িত। এই দেহচিন্তাই সমষ্টিগত সুমেধোসমাজ বা ব্যষ্টিগত সুমেধোজীবনে ভজনের মূল অন্তরায়। দৈহিক সর্ব্বস্বতাই কংস। তাহার যাহা কিছু চিন্তা, দেহ লইয়া। মরণশীল

দেহটা যদি পাত হয়, এই ভয়ে সে অধোক্ষজ বাসুদেবের প্রকট নিরোধ করিতে চায়। আবার যখন তাহার সকল চেষ্টার উপর দুই অঙ্গুলী পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া অধোক্ষজতত্ত্ব প্রকটিত হন, তখন সে দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া অসুর পাঠাইয়া অধোক্ষজের বিনাশের স্বপ্নে বিভোর হইয়া মনঃকলা খায়। ব্রজবাসীর ন্যায় গোষ্ঠে কৃষ্ণচরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিতেছে কি না, এই চিন্তা তাহার নাই সত্য, তাই বলিয়া কি সে চিন্তাহীন? তাহার অবিরত চিন্তা—অবিরত আশঙ্কা; আর প্রবল উদ্যম—বিনাশ চিন্তায়। ব্রজবাসীর কংস বা কংসানুচর-বধের জন্য চিন্তা নাই। তাঁহাদের চিন্তা গোপাল ও গোষ্ঠ। গোপালের সুখ কিসে হইবে, আর সেই সঙ্গে কংস গোপাল বা গোষ্ঠের ক্ষতি না করে। বলদেব অনুজের বলবিক্রম সবই জানেন, তথাপি তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া দূরে সরিয়া থাকেন না। সর্ব্বদা রক্ষা করিবার জন্য—গোপালের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র।

শ্রীল আচার্য্যদেব সমষ্টিগত সুমেধঃসমাজের মূর্ত্ত প্রতিবন্ধকের নিকট হইতে সুমেধঃসমাজকে দূরে রাখিয়া রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কেবল বাহ্যতঃ দূরে থাকিলে আমরা রক্ষা পাইব—না, সুমেধঃসমাজে স্থান পাইব? দেহৈকসর্ব্বস্বতারূপ এক একটি কংস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। কংসের মূর্ত্ত প্রতীকটিকে আচার্য্যদেব বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন—অন্তর্নিহিত কংসের মূর্ত্তিটিকে অবহেলা করিবার জন্য, না বিশেষভাবে জানিয়া সাবধান হইবার জন্য? বাহিরের মূর্ত্তিটির সেবা-

বিরোধিতারূপ কদর্য্যতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠি, কিন্তু ভিতরের কদর্য্য রূপটি দ্বিগুণ শিহরণ আনিতেছে কি? 'পাষণ্ডদলনবানা' নিত্যানন্দের সমষ্টিগত সুমেধোভজন-প্রতিবন্ধক দলনে উৎফুল্ল হই; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যখন নিত্যানন্দের পাষণ্ডদলনবাণটি মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিতে উদ্যত হন, তখন ত' আর প্রফুল্লতা থাকে না। অর্থাৎ যখন কৃষ্ণের বিধান ও গুরু-গৌড়ীয়ের বাণী-অস্ত্রে ব্রজবিরোধী পাষণ্ডী সম্প্রদায়ের দলন দেখিতে পাই, তখন আনন্দিত হই। অবশ্য ব্রজ-জনের আনন্দ ইহাতে স্বাভাবিকভাবে হইবেই। তবে, আমাদের আনন্দটি কি ব্রজ-জনের অনুসরণ করে? ব্রজ-জনের আনন্দ কংসদমনে,—না কংসারির লীলা-মাধুর্য্যে? যদি আমাদের আনন্দ ব্রজ-জনের অনুগমনেই হয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে কংসারির লীলা যখন আমার হৃদয়ের দেহৈকসর্ব্বস্বতার চরদিগের বিনাশ করেন অর্থাৎ গুরু-গৌড়ীয় তীব্র শাসনে দেহারামতা, গেহারামতা, কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা দূর করেন, তখনও হৃদয় আনন্দে তাথৈ তাথৈ করিয়া উঠে না কেন? শুদ্ধসত্ত্ব মথুরায় মথুরানাথ কংসকে বা দেহৈকসর্ব্বস্বতাকে নষ্ট করিবেনই। দিব্যজ্ঞান প্রদানের পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আসিবামাত্রই শ্রীগুরুদেব দেহৈক-সর্ব্বস্বতার মূলে আঘাত করেন। দেহৈকসর্ব্বস্বতা তখন হইতেই মতলব আঁটিতে থাকে যে, গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইতে দিবই না। যদিও কোনক্রমে গুরুদেব স্বীয় পাদপদ্মে আশ্রয় দান করিয়া দিব্যজ্ঞান দান করেন, তখন হইতেই দেহৈক-

সর্ব্বস্বতার চরের আর অভাব থাকে না। ভুক্তি, মুক্তি, কপটতা, ক্রমে-ক্রমে প্রতিষ্ঠারূপ অরিষ্টাসুর আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল অসুর অপেক্ষা এইটি অধিক অনিষ্টকারক। সেই Ethics এর দোহাই দিয়া নিজেই আশ্রয়বিগ্রহের ভোক্তা অর্থাৎ পরিমাপক হইতে চায়। এইগুলি হৃদয় হইতে নিঃশেষ হইলে তবে কংস-বধ বা দৈহিকসর্ব্বস্বতার বিনাশ হয়। যতক্ষণ কংস বধ না হয়, ততক্ষণ শুদ্ধসত্ত্বের শৃঙ্খল মোচিত হয় না। যদি দেহকেই নিজের স্বরূপ জানিয়া তাহাকেই ভজন-জানিয়া রাখি (কংসের যাহা স্বভাব), তাহা হইলে দেহের অনুসরণে গেহাদি-সর্ব্বস্বতা আসি-বেই। কংসারির কংস-বধের সময় বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হইবে। দৈহিকসর্ব্বস্বতারূপ কংসত্ব হৃদয়ে থাকিলে কংসারির হস্তে বিনাশ পাইতেই হইবে। এই সম্ভোগবৃত্তির বিনাশ হয় কখন? যখনই জীবের হৃদয়ে "অয়ি দীনদয়াদ্র নাথ"—এই গীতির উদ্বোধন হয়। এই প্রকার বিপ্রলম্ভ জাগিলে তখনই সকল আরামের মুখে ছাই পড়িয়া যায়। এইরূপ সম্বোধনাত্মক কীর্ত্তনই তখন তাঁহার কৃত্য হইয়া দাঁড়ায়। "কাঁহা যাই কৃষ্ণ পাই"—এই চিন্তাই বিশাল হইয়া পড়ে।

বিশুদ্ধসত্ত্ব গুরুপাদপদ্মের ইহাই স্বরূপ। তিনি "অয়ি দীন-দয়াদ্র নাথ মথুরানাথ"—এই মন্ত্রের উদ্‌গানকারী। তাঁহার বাঞ্ছিতের সহিত তাঁহার মিলন ব্যতীত আর কিছুতেই সুখ নাই। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ই কৃষ্ণের আসন। সেই আসন শূন্য

দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি কথারূপী কৃষ্ণকে-শ্রীনামকে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে চান। যদি আমরা সেই শ্রীনামকে হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে পারি, তবেই তিনি তথায় কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সুখী হইবেন। শিষ্যের দিক্ হইতে ইহা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আর অধিক সেবা হইতে পারে না। কৃষ্ণ-মুখারবিন্দঅবলোকন-কাতরতা তাঁহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়েই নামরূপী কৃষ্ণের অন্বয়-বিলাস দর্শন করিতে সমুৎসুক। তাই সকল আশ্রিতের প্রতি তাঁহার দুইটি অনুরোধ—(১) তোমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকে বসাইয়া আমাকে তাঁহার অদর্শন-দুঃখ হইতে মুক্ত কর, আর (২) অন্যের হৃদয়ে যাহাতে কৃষ্ণ উপবেশন করেন, তাহার সাহায্য করিয়া তোমরা ভূরিদরূপে আমার তপ্ত প্রাণ শীতল কর। যতক্ষণ এই দুইটি অর্থাৎ শ্রীনামসেবা এবং বৈষ্ণব-সেবায় ব্রতী না হইতে পারিতেছি ততক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কেবল অসহ্য যন্ত্রণাই দিতেছি।

"শ্রীল প্রভুপাদ সেই সংকীর্ত্তন-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিবার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্যই-তিনি সুমেধোমৌলি জগদ্গুরু ও আচার্য্য-শিরোমণি।"

—(গৌঃ ১৬।২০-২১ সং)

কংসারির জন কংসারির সংসার অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় "সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার"—এই সঙ্কীর্ত্তনরূপ সার বস্তু বা সংকীর্ত্তন-রাস লইয়াই ব্যস্ত। সুমেধঃ-

সমাজে স্থান পাইতে হইলে সুমেধোমৌলির সংসারের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে কি?

গোষ্ঠ্যানন্দী শ্রীল প্রভুপাদ সেই কীর্ত্তন-যাজ্ঞিক যূথের উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা। যাজ্ঞিক-যূথকে বাদ দিয়া প্রভুপাদের সেবা হইবে কি? যাজ্ঞিক যূথ বা সুমেধোজনের অনুসরণেই মূল ঋত্বিক্ বা হোতা, উদ্গাতার সেবা হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের হোতৃত্বের পরিচয়ে বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। এই বৈষ্ণব-সেবা কি করিয়া হয়? শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতে জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, প্রভুপাদ যে সংসার বা সমাজের পত্তন করিয়াছেন, তাহা সংকীর্ত্তন-সর্বস্ব কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ সুমেধার সংসার। বৈষ্ণবসেবা মানেই এই সুমেধঃ-সমাজের সেবা। সুমেধঃসমাজের সেবা করিতে হইলে সুমেধা হইতে হইবে ও কুমেধা বা কুবুদ্ধি হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। ব্রজবাসীর আনুগত্যে গোপাল ও গোষ্ঠের সেবা-চিন্তা এবং কংসানুচর হইতে সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষার চিন্তার ন্যায় গুরুদেব ও তদাশ্রিত সমাজের সুখবিধান করিতে হইবে এবং গুরুরূপী মিশন-রক্ষায় সাহায্য করিতে হইবে। গুরুদেবের সুখ বিধান করিতে হইলে হৃদয়ে কৃষ্ণকে ধারণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সর্ব্বদা হুঁশিয়ার থাকা দরকার—"দেহ গেহ চিন্তা" আসিয়া আমাকে হতবুদ্ধি বা কুমেধা করিতেছে কি না। কুমেধা হইলেই কলিহত বা কলিগুপ্তচরগণের কবলীকৃত হইতেই হইবে।

সুমেধার একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণানুসন্ধান. কৃষ্ণানুসন্ধান ত' কৃষ্ণ-বিরহীর কার্য্য। দেহ-গেহাদি সম্ভোগমত্তের কৃষ্ণানুসন্ধান-স্পৃহা বন্ধ্যার পুত্র-শোকের ন্যায়।

"অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

বুদ্ধিমান্–সুমেধা দেহ-গেহ-চিন্তারূপ মায়ামোহ ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তি অনুসন্ধান করেন; তাঁহার চিন্তা–"কবে মোর হ'বে হেন দিন। বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে, বাসনা হইবে ক্ষীণ॥" দেহ গেহাদি সম্বন্ধে ভাবিবার তাঁহার কিছুই নাই। "ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে, এ দেহ ছাড়িয়া দিব।" তাঁহাদের নিশ্চিন্ততা এইখানে। শ্রীল প্রভুপাদও এই অনুসন্ধানের কথা বলিয়াছেন।

"অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অবিচ্ছিন্ন-স্মৃতি বর্ত্তমান বলিয়া মহান্তগুরুর অপ্রকট-লীলা স্মৃতি দিবস তাঁহারই প্রকট-লীলার ঔজ্জ্বল্য বিধান করে। জড়বিষয়-মরুতপ্ত জীবনে অভিধা-বৃত্তি আশ্রয়-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োজন লাভ করিবার ইহা একটি সর্ব্বোত্তম সুযোগ অর্থাৎ ইহাই ভক্তিযোগ-পর্য্যায়ের যাত্রা।" (শ্রীল প্রভুপাদ—গৌঃ ১৬।২০।২১)

তাহা হইলে ইহাই জানিবার সৌভাগ্য হইল যে, ভক্তির জয়যাত্রার অভিযান হয় বিরহের মধ্য দিয়াই। "আমরা এইরূপ যাত্রার অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ব্রজের পথে চলিতে থাকিব। ভগবৎসেবাময়ী কৃপা লাভ করিতে পারিলে

পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতির দিনে আমাদের বাস্তবসিদ্ধি শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট সেবায় পরিণত করিবে।"

'পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতি' বা এই দেহ ছাড়িয়া দিব, ইহা ত' ভাবিবার মত কোন কথাই নয়, কিন্তু কংসের এত আন্দোলনের মূল কি? দেহটি যদি ছাড়িতে হয়, এই ভয়েই ত'? হরিভজনের মূল বাধাই দেহ-চিন্তা। হরিভজনের মূল চিন্তা—শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সেবা বা বৈষ্ণব-সেবা। নাম-ভজনের প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়া মহাভাগবতের দোহার করাই বৈষ্ণব-সেবা এবং বৈষ্ণব-শিরোমণি গুরুদেবের সেবা,—ইহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। "নামগানে সদা-রুচিঃ" হইলেই দেহাদির অবিরত চিন্তা সর্ব্বতোভাবে দূর হইবে, তখনই ব্রজের পথে চলা বা কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান বা ব্রজবিজয়ানুসন্ধানের সৌভাগ্য হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাণী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিব—"শ্রীনামশ্রেষ্ঠ প্রভুর কুসুমবাণ কবে আমাদের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ের অনুসন্ধিৎসা উদয় করাইবেন?"

—:০:—

সেবা-স্তম্ভ ও সেবা-গতি

সেবামৃতসিন্ধু নিরন্তর প্রবর্দ্ধনশীল। সেবা নিরন্তর স্পর্দ্ধাময়ী -গতিশীলা—অপ্রতিহতা ও স্তম্ভ-রহিতা। সেবা—আত্মার বৃত্তি।

আত্মা—চেতন। চেতনের স্বভাবই—গতিশীলতা, আর জড়ের স্বভাব—গতিহীনতা। জড়ের যে কখনও কখনও গতিশীলতা প্রতীত হয়, তাহাও চেতনাভাসের সম্পর্কজনিত। শ্রীচরিতামৃতের "লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে করয়ে জারণ" বাক্য অথবা তলবকার-শ্রুতির আখ্যায়িকা তাহার প্রমাণ। জড়ের স্বতন্ত্র গতিশীলতা নাই, চেতন বা চেতনাভাসের সংযোগেই জড়ের গতি লক্ষিত হয়।

জড় বা অচেতনের ধর্ম্ম—স্তব্ধভাব। দেহ-মন—অচেতন। দেহ-মনের বৃত্তি—কর্ম্ম। কর্ম্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে স্তব্ধভাবযুক্ত বা স্তব্ধ-প্রবণ হইয়াও চেতনাভাসের সম্পর্কজনিত সাময়িক গতিশীলতা লাভ করে। কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষের বিরক্তি আসিবেই আসিবে। মানুষ এক প্রকার কর্ম্ম—একঘেয়ে ভাব লইয়া বহুদিন জীবনধারণ করিতে পারে না—জীবনে শান্তি পায় না। কর্ম্ম-প্রবৃত্তির আপাত প্রবল উত্তেজনায় ও কর্ম্ম-বৈচিত্র্যের একটি সাময়িক শ্রমাপনোদন-শক্তিতে অনেক সময়ে তৎক্ষণাৎ বিরক্তি উপস্থিত না হইলেও কোনদিন না কোনদিন প্রত্যেকেরই কর্ম্মে বিরক্তি উপস্থিত হয়। কর্ম্মস্রোতের ফল্গুনদী কর্ম্মকাণ্ডপ্রতীক গয়াসুরের ক্ষেত্রে প্রেতপিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া জৈমিনী বা বৈশেষিক-বাদের বালুকারাশির গহ্বরে সমাধি লাভ করে। যখন গদাধরের পাদপদ্মে গয়াসুরের কর্ম্মপ্রবৃত্তি শুদ্ধ হইয়া স্বরূপ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যদি কোন ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-কৃপাবলে জীবের সেবা-বৃত্তি বিকশিত হইয়া পড়ে, তখনই ফল্গুকর্ম্মের বদ্ধ পচা জল শুকাইয়া যায় এবং শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম-সম্পর্কে সেবামৃতলহরী

প্রবাহিত হইতে থাকে। নতুবা কর্ম্মগয়াসুরের প্রবৃত্তি বোধিসত্ত্বা-লাভের অধিরোহচেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া প্রস্তরত্ব-প্রাপ্তিকেই প্রয়োজন মনে করে।

যাঁহার আত্মাতে সহজ-সেবা-স্রোত উদ্বেলিত হইয়াছে, তাঁহার সেই অপ্রতিহত স্রোত কখনই রুদ্ধ হইবার নহে। দেবীধামের মেরু-মন্দার-হিমালয় কিম্বা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকের পর্ব্বত তাঁহার সেই সেবাস্রোতকে রুদ্ধ করিতে পারে না। যদি সেই সেবা-সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গের সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধকের পাহাড় মস্তক উন্নত করিয়া উপস্থিত হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই প্রবলতম স্রোতেই উহা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। আমরা সেবাসিদ্ধগণের চরিত্রে ঐরূপ উদাহরণ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। কিন্তু যেইখানে সেবাসিদ্ধি হয় নাই, সেবার আভাসমাত্র আরব্ধ হইয়াছে, সেইস্থানে আত্মবৃত্তি অনাবৃতভাবে বিকশিত না হওয়ায় দেহ-মনের আবরণ সেবাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার যোগ্যতা প্রকাশ করে। যেইখানে কর্ম্মবিদ্ধ বা জ্ঞানবিদ্ধ সেবাভাস দেখা যায়, সেইখানে অচিরেই আভাসটী বিনষ্ট হইবার যোগ্যতা রাখে। গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিবার পরও—সেবকাভিমানের দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অভিনয়ের পরও এইরূপ সেবা-স্তম্ভ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে সেবা-পথে প্রবেশের মুখে যেন একটি প্রবল প্রপাতের গতিশীলতা প্রদর্শন করিয়া সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিছুকাল সেইরূপ গতিশীলতা

দেখাইবার পর তাহাতে আবার সেবা-স্তম্ভভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রারম্ভ-সময়ের গতিশীলতা আর তাহাতে লক্ষিত হয় না। ক্রমে সেই ব্যক্তি নিরুৎসাহিত ও স্তব্ধহৃদয় হইয়া পড়ে। যেইখানে এইরূপ সাময়িক তরঙ্গায়িত ভাব ও তরঙ্গের অবসান লক্ষিত হয়, সেইখানে জানিতে হইবে, প্রকৃত সহজ আত্মবৃত্তির উদয় হয় নাই। কর্ম্মক্লেদের আপাত বিরক্তি ও তাপ তাহার হৃদয়ে সুখপ্রাপ্তির সাময়িক আকাশকুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া তাহাকে ক্ষণিক উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে প্ররোচিত করিয়াছে মাত্র। সাময়িক উচ্ছ্বাসের উদ্বেলন কিছুকালের মধ্যেই শান্ত হইয়া গেলে তাহার সেই সেবা-চেষ্টাভাসও স্তব্ধ হইয়া যায়। দেহমনের আবরণে আবৃত হইয়া তাহাতে যে সাময়িক উচ্ছ্বাসময় সেবাভাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা উত্তেজনা হারাইয়া স্তব্ধভাব অবলম্বন করে।

আমরা শ্রীচরিতামৃতের রূপশিক্ষায় সেবা-প্রগতির এইরূপ বিশ্লেষণে দেখিতে পাই,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল।।
প্রেমফল পাকি' পড়ে' মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়।।
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন।।"

আবার অন্যদিকে সেবা-স্তম্ভেরও বিশ্লেষণ এইরূপ,—

"যদি বৈষ্ণবাপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি' যায় পাতা।।
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তার লেখা।।
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।।
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়।।"

কর্ম্মরাজ্য-ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মহাভাগ্যবান্ জীবের যখন কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উপস্থিত হয়, তখন তিনি নিত্যা অপ্রতিহতা সেবাবল্লরীর বীজসংগ্রহের জন্য কৃষ্ণ-প্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে উপনীত হন। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে সেই সেবাবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে তিনি নিত্য-সেবার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেকের দ্বারা প্রগতি-প্রবণা সেবালতার সমৃদ্ধি করিতে থাকেন। সেই প্রগতিময়ী লতা কর্ম্মজড়তার রাজ্যে নিশ্চেষ্ট

হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, কর্ম্মময়-ধাম ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তাহার গতিশীলতা প্রকাশ করে। ক্রমে যেইখানে মিশ্র-সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অনিত্য গতিভাব বিগত হইয়াছে, সেই বিরজাজলনিধিতে লতা আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরজাতে গতিশীলতার স্বচ্ছন্দ-ক্রীড়া সম্ভব নহে বলিয়া বিরজা অতিক্রমণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে সেবা-লতার গতিশীলতা স্তব্ধ হইবার সম্ভবনা থাকায় এবং লতার আশ্রয়োপযোগী ও গতিপ্রবণতা বর্দ্ধনকারী বৃক্ষ না থাকায় সেবা-লতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে প্রবেশ করে। পরব্যোমের উর্দ্ধ্ব গোলোকে সেই লতা তাহার প্রগতি-প্রবণতার নবনবায়মান প্রেরণা-প্রদানকারী কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া অফুরন্ত নিত্যগতিশীলতার স্বারাজ্য আবিষ্কার করে।

যদি সেবা-বীজের অঙ্কুরোদ্গম বা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধমান অবস্থায় গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধরূপ মত্তহস্তী মহাদুর্দ্দৈবক্রমে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা কোমল অঙ্কুর ও ঈষৎ বিকসিত লতিকাকে একেবারে মূলের সহিত উৎপাটন করিয়া দেয় এবং লতা শুষ্ক হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সেবা-লতার বৃদ্ধি-কালে যদি কোন প্রকারে লতার সহিত ভোগ-কামনা, মোক্ষ-কামনা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা, আত্মভোগের জন্য ধনাদি-প্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহের বাসনা, লোকের নিকট হইতে পূজা পাইবার আশা বা জড়যশঃপ্রিয়তা প্রভৃতি উপশাখা-সমূহ উদিত হয়, তাহা হইলে সেকজল পাইয়া উপশাখাগুলিই বর্দ্ধিত

হইতে থাকে, মূল শাখাটী স্তব্ধ হইয়া যায়, আর বাড়িতে পারে না।

সাধক হৃদয়ক্ষেত্রে সেবালতার বীজ প্রাপ্ত হইলেও যদি সতত সাবধান না থাকেন—সতত নিষ্কপটে গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকেন—অনুক্ষণ সৎসঙ্গে সেবাপ্রাণতার আহবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থময় জাড্য আসিয়া নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছায় সেবা-প্রগতিকে স্তব্ধ করিয়া দিবে। অধিক কি, জীবন্মুক্তদশার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বা কোন প্রকার ভুক্তি-মুক্তি-কামনা দ্বারা অভিভূত হইলে জীবের সেবা-গতিশীলতা স্তব্ধ হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়,—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"
(বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট-বচন)

অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম-দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।

'জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥" (ঐ)

জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন;

কিন্তু ভগবানের একান্ত নিষ্ঠা-সম্পন্ন-যোগিগণ কখনও কর্ম্ম-বাসনায় বিলিপ্ত হন না।

ভুক্তিকামের ন্যায় মুক্তিকাম থাকিলেও সেবা বীজ সেই ক্ষেত্রে স্থায়িভাব লাভ করিতে পারে না। মুক্তিকামিগণ কোন কোন সময়ে সাময়িক সেবার ছলনা প্রদর্শন করিয়া বিমুক্ত অভিমানে সেবা-গতিকে স্তব্ধ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্ম-তপস্যার তপস্বী হইয়া আপনাদিগকে 'জীবন্মুক্ত' কল্পনায় সেবাগতির অনাবশ্যকতা বোধ করেন। যেই মুহূর্ত্তে তাহারা সেবা-স্তব্ধাভবকে বরণ করেন, সেই মুহূর্ত্তে কর্ম্ম-তপস্যার কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে পতিত হইয়া পাষাণ-সমাধি লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা সেবাবল্লরীর প্রগতিকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে নিত্য নবনবায়মান সমৃদ্ধিতে বরণ করিতে থাকেন, তাঁহাদের সেবা-বৃত্তি কোনদিনই স্তব্ধ হয় না।

কল্যাণকামী সাধক প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার সেবা-বৃত্তি গতিশীলতা প্রাপ্ত হইতেছে, কি হ্রাস হইতেছে, অথবা হ্রাস ও গতিশীলতার মধ্যবর্ত্তী স্তব্ধভাব অবলম্বন করিতেছে। সেবা-স্তম্ভ-ভাব অনেকটা তটস্থভাবের ন্যায়। তটস্থাবস্থায় কাহারও অবস্থান হইতে পারে না। যদি সেবা প্রত্যক্‌গতি-পথে পরিবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে উহার সাময়িক স্তব্ধভাব ক্রমশঃ সেবাপরাক্‌গতিতে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে একান্ত সেবা-বিমুখতায় পরিণতি লাভ করিবে। কাজেই সেবা-স্তম্ভভাবটী সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। প্রতি মুহূর্ত্তে সেবা-বল্লরী

গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেকে সমৃদ্ধ, পল্লবিত, বিকচিত ও পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত না করিতে পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। সাধক সর্ব্বদা আপনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া—গুরু-বৈষ্ণবের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া সেবা-গতির উত্তরোত্তর প্রকর্ষের পথে বিচরণ করিবেন। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন সেবা-স্তম্ভ-ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া সেবা-বিমুখতার দিকে গতিশীলতা আনিয়া না দেয়। সংসজ্জারামে বাসের একটী অমোঘ ফল এই যে, সেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবা-প্রগতি ও সেবা বিরতির পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয়। বহির্ম্মুখ-সঙ্গে বা নির্জ্জনে বাসকারী ব্যক্তি সেবা-গতির ও সেবা-স্তম্ভের পরীক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। অনেক সময়ে সেবা-শিথিলতাকে বা সেবার বিপরীত ভাবকে সেবা-গতিশীলতা ও সেবাস্থায়িভাব বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাঁহারা আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যাহাতে সেবা-স্তম্ভ ভাব কখনও উদিত হইতে না পারে—এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিরন্তর অবস্থান ও তদনুকূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া সেবা-লতাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধান উদ্দেশ্যই—সকলকে সেবা-প্রগতির পথে পরিচালন। সেই উদ্দেশ্যের জন্যই গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুক্ষণ সেবাসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন।

—০—

ভজনের শত্রু কে ?

এই বিষয়টী বিচার করিলে—দেখিতে পাই যে, আমার দেহ ও মনই আমার ভজনের পরম শত্রু। ভজনে অগ্রসর হইবার প্রথম মুখেই দেহ আমাকে বাধা দেয়, মন তাহার ইন্ধন যোগাইয়া থাকে।

শাস্ত্র ও সাধুসজ্জনগণ বলিয়া থাকেন, নিষ্কিঞ্চন মহাজনের চরণে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে ভজন আরম্ভই হয় না। কিন্তু ঐ সময়ে আমার মন বলিয়া থাকে, "সাধুর চরণে বিক্রীত হইলে তোমার এত সাধের যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রৈণগিরি বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ কিরূপে চলিবে ? সাধুর পাদপদ্মে সব সমর্পণ করিলে নরকযন্ত্রণার আধারস্বরূপ তোমার স্বাধীনতা কিরূপে থাকিবে ?

মনের পরামর্শ শুনিয়া আমি তখন আনুগত্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে কর্ম্মী হওয়াকেই শ্রেয়ো মনে করি। দেহ ও মনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অপর দেহ ও মনের পরামর্শ-গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট গিয়া উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে কখনও—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, কখনও বা ঈশ্বর-সংশ্রব চাতুর্য্য-বিশিষ্ট "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়"—এইরূপ প্রাকৃত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের-মন্ত্র কর্ণে প্রদান করিয়া থাকেন, কখনও বা আমাকে আরও উদারতার আলোক

দেখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠাশা পরিপূর্ণ দেশ ও সমাজ-সেবা-প্রভৃতি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন. কখনও বা নেশাখোর শঠ লম্পটগণের আবরণকে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া প্রচারের সাহায্য করিবার মতলব দেন কখনও বা বাহিরে পরোপকারব্রত বা পরোপকার-ব্রতের ভান দেখাইয়া আমার চেতন সত্ত্বাকে বিরজা জলধির অতল জলে ডুবাইয়া আমার আত্ম-বিনাশ সাধন করিবার পরামর্শ দেন, কখনও বা আমাকে পর্ব্বতাদির ন্যায় অচেতন অর্থাৎ নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থার লোভ দেখাইয়া থাকেন।

আমি দেহ ও মনের দ্বারা চালিত। ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বস্তুই আমার লোভনীয় পদবী। আমি দেহ ও মনের তর্পণকেই হরিসেবা বলিয়া, লিখিয়া, পড়িয়াও চালাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণ-সেবায় দেহ মনের তপণ নাই ; কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তপণ আছে মনে করিয়া কপট চোখের জলে লোকবঞ্চনা করিয়া অহৈতুকী সেবাধর্ম্ম হইতে বিরত হই।

কখনও আবার কপট-বৈষ্ণব সাজিয়া যে যে-বস্তুতে আমার ইন্দ্রিয়-তপণ হইতে পারে তত্তদ্‌বস্তুগুলি স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-বিদ্বেষের উদ্দেশে আমাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আনুগত্যধর্ম্ম হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকি।

কপট বৈষ্ণব সাজিয়া, দীক্ষিতের অভিনয় করিয়া আমি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই, শ্রৌতপন্থা ত্যাগ করিয়া আমি মনোধর্ম্মীর গড্ডালিকাপ্রবাহে ধাবিত হইয়া থাকি।

আমি কলির বাসস্থান পঞ্চক অর্থাৎ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূ(না) (পশুবধাদি) এবং স্বর্ণ ইহাকেই আমার ভজনের সহায় বলি(য়া) বরণ করি। যাহারা এই কলিপঞ্চকে অবস্থিত তাহাদিগকে বৈষ্ণ(ব) বলিবার ধৃষ্টতা করি? আমি খুব ভজনানন্দী, সর্ব্বদা আমার চি(ত্ত) এতদূর উচ্চরাজ্যে বিচরণ করে যে, সময়ে সময়ে আমাকে দেহস্মৃ(তি) আনাইবার জন্য বা অন্তর্দ্দশা হইতে বাহ্যদশায় নিজকে আনয়(ন) করিবার জন্য আমার তাস পাশার দরকার হয়, পান তামাকা(দি) আমার ভজনের উত্তেজক বা উৎসাহবর্দ্ধনকারী বলিয়া আ(মি) তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কখনও বা ভাবের ঘ(রে) চুরি করিয়া ও বোকা লোককে ঠকাইয়া বলিয়া থাকি যে, তামা(ক) ও চা না খাইলে আমার পেটে বায়ু জন্মিয়া থাকে ও ম্যালেরিয়া(য়) আক্রমণ করে সুতরাং ভজনে বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়ে। আ(মি) ঔষধরূপেই তামাক, চা বা অহিফেন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকি ভোগবিলাসের জন্য এই সকল গ্রহণ করি না। কখনও রাগানুগ(া) ভজনের ছল করিয়া শাস্ত্রের আদেশগুলি বিধিমার্গীয় ব্যক্তিগণের জন্য লোককে বুঝাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবগণ যখন বোকা তখন প্রেমের ছলনায় কপটতা করিয়া কাঁদিতে পারিলেই বৈষ্ণবগণকে ঠকাইতে পারি। তাহাদিগকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হই। অর্থের তাড়নায়, সাধুবিদ্বেষে(র) উদ্দেশে ভক্তসজ্জায় আমি নানা কপটতা করি। কোনও সময় ভাবি সাধুর সঙ্গে থাকিলে, তাঁহারা আমাকে ঐ সকল কলির স্থা(ন) হইতে উদ্ধার করিবেন সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গে থাকি(ব না)

না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়-ভোগপর মনই আমার গুরু। মনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। মন তখনি বলিয়া উঠে, 'তুমি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ' গৃহে যাও, গৃহে গিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন কর, অন্তর্নিষ্ঠা ও বাহ্যে লোকব্যবহার করিতে থাক, মর্কট-বৈরাগ্য ভাল নহে; যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রৈণভাববিবর্দ্ধন করিলেই কৃষ্ণভজন হইয়া পড়িবে। লোকচক্ষে বৈষ্ণব-লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবে।

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের কদর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণকেই যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া মনে করি, গৃহব্রত-ধর্ম্মকেই গৃহস্থধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। মায়ার সংসারকেই কৃষ্ণের সংসার বলিয়া মনে করি, আমার ইন্দ্রিয়সেবাকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া বরণ করিয়া থাকি এবং তাহা লিখিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশে বৈষ্ণব-লেখক হইয়া পড়ি।

"শয়তানও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে পারে"– সুতরাং আমি তখন নানা প্রকার তামসিক বা রাজসিক শাস্ত্র হইতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল বচন উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রিয়সেবা চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লই।

মনোধর্ম্মের 'পাল্লায়' পড়িয়া কখনও প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়ি, নিজের শতসহস্র ছিদ্র ও দোষ রহিয়াছে, পাছে সেইগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই জন্য জগতে যত প্রকার ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, কপটতা থাকুক্ না কেন, সেইগুলি অপরকে দেখাইয়া দিবার সাহস পাই না। "তৃণাদপি" শ্লোকের কদর্থ করিয়া সেই কদর্থের আশ্রয়ে নিজকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। অবৈষ্ণবতা

বা কপটতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াকে 'পরনিন্দা' বা 'পরচর্চ্চা' বলি। সেই সময় আমি খুব 'তৃণাদপি সুনীচতা' দেখাই, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে আমি কখনও পশ্চাৎপদ হই না। আমার ভোগোন্মুখী ইন্দ্রিয়জ্ঞানে শুদ্ধ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য চেষ্টায় কোথায় কোন্ ছিদ্র আছে তজ্জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি এবং অক্ষজ জ্ঞানে তাঁহার অচিন্ত্যচেষ্টার সমালোচনা করিতে শতজিহ্ব হইয়া পড়ি, তখন 'তৃণাদপি' শ্লোক আমার মনে থাকে না। আমার দুর্দ্দৈব কাজের বেলা 'তৃণাদপি' শ্লোক আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন আর অকাজের বেলা আমার মনোধর্ম্ম 'তৃণাদপি' শ্লোকের ছায়া বা বিকৃত প্রতিফলন গ্রহণ করিয়া আমাকে বৈষ্ণবাপরাধে নিমজ্জিত করাইয়া থাকে।

তাই বলিতেছিলাম, এই দুষ্ট মনই আমার গুরু। যদি আমি আমার মনোধর্ম্মকে গুরু না করিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণবের পদতলে বিক্রীত হইতে পারিতাম, তাঁহাকেই যদি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার একমাত্র কর্ণধার বলিয়া বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার দেহতরণী আমাকে ভগবৎকৃপানুকূল বায়ুতে অচিরেই বৈকুণ্ঠ রাজ্যে লইয়া যাইত।

আমার এই মনোবেদনা কেহ শুনিবেন কিনা জানিনা, আমার বেদনায় কেহ সমবেদনা প্রকাশ করিবেন কিনা জানিনা, আমার খেদ-গীতি কাহারও প্রাণে ঝঙ্কৃত হইবে কিনা তাহাও জানি না, তবে আমি বলিতে পারি যে আমি "কানে দিয়াছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো," আমার মত হরিকথাবিমুখ, প্রকৃত মঙ্গলের

কথায় বধির ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ মনোধর্ম্মের তাড়নায় বিতাড়িত আমাকে কে রক্ষা করিবেন ? আমার মনে হয়,—

"এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥"

আবার বলি এই নিত্যানন্দ আমার মনের ছাঁচে গড়া নিত্যানন্দ নয়, মনোধর্ম্মের নিত্যানন্দ নয়, উহা মায়া। এই নিত্যানন্দ অধোক্ষজ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেব। এই নিত্যানন্দ আমার চিত্তের যাবতীয় কল্মষবিধ্বংসকারী, আমার মনোধর্ম্মের অসংখ্য দুষ্টগ্রন্থিছেদনকারী, আমার বিশিষ্ট আসক্তির নির্ম্মূলকারী। আমি যেন নিষ্কপটে সেই নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইতে পারি।

—:•:—

ভক্তিবিনোদ-ধারা ও আশ্রয়

অব্যভিচারিণী সত্যকথা বলিবার ও শুনিবার লোক জগতে দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ। বর্ত্তমান যুগকে কলিযুগ বা তর্কের যুগ বলিলেও কথাটি সম্পূর্ণ হয় না, ইহা আন্তর্জাতিক কুতর্ক ও বিবাদের যুগ। প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগীয় ভারত, কিংবা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভারত বা তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সময়ের ভারতে

বিবাদ ও তর্ক এইরূপ আন্তর্জাতিক ব্যাপকতা ও কপটতার আবরণে সমাচ্ছন্ন হয় নাই, যতটা হইয়াছে এই যুগে। এই আন্তর্জাতিক তর্কের 'নালীঘা' সমাজ-শরীরে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার প্রচ্ছদপটে একটি আপাত সমন্বয়ের রং লেপনের চেষ্টা হইয়াছে —'নালীঘা' কিন্তু বাড়িয়াই যাইতেছে, ক্রমশঃ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, সমাজ-শরীরকে ধীরে ধীরে জ্বলন্তচিতার বক্ষে তুলিয়া দিতেছে, অথচ আপাতসুবিধাবাদ সংরক্ষণের জন্য একটি 'জোড়াতালি দেওয়া' 'তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপ্'—নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপ যুগে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা অটুট ভাবে অনুসরণের পথ সহস্র কণ্টকে কণ্টকাকীর্ণ। ভক্তির বিনোদন করিতে হইলে অভক্তির কোন কথার সহিতই গোঁজামিল দেওয়া চলে না। আর অভক্তির বিনোদন করিতে হইলে সমস্ত কথার সহিত 'সায়' দেওয়া চলে এবং গিল্‌টিকরা মিছাভক্তি ও অনর্থকে 'ভক্তি' ও 'পরমার্থ' বলিয়া চালান' যায়। যে মূল অমৃতসিন্ধু হইতে ভক্তিবিনোদ-ধারার খাত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গোড়ার কথাই এই—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯

স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত অন্যাভিলাষ, ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া (?) যাওয়ার জ্ঞান, সকাম্ কর্ম্ম বা শ্রীহরির পূর্ণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি রহিত নিষ্কাম-কর্ম্মের ছলনা, অষ্টা-

দশ-সিদ্ধি বা কৈবল্য-কামনায় যোগ, ব্রত বা তপস্যা—সমস্তই 'অভক্তি'। এই সকল অভক্তির বিনোদন বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনুকূলকৃষ্ণের অনুশীলনই 'ভক্তির বিনোদন'।

'অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন'—ইহাই ভক্তিবিনোদ-ধারার মূল প্রবাহ। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের বিনোদন-কার্য্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ, সেই শ্রীরাধার বিনোদকারী শ্রীহরিই অনুকূল-কৃষ্ণ। ইনি কংসের ধারণার কৃষ্ণ, পূতনার কৃষ্ণ, অঘাসুর-বকাসুরের কৃষ্ণ, যাজ্ঞিকবিপ্রগণের কৃষ্ণ, প্রলম্বের কৃষ্ণ বা মোহিত ব্রহ্মার কৃষ্ণ নহেন। অধিক কি, ইনি চন্দ্রাবলী-শৈব্যাদির কৃষ্ণও নহেন—ইঁহাদের কৃষ্ণ—প্রতিকূল কৃষ্ণ ; আর শ্রীরাধা ও তাঁহার নিজস্বগণ শ্রীললিতাদি, শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীতুলসীমঞ্জরী, প্রভৃতির কৃষ্ণ—অনুকূল-কৃষ্ণ।

ভক্তিবিনোদধারার আকরস্থান শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম স্বয়ং শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাব ও কান্তিতে বিভাবিত হইয়া অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকেই রূপ দিয়াছেন। সেই রূপই স্বরূপ ও রূপে, রূপানুগ শ্রীজীব ও রঘুনাথে, তদনুগ কৃষ্ণদাস কবিরাজে, ঠাকুর নরোত্তমে, চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথে, বিদ্যাভূষণ বলদেবে, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম জগন্নাথে ও ভক্তিবিনোদে বিনোদিত হইয়া গৌরকিশোর-সরস্বতীতে রূপোৎসব লাভ করিয়াছে। কেবল ইহা আমাদের মৌখিক উক্তি নহে, ইঁহাদের বাণীই তাহা সর্ব্বোতোভাবে প্রমাণ করিবে।

শ্রীরূপের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং'—শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীল শ্রীজীব প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে সেই সিদ্ধান্তই শ্রীমদ্ভাগবতের অসংখ্য প্রমাণ অবলম্বনে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু স্তবাবলীর 'মনঃশিক্ষা'য় জীবকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥"

হে মন! তুমি যাবতীয় অসৎকথারূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, কেননা, তাহা মনোমোহন বেষের দ্বারা লোককে ভুলাইয়া বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বকে অপহরণ করিয়া থাকে। মুক্তি-স্বরূপা ব্যাঘ্রীর কথাও শ্রবণ করিও না; যেহেতু, উহা সমস্ত আত্মাকে গ্রাস করিয়া থাকে, আর ঐশ্বর্য্যবিচারপর শ্রীনারায়ণভক্তিও ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়, তাহাও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভজন কর। যেহেতু, শ্রীরাধাগোবিন্দ আত্মার নিত্যসিদ্ধ সম্পদ্ প্রেমমণি প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপানুগ-ধারায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—

"'অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮, ১৬৯)

সেই ধারায় ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন—

'কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ,' ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥"

এই সকল বাস্তবসত্য যাহা প্রেমমহামণির কষ্টিপাথর তাহা বর্ত্তমান যুগে রূপানুগ-ধারায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লেখনী ও বাণীর মধ্যে—যুগপৎ আচারে ও প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—

"জ্ঞানকাণ্ডী ও কর্ম্মকাণ্ডী আপনাদিগকে পারমার্থিক বলিয়া অভিমান করেন, বস্তুতঃ তাঁহারা ঐহিক ও নৈমিত্তিক। তাঁহাদের

যত প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা, সমস্তই নৈমিত্তিক।”—(জৈবধর্ম্ম ৫ম অঃ ৭৩ পৃঃ)

আজকাল একান্ত সত্য কথা বলিলেই বহির্ম্মুখগণগড্ডলিকা সেইরূপ অকপট সত্যকীর্ত্তনকারীকে গোঁড়া বা একঘেয়ে' বলিয়া আখ্যা প্রদান করে ; কিন্তু সজ্জনগণ চিরকালই সেইরূপ অকপট সত্যকথা-কীর্ত্তনকারীকে 'বদান্য', 'ভূরিদ' ও 'পরোপকারক' বলিয়াই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতিকে অসৎসঙ্গ বলিয়াছেন, আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদকে অসুরমোহন মতবাদ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন. তিনি দাক্ষিণাত্যে হরিকথা-প্রচারকালে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদ নিরাস করিয়া সকলকে শুদ্ধবৈষ্ণব করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবকে তজ্জন্য 'গোঁড়া', 'একঘেয়ে' ও 'হিংসক' না বলিয়া সজ্জনগণ 'মহাবদান্য' ও 'প্রেমাবতার' বলিয়াই পূজা করিয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-রূপাদি আচার্য্যগণ প্রেমময়ী শুদ্ধভক্তির যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন সত্য, তাহার দু'চারিটি কথা কণ্ঠস্থও করিয়া থাকেন ; কিন্তু কার্য্যকালে যুগপৎ আচারে ও প্রচারে, মনে ও মুখে, সর্ব্বতোভাবে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন ও একনিষ্ঠ হইয়া জীবনে প্রতিফলিত করিবার আদর্শ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়—খুব কম কেন, আদৌ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাহার কারণ, সেই সকল কথা যে ধারার মধ্য

দিয়া অনুক্ষণ শ্রবণ করিলে হৃদয়দৌর্ব্বল্যে অনুক্ষণ পীড়িত অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব গণগড্ডলিকার বিপরীত স্রোতঃ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অসীম হৃদয়-বল লাভ করিতে পারে, সেই বল কেবল নিজের চেষ্টায় বা জগতের অধিকাংশ ব্যক্তির আচরণকে আদর্শ ও নজীর করিলে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সমস্তলোক যে বিপরীত প্রবাহে গড্ডলিকার ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে, সেই প্রবল স্রোতঃ হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে অন্য এমন এক প্রবলতম প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, যাহা কেবল সংখ্যাধিক্যের বলে 'সত্য' নির্ণয় করে না। সেইরূপ ধারা জগতে ও যুগে অনেকগুলি প্রবাহিত হয় না।

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' শ্লোকটি অসংখ্য তিলক-ফোঁটাধারী ব্যক্তিগণের কয়জন আচারে ও প্রচারে প্রতিপালন করিতে সংসাহসী হইয়াছেন? 'মহাপ্রভুর ভক্ত' বলিয়া অনেকেই ত' আমরা দাবী করি ও দোহাই দিই, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, ব্রতিগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া না চলিলে আমাদের পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরও অনেকে বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন— "ইহাদের দল পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবলতা ও ব্যাপকতা লাভ করায় উহাদের সঙ্গে 'মৌখিক সায়' না দিলে চলে না; কিন্তু অন্তরে আমরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকি।" যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগের ঐ কথাই আবার পরে 'মৌখিক' বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতিগণের সহিত এইরূপ আন্তরিক সঙ্গ করিয়া থাকেন যে, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ শুদ্ধবিচার ও আচার প্রচারিত ও কার্য্যে প্রতিপালিত হয়, তখন তাঁহারাই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীদের দলে মিশিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণকে নানাপ্রকারে বাধা প্রদান করিবার যুগ্মবল সংগ্রহ করেন। গৌড়ীয়মঠের এই কএকবৎসরব্যাপী প্রচারের ইতিহাসের মধ্যে ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে। অনেক সময় যাঁহারা আপনাদিগকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিয়া দোহাই দেন, তাঁহারাও গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-প্রচারের অভ্যুদয় দেখিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বীর সুবৃহৎ দলগুলিকে (কারণ, পৃথিবার সকলেই ঐসকল শ্রেণীভুক্ত) শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের প্রতি 'লিলাইয়া' দিয়া থাকেন।

এক সময় স্বনামপ্রসিদ্ধ * * ঘোষ মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বলিয়াছিলেন যে, 'অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী, চূড়াধারী, গোপীছাড়ি সকলের ভালমন্দের দিকে এখন না দেখিয়া তাহাদিগকে একবার গৌরাঙ্গের (?) খোয়াড়ে ঢুকান' যাক ; তারপর যাহারা টিকে টিকিবে, আর যাহারা চলিয়া যায় চলিয়া যাইবে।" কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিলেন,—'দুষ্টগরু হইতে শূন্য গোয়াল ভাল।' ঐসকল ব্যক্তি যদি তাহাদের ঐসকল অসৎপ্রবৃত্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর গোয়ালে প্রবেশ করে, তাহা

হইলেই তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল হইবে, নতুবা মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া তাহারা জগতে আরও অধিক কলঙ্ক আনয়ন করিবে। সাধারণ অজ্ঞলোক মনে করিবে—(যেমন বর্ত্তমান অনেকে করিতেছেন)—যে, "নানাপ্রকার অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ব্যভিচার, কপটতা, প্রভৃতি কুবৃত্তিগুলিই মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ।"

এইখানেই ভক্তিবিনোদ-ধারার সহিত অন্যান্য ধারার বিচার-ভেদ হইয়াছে। ভক্তিবিনোদ-ধারা কোন প্রকার অশুদ্ধতা ও কপটতার সহিত আপোষ করিতে প্রস্তুত নহেন, সমগ্র জগতও যদি সেই কপটতাকে মহাসমাদরে বরণ করিয়া লয়। ভক্তিবিনোদ-ধারা আদর্শকে কিছুতেই কোনরূপে লঘু করিতে প্রস্তুত নহেন। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা বা সমষ্টিগত দুর্ব্বলতাকে সমর্থন করিতে গিয়া আদর্শকে ছোট করিলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সেই দুর্ব্বলতা কোন দিনই বিদূরিত ত' হইবেই না, পরন্তু কেবল বাড়িয়াই যাইবে। ভক্তি-বিনোদ-ধারায় প্রবেশ করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি অনর্থ-বশতঃ তাহা হইতে পতিত বা ভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার সেই ব্যক্তিগত পাতিত্যকে সমর্থন করিয়া ভক্তিবিনোদ-ধারার মূল আদর্শের উন্নততম শৃঙ্গকে কাটিয়া ছাটিয়া দিলে কাহারও কোন-প্রকার মঙ্গল হইবে না। ইহাই ভক্তিবিনোদ-ধারার যেমন একটি বিশেষ কথা, আবার ইহাও সত্য যে—ভক্তিবিনোদ ধারার শুদ্ধ আচার-প্রচার অনুসরণ করিয়া যিনি যতটুকু চলিলেন এবং চলিবার পর যদি অনর্থের প্রাবল্য-বশতঃ কাহারও কিঞ্চিৎ পদস্খলনও হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বে তিনি যে পথটুকু চলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধভাবে

চলার দরুন পূর্ব্বের কার্য্যটি ব্যর্থ হইল না বা তিনি চিরবিপথগামী অন্যাভিলাষীর ন্যায় মঙ্গলের পথ হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহাও নহে। কারণ তিনি পূর্ব্বে যে পথটুকু হাঁটিয়াছেন, তাহা সুপথেই হাঁটিয়াছেন, বিপথে হাঁটিয়া পণ্ডপরিশ্রম করেন নাই।

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥"
(ভাঃ ১।৫।১৭)

—নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম-পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয় তথাপি কর্ম্মে অনধিকার-হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যেহেতু, যে কোন অবস্থায় এমন কি নীচ-যোনিতেও থাকুক না কেন, সেই ভক্তি-রসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবা-বাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তি-গণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোন প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়?

'ভক্তিবিনোদ-ধারার উচ্চতম আদর্শ পরিপালন করিতে সমর্থ হইব না, সুতরাং তাহাতে প্রবেশ করিব না' অনেকে এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধ-লেখকই একসময় ভক্তিবিনোদ-ধারার উচ্চতম আদর্শের কথা শ্রবণ করিয়া সেই আদর্শ

পরিপালনে সমর্থ হইবেন না, এইরূপ আশঙ্কান্বিত হইয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলে তিনি ভক্তিবিনোদ-ধারার একমাত্র সংরক্ষক আচার্য্যের নিকট হইতে ভাগবতের উপরিউক্ত প্রমাণ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সন্দেহমুক্ত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ অনেক সময় প্রস্তাব করেন,—যদি গৌড়ীয় মঠ অন্ততঃ কয়টি বাহ্যবিষয়ে একটুকু শিথিলতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে জগতের বহুলোক গৌড়ীয়মঠের শিষ্য হইতে প্রস্তুত আছেন। উহার যে তালিকা তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা এই—১। তাম্বূলাদি ছোট ছোট মাদকদ্রব্য-সেবনে অনুমতি, ২। মৎস্য-মাংস-পরিত্যাগ-বিষয়ে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা না করা, ৩। অন্যাভিলাষী' কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বিগণকেও অন্ততঃ মুখে 'সাধু' বলিয়া স্বীকার করা, ৪। কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের বিচার পরিত্যাগের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ না দেওয়া, ৫। দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার অবলম্বন না করা, ৬। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তেরটি সম্প্রদায়ও মহাপ্রভুকে মানেন,—ইহা স্বীকার করা, ৭। অর্থের বিনিময়ে ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, দীক্ষাদানাদি কার্য্যও 'ভক্তিধর্ম্ম'—ইহা স্বীকার করা, ৮। সকল সম্প্রদায়ের সহিতই মিলিয়া মিশিয়া চলিয়া নিজেদের বিচার কেবল নিজেদের মনে মনে রাখা, ৯। ঐসকল সম্প্রদায় বা ব্যক্তির মতবাদ বা মনোধর্ম্মের শাস্ত্রযুক্তিমূলক সমালোচনা ('নিন্দা'?) না করা, ১০। শ্রীরূপানুগ বিচারই প্রেমলাভের একমাত্র পথ ও রূপানুগ জনগণই একমাত্র প্রেম ভক্তি-সংরক্ষক—এইরূপ স্পর্দ্ধা (?) প্রকাশ না করা ইত্যাদি।

তাঁহারা এমনও বলেন, গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের নিজস্ব ঐসকল কথা বিসর্জ্জন করিলে গৌড়ীয়মঠে সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক লোক আসিয়া যাইবে। কারণ, গৌড়ীয় মঠ শিক্ষিত. সম্ভ্রান্ত, ত্যাগী ও নির্ম্মলচরিত্র ভক্তিপ্রাণ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলায় সুপরিচালিত অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। যাঁহারা এই প্রস্তাব করেন, তাঁহারা বস্তুত: গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুবিধাদের কাল্পনিক সৌধের মধ্যেই প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। 'শিষ্য' হওয়া অর্থ – বাস্তবসত্যের শাসনযোগ্যতা বরণ করা ; বাস্তবসত্যকে নিয়মিত করা নহে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গলা ১৩০৬ সালে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১১শ খণ্ড ৩য় সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন – **'কেবল সংসারী লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের উদয় হইবে, তাহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদঢেউতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেই সকল সংসারী লোকদিগের নির্দ্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষার বিরুদ্ধতা স্বীকার করা অতীব অন্যায়।'**

ভক্তিবিনোদ-বাণীতে যে কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত ভক্তিবিনোদধারায় সংরক্ষিত হইবে। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য

সেই কথাই সিংহ-হুঙ্কারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন আপোষ নাই। যদি কেহ ভক্তিবিনোদ-ধারার পরিচয় দিয়া সত্যানুসন্ধিৎসা ও বাস্তবসত্যে একনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে লোকপ্রিয়তা ও তদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই বড় মনে করেন, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি বা মত ভক্তিবিনোদধারা হইতে হয় উৎক্ষিপ্ত না হয় চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছে। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের নিদর্শন দেখিলেই তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিতেন, তদ্রূপ স্বরূপ-রূপানুগ-শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে অকপট একনিষ্ঠ অনুরাগ দেখিলেই সেখানে নিঃসন্দেহে ভক্তিবিনোদ-ধারার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা যায়।

> "কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
> মাধবেন্দ্রপুরীর 'সম্বন্ধ' ধর জানি॥
> কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ'।
> তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥"
>
> (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৭২-১৭৩)

'গৌড়ীয়'পত্রের প্রথমবর্ষে একটি বিচার-আদালত বসিয়াছিল, তাহাতে মানবসাধারণ গৌড়ীয়গণের বিরুদ্ধে যে নালিশ করিয়া থাকেন, তাহার আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল। মানবসাধারণের নালিশের কারণ—গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া মানবসাধারণের কায়-মনোবাক্যের সহিত গৌড়ীয়ের কায়-মনোবাক্যের ভেদ স্থাপন করেন, তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ নালিশ। তাহাতে উচ্চতম বিচারপতির নিত্যসিদ্ধ আসন গ্রহণ করেন (শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণানু-

সারে) স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু; সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ—এই দ্বাদশজন মহাভাগবত।

মানবসাধারণ একমত হইয়া সমবেত কণ্ঠে অনন্তকাল ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দ্দশ ভুবন কম্পিত করিয়া ফেলিলেও বাস্তবসত্যের একনিষ্ঠ উপাসকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার ও শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের বাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিবেন—শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমল প্রমাণ, তাহাই একমাত্র "মধ্যস্থ বিচারক", শ্রীচৈতন্যদেবই মহাজনগণের শিরোমণি। সেই পাদপদ্ম হইতে প্রবাহিত **রূপানুগ ভক্তিধারাই অধোক্ষজ কৃষ্ণপ্রেম লাভের একমাত্র ধারা—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—অন্য পথ নাই—নাই—নাই।** আবার আচার্য্যের বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়া ঊর্দ্ধ্ববাহু হইয়া তাঁহারা গান করিবেন—"**তত্রাদরো নঃ পরঃ" – একমাত্র রূপানুগ – ভক্তিবিনোদ-ধারাতেই আমাদের আদর, অন্যত্র আমাদের আদর নাই—আদর নাই—আদর নাই।** আবার শ্রীচৈতন্যদেবের মুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্রীয় বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিবেন—"**নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা**"—রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় আচরিত ও প্রচারিত অপরাধ-শূন্য নামভজনের পথব্যতীত অন্য **গতি নাই—অন্য গতি নাই—অন্য গতি নাই।** আবার শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিবেন— "**পরিবদতু জনো যথা তথা বা**"—সমগ্র জনসাধারণ যাহা ইচ্ছা তাহা বলে

বলুক, আমরা একমাত্র রূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারারই অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার সহিত অনুসন্ধান করিব। আমরা জানি, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুই প্রেমভক্তি-প্রদানের একচেটিয়া মালিক, আমরা জানি, ভাগবতধর্মই একমাত্র আত্মধর্ম্ম—'প্রোজ্ঝিত কৈতবধর্ম্মঃ'—আর সব দেহধর্ম ও মনোধর্ম, তাহা ন্যূনাধিক কোন না কোনপ্রকার কপটতাপূর্ণ। আমরা ভক্তিবিনোদবাণীতে—ভক্তিবিনোদ-ধারাতে ইহাই একমাত্র একচেটিয়া সত্য বলিয়া জানিয়াছি যে, সাত্বতশাস্ত্র-কথিত সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ই—সদ্ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আর তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিনোদ-বাণীতে ইহাও শুনিয়াছি যে—'স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটি মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। —('শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', নবম পরিচ্ছেদ) এই একমাত্র সত্য, এই একমাত্র মত, এই একমাত্র পথ, এই একমাত্র ধর্ম্ম, এই একমাত্র সম্প্রদায়, এই একমাত্র গতি, এই একমাত্র মতি, এই একমাত্র পতি, এই একমাত্র রতিই, আমাদের—বিশ্ববাসি-জীবের নির্ম্মল আত্মার উপাস্য হলে সমগ্র জগতের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে কেবল তাঁহার ঐ অমন্দোদয়-দয়ার বাণী, যাহা শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে আমরা অনুক্ষণ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ভজন-পূজন, জপ-তপঃ। আমরা সেই রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারাকে

যেন অনুক্ষণ আশ্রয় করিয়া মানব সাধারণের অনর্থপূর্ণ চিৎকার উপেক্ষা করিয়া রূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের অনুসরণে বলিতে পারি—

'আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীবিনোদপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥'

—:০:—

"বঞ্চক বৈষ্ণব"

এ আবার কেমন কথা! বৈষ্ণবও কি কখনও বঞ্চক হন? এ যে মহা অপরাধের কথা। কানে শুনিতে নাই—ওঁ শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু। পাঠক-পাঠিকাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না; বৈষ্ণব—বঞ্চক, পরমবঞ্চক। জগতে যদি কেহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বঞ্চক থাকেন, তাহা হইলে তিনিই ঐ "বৈষ্ণব"। বৈষ্ণবের ঐ বঞ্চকতা উত্তরাধিকারীসূত্রে পাওয়া বস্তু। বিষ্ণু একজন পরমবঞ্চক। ছলনাকারি বামনদেবের কথা শুনিয়াছেন ত? বিষ্ণুর এইরূপ বহু বহু বঞ্চকতার উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। বিষ্ণুর বঞ্চকতায় তাঁহার ভক্ত মোহিত হন না, প্রাকৃত লোক ও অসুরকুল মোহিত হইয়া পড়ে। বিষ্ণু স্বীয় বৈষ্ণবী-মায়াদ্বারা আসক্ত জ্ঞানী বলিয়া অভিমানী বদ্ধজীবগণকে হাতে মোয়া দিয়া বঞ্চনা করেন। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইয়াও বিষ্ণুমায়াদ্বারা বঞ্চিত। ভগবানের একটি নাম বাঞ্ছাকল্পতরু, যিনি যেমন ভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন বিষ্ণু

তাঁহার নিকট সেইরূপ ভাবেই প্রকাশিত হন। যাঁহারা বিষ্ণুকে বঞ্চনাকারিরূপে চান বিষ্ণুও তাঁহাদের নিকট তাঁহার মায়ানির্ম্মিত বঞ্চকমূর্ত্তিটী প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা আত্ম বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তাঁহাদের নিকট বঞ্চক। কিন্তু আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি ঐ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বঞ্চনাটী ধরিতে পারেন না, ধরিতে পারেন তাঁরা, যাঁরা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিকট হইতে বঞ্চিত হইতে চান না, যাঁ'রা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিষ্কপট কৃপালোকে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত।

'বঞ্চক-বৈষ্ণব' আত্মবঞ্চিত জীবগণের নিকট তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাই, আজ দেখিতে পাওয়া যায় সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনগণ, অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরজনগণ জগতের বঞ্চিতব্যক্তিগণের নিকট অপরিজ্ঞাত। বঞ্চক-ভগবান্ আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণকে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে না দিয়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বঞ্চিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়াকেই তাঁহাদের কামদাত্রী ঈশ্বরীরূপে আরাধনা করিয়া—আরও অধিকতররূপে বঞ্চিত হইতেছেন। গীতার ভগবদ্বাণী সার্থক হইতেছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

যাঁহারা বঞ্চিত হইবার জন্য উদ্যত, ভগবান্ তাঁহাদের নিকট বঞ্চকরূপে তাঁহার নিষ্কপট স্বরূপ-প্রকাশ না করিয়া কপটমায়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিলষিত পূরণ করিতেছেন।

জড়-সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, কবি, ঐতিহাসিক, গবেষণা-নিপুণ ব্যক্তিগণের বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ —ইহারা কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণের নিকট— 'বঞ্চক'। ঠাকুর হরিদাস, রায় রামানন্দ--ইঁহারা জগতের ইন্দ্রিয়তর্পণপর মূঢ় লোকের নিকট বঞ্চক। ইঁহারা জড়ব্যক্তিগণের যোগ্যতা-নুযায়ী বঞ্চক বলিয়াই শ্রীরূপসনাতন তাঁহাদের সত্য ধারণায় পূর্ব্বে বিষয়ী ও ম্লেচ্ছসেবী (?) শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাদের ধারণায় একজন ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি (?) ঠাকুর হরিদাস তাঁহাদের ধারণায় যবন (?) রায় রামানন্দ একজন বুঝি তাঁহাদেরই মত ভোগী, বিষয়ী পাটোয়ার করণ, রাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতি (?)। বৈষ্ণব, জড়ব্যক্তির নিকট বঞ্চক বলিয়াই শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীজীবের বৃন্দাবনে একত্র বাস বঞ্চিত প্রাকৃত ভোগী জীবের চক্ষে তাঁহারই ন্যায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াও পুনরায় রক্তমাংসের আকর্ষণ-হেতু ভ্রাতুষ্পুত্র, জেঠা খুড়ার একত্র বাসের ন্যায় প্রতিভাত হন। বৈষ্ণব 'বঞ্চক' বলিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈষ্ণব-গার্হস্থ্যলীলা, রাজকর্ম্ম প্রভৃতি এবং প্রকৃতপারমহংস্যাধিকার প্রদর্শন জন্য বেষাশ্রম গ্রহণ করিবার পরে কিছুকাল হরিভজনময় গোলোক প্রতীতিযুক্ত-গৃহে অবস্থান। বৈষ্ণব 'বঞ্চক' বলিয়াই সহজ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পরমহংসাবধূত শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের আশ্রিতম্মন্য বঞ্চিত ব্যক্তি-গণের সহিত চালের দর, ভূষিমালের দর, জায়গা জমিনের দর,

বহির্ম্মুখগৃহের স্ত্রীপুত্রাদিরকুশল জিজ্ঞাসারূপ লীলা। বৈষ্ণব, 'বঞ্চক' বলিয়াই শ্রীল পরমহংস মহারাজের কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার সাধারণের মলত্যাগের স্থানে অবস্থান, কখনও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কখনও কালপেড়ে ধুতি, চাদর-পরিধান প্রভৃতি অভিনয়। বৈষ্ণব, 'বঞ্চক' বলিয়াই কুলিয়া নবদ্বীপের নূতন চড়ায় শ্রীল বংশী-দাস বাবাজী মহাশয়ের অর্চ্চনমার্গীয় কনিষ্ঠাধিকারিব্যক্তির ন্যায় আচরণ এবং—"সংসারের জঞ্জাল্যা কাম না ছাড়িলি মোরে" অর্থাৎ হে ভগবন্, আমাকে হরিভজন করিতে আনিয়াও তুমি সংসারের স্ত্রী পুত্রের সেবার ন্যায় বাসনমাজা, বাজার করা, ঘর পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্য ছাড়াইলে না।" ইত্যাদি লীলাভিনয়—এই সব কথা শুনিয়া আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, "এই ব্যক্তি বোধ হয় ভজনে অগ্রসর হইতে না পারিয়া এবং পূর্ব্বে সংসারে তাঁহার যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইত, সেই সমস্ত কার্য্যই পুনরায় তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য করিতে হইতেছে বলিয়া হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, তাই এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মূঢ়লোক—আত্মবঞ্চিত লোক বুঝিতে পারেন না, যে, তিনি বহির্ম্মুখ লোককে 'ভোগা' দিবার জন্য এবং একান্তে তাঁহার ভাবসেবা সুষ্ঠুভাবে সাধন করিবার জন্য ঐরূপ বঞ্চক সাজিয়াছেন। এই মহাত্মা অনেক সময় হস্তে একটী "হুঁকা" লইয়া তামাক পান করিবার ভান দেখান, কোন সময়ে বা তাঁহার ভজনকুটীরের নিকটে মৎস্যের আঁইশ, কাঁটা প্রভৃতি ফেলিয়া রাখেন, উদ্দেশ্য ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন অবৈষ্ণব বা কপট-বেশী

জ্ঞানে ঘৃণা পূর্ব্বক তাঁহাকে আর সম্মানাদি করিবেন না বা তাঁহার নিকট আসিবেন না, তিনিও একান্তে হরিভজন করিতে পারিবেন। কিন্তু আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণ তাঁহার এই বঞ্চনা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার লম্বমান শ্মশ্রু প্রভৃতি দেখিয়া আত্মবঞ্চিতব্যক্তিগণ মনে করেন, তিনি বুঝি একজন বাউল বা দরবেশ শ্রেণীর কোন লোক হইবেন। বঞ্চিত ব্যক্তিগণ এইরূপ নানাভাবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তি আমাদের নিকট এই 'বঞ্চক-বৈষ্ণবের' কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন। 'বঞ্চক-বৈষ্ণব' তাঁহাকে কিছুতেই অমায়ায় কৃপা করিতে স্বীকৃত ছিলেন না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট তাঁহার সমস্ত বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। 'বঞ্চক-বৈষ্ণব' অকপট কৃপা প্রদানে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমাকে এই ছিন্ন কৌপীন দিতেছি, গ্রহণ কর", ঐ ব্যক্তিটী এই সরলকৃপার কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, বৈষ্ণবের নিকট হইতে বঞ্চিত হইতে, কিন্তু যখন দেখিলেন বঞ্চক-বৈষ্ণব অমায়া প্রদর্শন করিতেছেন তখন তিনি ব্যথিত হইয়া ঐ 'বঞ্চক-বৈষ্ণবকে' শেষ দণ্ডবৎ দিয়া ব্যাধভয়ে ভীত হরিণের ন্যায় কুলিয়ার নূতন চড়ার মধ্য দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন; ভয়ে পশ্চাতে একবারও চাহিয়া দেখিলেন না, পাছে তাঁহার মৃত্যু স্বরূপ ঐ বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন; উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেই ব্যক্তি হুলোর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে

কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন কিনা, দেখিলেন. কেহই নাই। তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রাণ আসিল, তিনি আশ্বস্ত হইলেন, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

আমরাও অনেকেই অনেক সময়ে এইরূপ ভাবে বৈষ্ণবের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া যাই, বৈষ্ণবগণ যতক্ষণ আমাদের নিকট বঞ্চক থাকেন, ততক্ষণই আমাদের প্রিয় ও সম্মান-ভাজন হন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর মহারাজের জীবনে অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও বা আলুর দর, কলার দর বলিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও বা তামাক দিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও উচ্চ আসন ও সম্ভাষণাদির দ্বারা বিদায় দিয়াছেন। ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তি বঞ্চক-বৈষ্ণবের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছেন যে, ঐরূপ সম্মানিত ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদিগকে সম্মানাদি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা নিজেরা না জানি কত বড় ভক্ত, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষাও বড়! কেহ বা মনে করিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিবংশ্য (?) বলিয়াই বোধ হয় আমাকে এইরূপ উচ্চ আসন ও হুঁকাদ্বারা সম্মান দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই আমি তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! তাঁহারা আমার শিষ্যস্থানীয় (?) আমি তাঁহাদের গুরু! এইরূপ কতলোক কতভাবে যে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তিদের জীবনেই দেখা গিয়াছে, যখন ঐ বঞ্চক বৈষ্ণব বঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া অমায়ায় ঐ সকল ব্যক্তিকে কৃপা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তি তাঁহাদের

অঘবকপূতনাসদৃশ বিদ্বেষিস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন যে সকল বঞ্চিত ব্যক্তি 'বঞ্চক-বৈষ্ণবের' আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের 'ভোগা'কেই বৈষ্ণবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারাই ঐ সকল মহাপুরুষের সরল কৃপার কথা গ্রন্থাদিতে পড়িয়া বা তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া ঐ সকল মহাপুরুষের বিরোধ করিতে ত্রুটী করেন নাই। যখনই মহাপুরুষগণ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে ভজন করিবার জন্য ঐরূপ অসৎলোকের সঙ্গ পরিহারার্থ ঐ সকল জগতের আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট বঞ্চক সাজিয়াছেন, তখনই আত্মবঞ্চনাকামিব্যক্তিগণ বঞ্চক-বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের আত্মবঞ্চিত হওয়ার ব্যাপাররূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়কারী বলিয়া 'বৈষ্ণব' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ যেন তাঁহাদেরই অধীনস্থ বস্তু আর তাহারাই যেন বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রদাতা। যখনই বৈষ্ণবগণ অমায়ায় কৃপা করিবার' জন্য তাঁহাদের আচার্য্য-স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন, তখনই বঞ্চিত ব্যক্তিগণের আত্মবঞ্চিত হইবার ইচ্ছারূপ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁহারা বৈষ্ণবের বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এইরূপ মহাভাগবত বঞ্চক-বৈষ্ণবগণের সহিত পূতনা সদৃশ লোকদেখান বৈষ্ণবগণ বা বৈষ্ণবব্রুব কপট ব্যক্তিগণের আচরণ সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য মর্কটের ন্যায় কপট। মর্কট বা বানর যেরূপ লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্য বসনবর্জ্জিত বৈরাগ্যের মূর্ত্তি সাধু সাজিয়া বসে, মহা-

ভাগবত বৈষ্ণবগণ সেইরূপ নহেন। মহাভাগবতগণ অসৎসঙ্গ পরিহারের জন্য এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ঐরূপ বঞ্চকলীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আত্মবঞ্চিত ব্যক্তির নিকট বঞ্চক হইলেও তাঁহাদের অনুগত জনের নিকট অকপট ও সরল।

বৈষ্ণবগণ জগতের বহির্ম্মুখ-লোকের নিকট বঞ্চক হইলেও সজাতীয়াশয় ভক্তের নিকট পরম সরল। বৈষ্ণবের ন্যায় নিষ্কপট, সরল, নির্ম্মৎসর আর কেহ নাই। আমরা যদি নিষ্কপট হই, অন্যাভিলাষ-রহিত হইয়া একমাত্র হরিতোষণের জন্য শ্রীবৈষ্ণবের পাদমূলে উপস্থিত হই' তখন বৈষ্ণব আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিষ্কপট কৃপা করিবেন। কোথায় আমার কপটতা, অনর্থ ও মনোব্যাসঙ্গ আছে, সেইগুলি আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবেন আমিও তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। আমরা যেন বৈষ্ণবের বাহ্যবেশ, বাহ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া না বসি। শ্রীগীতার ভগবদ্বাণী যেন আমাদের স্মরণ থাকে—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

—"আমার অক্ষজ ইন্দ্রিয়ে অনন্যভজনপরায়ণ পুরুষ সুদুরাচারী বলিয়া লক্ষিত হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে, তাঁহার যে চেষ্টা তাহা ঠিকই আছে, তাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা নাই। আমার ভোগচক্ষু তাঁহার সেবাময়ী চেষ্টা দর্শন

করিতে অসমর্থ। সুতরাং আমার করণাপাটবরূপ দোষ দ্বারা বৈষ্ণবকে বিচার করিতে যাইয়া যেন আমি বঞ্চিত না হই।

—:০:—

কৃপা কি চাই ?

আমি বঞ্চিত হইয়া মনে করি, আমি সাধু গুরুর কৃপার প্রার্থী; সাধু গুরুর কাছে কপটতা করিয়া বলিয়া থাকি,—"আমাকে কৃপা করুন", "আমাকে রক্ষা করুন্", "আমাকে শান্তি প্রদান করুন্।" কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই, সুরক্ষিত হইতে চাই, শাশ্বতী শান্তি চাই ?

আমি মনে করি, আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই, আমার দিকে আমি ষোল আনা ঠিক আছি; কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবভগবানের কৃপা বিতরণের শক্তির অভাব! আমি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ত,' গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কৃপা দিলে আমি কি সত্য সত্য গ্রহণ করিব ?

সাধু-গুরুর কাছে কৃতাঞ্জলির অভিনয় করিয়া কৃপা-যাচ্ঞা করি, কোন সময়ে বৈষ্ণবগণকে বলিয়া থাকি'— আপনাদের কৃপা হইলেই সব হয়, আপনারা কৃপা করুন। প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গুরুদেবের কাণে পৌঁছায়—এইরূপ কৌশলে বলিয়া থাকি,— "গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্"। সাধু-গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া

এখনও বলি,—কই, আমার উপর ত' আপনাদের কৃপা হইতেছে না; কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি কৃপা লইতে প্রস্তুত ? সত্য সত্যই কি আমি কৃপা চাই, রক্ষা চাই, নিত্যানন্দ চাই ?

বঞ্চক মন এই কথার উত্তর দিতে পারে না। অমুক্ত ব্যক্তি-গণের সঙ্গে যতদিন থাকি, ততদিন এই কথার উত্তর পাই না, কোন কালেই পাইতে পারিব না। মনে করি, আমি কৃপা চাই—মনে করি—আমি ভক্ত হইতে চাই; কিন্তু চাই আর কিছু। ভগবান্ সেই কপটতা ধরাইয়া দেন, আমার কাছে বিপদ আপদ আনিয়া প্রমাণিত করিয়া দেন, সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে চাই কি না—গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কৃপা চাই কি না? বিপদ আপদগুলি সব ভগবানের কৃপা – ইহা বিপদ-আপদে পতিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যকালে পরম কৃপা হইতে দূরে সরিয়া আপাদ-দৃষ্টিতে সম্পদ্, পরিণামে মহাবিপদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই।

মুক্তগণের সঙ্গে আমি কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি যে, গুরুদেবের কৃপা-কাদম্বিনী অবিশ্রান্ত-ধারায় বর্ষিত হইবার জন্য আমার মস্তকোপরি অনুকূল বায়ুর সহিত লম্বমান রহিয়াছে—যাহাকে আমি প্রতিকূল বায়ু মনে করিতেছি, তাহাও বস্তুতঃ পরম অনুকূলরূপেই ঐ গুরু-কৃপা- কাদম্বিনীকে আমার উপর বর্ষিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি কি ঐ সঞ্জীবনী-ধারা চাই ? না, ঐ কৃপা ধারা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অন্ধকূপ, বিবর প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ ও নানাপ্রকার ইতর চেষ্টার ওয়াটার প্রুফ

(Water proof) গায়ে জড়াইয়া থাকি? আমি নিত্যানন্দ-পদ-ছত্রের আশ্রয় আদৌ চাই না। যখন কিঞ্চিৎও সেবোন্মুখ থাকি, তখন কিন্তু প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি—নিয়ত অনুভব করিতে পারি' আমার উপর গুরু-বৈষ্ণবের-কৃপা—গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ-দৃষ্টি এত প্রচুর, এত তীক্ষ্ণ যে, উহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেও আমি এত বড় হইতে পারি, তুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাম্য পদার্থগুলিও তখন আমাকে লোভ ধরাইতে পারে না।

আমি কৃপা-সুধা-সঞ্জীবনী-ধারা হইতে পলাইয়া ভীষণ অগ্নি-জ্বালাময় অন্ধকূপে—আবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরে লুকাইয়া থাকিতে চাহিলে সেখানেও অগ্নিনির্ব্বাপণকারী গুরু-কৃপা প্রস্রবণ-দ্রুত-গতিতে দমকলের ন্যায় উপস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চান; কিন্তু আমি কি তখনও ঐ জ্বালাময় অগ্নিপিঞ্জরের তুয়ারটী খুলিয়া দিতে চাই? না, তালার উপর তালা প্রদান করিয়া নিজের ইচ্ছায় নিজে আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাই? সাধু গুরু ঐ তালা ভাঙ্গিয়া কৃপা প্রসাদ দিতে উদ্যত হইলেও আমি শতমুখে তাহার বাধা দিয়া থাকি।

এমন এক গোলোকের দূত—এমন এক সর্ব্বাশ্রয়—এমন এক কৃপাঘন—এমন এক জগদ্গুরুর বাণী শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে—'মুহূর্ত্ত' বলিলেও যেন অনেক পরিমাণ কালের কথা বলা হইয়া যায়, সদ্য সদ্য মহাধন—যাহা যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাদি দেবতাও পান নাই, অধিক কি,

গৌর হরিও সহজে তাহা প্রদান করিলেও অনেকে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই সুহৃল্লভনিধি অ-মায়ায় দিতে প্রস্তুত। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে এত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে প্রস্তুত —অনন্ত জীবনের জন্য এত বড় সম্পত্তি হাতে হাতে দিতে প্রস্তুত, অসংখ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্মের মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব তাহার কোট্যংশের এক অংশও কোন দিন দিতে পারেন না, পারিবেন না, পারিতেছেন না—পারিতে পারেন না। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণপাদপদ্ম-পরশমণির নিত্য অধিকারী করিতে প্রস্তুত—যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে 'মহাভাগবত' করিতে প্রস্তুত, আমি কি সত্য সত্যই সেই ধনের অধিকারী হইতে চাই?—সেই পরশমণি চাই?—মহাভাগবত হইতে চাই?

মুখে বলি আমি চাই, সখ করিয়া কখনও কখনও চাই। কিন্তু আমার কৃপা চাওয়া সেই উপকথার বুড়ীর মত। এক বুড়ী রোজ বনে কাঠ আহরণ করিতে যাইত, সংসারের জ্বালায় সে আটভাজা হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার আর কেহ ছিল না; নিজে নিজেই অত্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে উদরাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিত। এইরূপ কষ্টে কাতর হইয়া প্রত্যহই বলিত'—যম সকলকে কৃপা করে, আর আমাকে দেখিতে পায় না! বুড়ী একদিন বনের মধ্যে অনেক কাঠ সংগ্রহ করিয়া মাথায় উঠাইয়াছে, এমন সময় যমদেবতা আসিয়া উপস্থিত; যম বুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,- তুমি রোজ আমাকে ডাক, আমার কৃপা চাও, আমার দৃষ্টি তোমার প্রতি নাই বলিয়া তুমি কত ওলাহন দাও, আজ তোমাকে আমি

লইতে আসিয়াছি। বুড়ী তখন মাথার উপর কাঠের বোঝা উঠাইয়াছে। যম সত্য-সত্যই আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ত' বুড়ী অবাক! যমকে দেখিয়া বুড়ী বলিতে লাগিল,—যম, তুমি সত্য সত্যই আসিয়া পড়িবে, আর সত্য সত্যই কৃপা দিবে জানিলে আমি কিছুতেই তোমাকে ডাকিতাম না—তোমার কৃপা চাহিতাম না। জগতের জ্বালা পোড়া সহ্য করিতে না পারিয়া একটা মুখের কথা বলিতে হয় বলিয়াছি, এইরূপ ত' সকলেই বলিয়া থাকে। তুমি ফিরিয়া যাও, আমি আরও বাঁচিয়া থাকিতে চাই। তখন যম বলিলেন;—তুমি যখন আমার কৃপা চাহিয়াছ, তখন আর তোমাকে ছাড়াছাড়ি নাই, আমাকে ডাকিলে কেন? তখন বুড়ী বেগতিক দেখিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি আগে আমার হাতের কাজটুকু সারিয়া লই, আমার খড়ো ঘরে এই কুড়ানো কাঠগুলি রাখিয়া আসি, মরিতে হয়, না হয় তার পরে মরিব।

আমাদের কৃপা চাওয়াও ঐ বুড়ীরই মত। সংসারের তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া সময় সময় মুখে বলিয়া থাকি, 'আমি কৃপা চাই, কৃপা চাই'; কিন্তু কৃপা-বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে নিকটে অট্টালিকা না থাকে, অন্ততঃ পশুপক্ষীর বিবরে যাইয়াও কৃপা-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হই না। কৃপা স্বয়ং আসিলে তখন ঐ বুড়ীরই মত কৃপাকে এড়াইবার চেষ্টা করি—কৃপা নাছোড়বান্দা হইলে ঐ বুড়ীরই মত বলিয়া থাকি, অন্ততঃ ভোগের ইন্ধনের আহৃত বোঝাটী ভাঙ্গা-কুটীরে রাখিয়া আসি।

আমরা কি স্বেচ্ছায় কখনও সত্য সত্য কৃপা চাই?—কখনই

না। পেয়াদার গলা ধাক্কা না পাওয়া পর্য্যন্ত মুখেও কৃপাটুকু চাই না, সর্ব্বদা পাশ কাটাইয়া চলি, পাছে পেয়াদার সঙ্গে দেখা হয়—গলাধাক্কার চোটে কৃপা চাহিতে হয়। সংসারে আমাদের জীবনে যে সকল বিপাক আসে, সেইগুলিই পেয়াদার গলাধাক্কা। সেই-গুলি আমাদিগকে কৃপা-প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে; কারণ পশু-নীতি ছাড়া আমার ন্যায় অশান্ত ব্যক্তিকে কিছু-তেই কৃপার প্রার্থী করান' যায় না। পেয়াদার গলা ধাক্কারূপ সাংসারিক অভাব-অসুবিধা, আপদ-বিপদে জর্জ্জরিত না হইলে—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়ে অর্থনাশ প্রভৃতি জগতে অসংখ্য প্রকারের ত্রিতাপরূপ পেয়াদার গলাধাক্কাগুলি না থাকিলে আমার মত মদমত্ত জানোয়ার কোন দিনই অনুগত হইত না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িত না—বড়'র কাছে শরণাগত হইবার মূল্য বুঝিত না। কিন্তু এই পেয়াদার গলাধাক্কাগুলিকে কি আমরা কৃপা মনে করি? না আমাদের উপর অন্যায় অবিচার মনে করি? যদি প্রকৃত কৃপা চাহিতাম, তবে ত' ঐগুলিকে ভগবানের পরম অনুকম্পা জানিয়া ভগবানেই শরণাগত হইতাম। তাই, বলিতে-ছিলাম, আমি কি কৃপা চাই?

আমার কৃপা চাওয়া কপটতা। আমার গুরুদেব আমাকে অনেকবার জানাইয়াছেন। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, একবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের নিকট বঙ্গ-দেশের কোন এক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ কৃপা-যাচ্ঞা করায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সেই মহারাজকে তাঁহার

সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার (শ্রীগৌরকিশোরের) সমীপে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে একটী পৃথক্ ছৈ-এর ভিতর বাস করিতে বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোন চিন্তা করিতে হইবে না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুই ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তিনি কেবল নিশ্চিন্তমনে ভজন করিবেন। বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহাকে (রাজাকে) সত্য সত্য কৃপা দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যমদেব সাক্ষাৎ কৃপা করিতে আসিলে বুড়ীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, উক্ত কৃপাপ্রার্থীরও সেই অবস্থা হইল। তখন তাঁহার কৃপা চাওয়া ঘুচিয়া গেল। ঐরূপ কৃপার হস্ত হইতে কোন প্রকারে এড়াইয়া বিষয়বিবরে এবং যে সকল ভক্ত নামধারী বঞ্চক ব্যক্তি কৃপার নামে বঞ্চনায় প্রবীণ, আর তাঁহাদের ন্যায় অপরকেও অগ্নিজ্বালাময় লৌহ-পিঞ্জরে টানিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে পটু, সেই সকল ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকটও কোন এক ব্যক্তি কৃপার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় বাবাজী মহারাজ তাহাকে এক খণ্ড ছিন্ন কৌপীন দেখাইয়া বলিলেন,—'এই নাও কৃপা'। তখন কৃপাপ্রার্থী বেগতিক দেখিয়া নিজের চশমা ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নৌকায় উঠিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন। সাক্ষাৎ কৃপালাভ পরিত্যাগ করিয়া আমারই ন্যায় উত্তাল-তরঙ্গায়িত ভব-সাগরের তীরে সমূহ-বিপদের নৌকার নবীন যাত্রী হইল।

আমার কৃপা চাওয়া অর্থ—আমি যেরূপ আছি, আমার

মনোধর্ম্ম আমার কাণে যে মন্ত্র দিয়াছে, সাধুর দ্বারা তাহার সমর্থন করাইয়া লইয়া নিজে সন্তুষ্ট থাকা—যে সকল কুপথ্যের প্রতি আমার রুচি, সেই কুপথ্যগুলিকে চিকিৎসকের দ্বারা সুপথ্য বলিয়া অনুমোদন করাইয়া লওয়া—আমি যে তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই থাকিবার বা তাহা হইতেও অধিকতর তিমিরে প্রবিষ্ট হইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পত্র পাইবার বাসনা। কিন্তু সদ্বৈদ্য ত' আমার রুচি অনুসারে কুপথ্য অনুমোদন করিয়া আমায় হিংসা করিবেন না। তিনি যে সর্ব্বদা আমাকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত—তাঁহার প্রাণ যে আমার দুঃখে ব্যাকুল—আমার দুঃখে যে তাঁহার নিয়ত অশ্রুধারা বিগলিত হয়।

কৃপাবতার প্রভু আমায় অসংখ্যবার বলিয়াছেন,—'আমি ত' এত নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, আমার কৃষ্ণের ভোগের বস্তু সমূহকে আমি আমার কৃষ্ণসেবানিপুণা দৃষ্টির অন্তরালে রাখিব। কারণ, কৃষ্ণ-নৈবেদ্য দুষ্টলোকের দৃষ্টিতে পতিত হইলে তাহা আর কৃষ্ণের ভোগে লাগিবে না। গুরুদেব যাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, কৃপা করেন, তাহাকেই ত' সামনে রাখেন, চোখের আড়ালে যাইতে দেখিলে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যায়। কিন্তু উল্টো বুঝার লোক আমি, আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাকে—স্নেহ-প্রাচুর্য্যকে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা মনে করি। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই ?

গুরুদেব বহুবার জানাইয়াছেন যে, মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের জন্য তৈয়ারী করিতে হইলে ২০০

গ্যালন চিদ্‌রক্ত ব্যয় করিতে হয়। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও গুরুদেব কৃপা করিতে চান, তথাপি আমার মঙ্গল হউক্। আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রয়াস, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বর্ষিত; আর আমি এত বড় হৈতুক যে, সেই কৃপাকে—সেই অজস্রধারে অনুক্ষণ বর্ষিত কৃপাবারিকে পা' দিয়া ঠেলিয়া দিবার পাষণ্ডতা ও দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি। অকৃতজ্ঞ চামার আমি, আত্মবঞ্চক আমি, আত্মঘাতী আমি, কৃপাকে 'কৃপা' বুঝি না—বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না।

গুরুদেব আমাকে বলিয়াছেন,—মানুষের কাপড়ে যদি হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়, তখন বুদ্ধিমান লোক কি করেন? তখন তিনি লোক-লজ্জা করেন না, হাতে যে কাজ করিতেছিলেন, সেই কাজগুলি করিতেও ব্যস্ত হন না; সব ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাজ পড়িয়া যায়, আগুন হইতে নিস্তার পাওয়া। আমার কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, গুরুদেব কৃপাবারি লইয়া সমুপস্থিত, কিন্তু আমি কি করিতেছি? বলিতেছি,—কাপড়ের আগুন পরে নিভাইব। প্রথমে অন্যান্য কার্য্যগুলি শেষ করিয়া লই। কিন্তু আগুন কি তাহা মানিবে? আমাকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আমার প্রতি হিংসকগণ, দস্যুগণ, 'আমি পুড়িয়া মরি বা যাহাই হই না কেন, তাহা তাহারা দেখে না; কিন্তু আমার দুঃখে প্রকৃত দুঃখী যাঁহারা, সেই গুরু-বৈষ্ণবাদি স্বজনগণ আমাকে আগের কাজটা আগে করিতে বলেন; আমি কিন্তু সেই কৃপা চাই না। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই?

—:*:—

প্রতিষ্ঠাশা

মনুষ্যমাত্রেই অথবা জীবমাত্রেই প্রতিষ্ঠা চাহেন। যিনি বা যাঁহারা প্রতিষ্ঠা চাহেন না বলেন, তিনি বা তাঁহারা অসত্য বা অস্বাভাবিক কথা বলেন। প্রতিষ্ঠাই—স্বাভাবিক অবস্থান, অপ্রতিষ্ঠা—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

মানুষ প্রতিষ্ঠাকে পরম প্রয়োজন জানিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়ন করিতেও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন না। প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য তাঁহারা কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগ-বীর, তপোবীর, ব্রতবীর সাজিয়া থাকেন—প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য নিজ প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন—অনশনব্রত, প্রায়োপ-বেশন প্রভৃতি দ্বারা তিলে তিলে জীবন-বিসর্জ্জনের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, কখনও বা বিপুল প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের আশায় কারা বরণ করেন, দেহ-গেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করেন; মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, দেশ, সমাজ, এমন কি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থ-পরিত্যাগেও বিচলিত হন না। প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির প্ররোচনা প্রবল বায়ুবেগের ন্যায় মানুষের হৃদয়ের আশাকোষে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের এমন অসাধ্য কার্য্য নাই—এমন লোক-বিস্ময়কর ত্যাগ, বৈরাগ্যের আদর্শ নাই, যাহা না করাইয়া থাকে।

কনক-কামিনী না হইলে মানুষ বরং জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা না হইলে মানুষ এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ

করিতে পারে না। অনেক যোগী-তপস্বী বনে, জঙ্গলে, হিমালয়ের গহ্বরে বায়ুভক্ষণ বা পত্রপুষ্প-ভক্ষণের দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্থূল কনকস্পর্শের আবশ্যকতা হয় না, তাঁহাদের অনেকেও স্থূল কামিনীও স্পর্শ করেন না, কিন্তু এই সময়েও তাঁহাদের অস্তিত্ব-সংরক্ষণের একমাত্র অবলম্বন হয়—প্রতিষ্ঠাশা। কনক-কামিনীর পিপাসা প্রতিষ্ঠা-পানীয়ের প্রতিনিধিত্বে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশার পিপাসা কেবল কনক-কামিনীদ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না। প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার উত্তেজনা ও মাদকতা স্থূল কনক-কামিনীর প্রয়োজনীয়তা-বোধকেও অনেক সময় ভুলাইয়া রাখিতে পারে।

যাঁহারা বলেন, আমরা প্রতিষ্ঠা চাহি না—সূক্ষ্ম বিচারের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা না চাওয়ারূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন-প্রচার-দ্বারা অধিকতর প্রতিষ্ঠাই চাহেন। কেহ কেহ প্রতিষ্ঠার ভয়ে উচ্চ কীর্ত্তন করেন না, হরিকথা-প্রচারের পক্ষপাতী হন না, নির্জ্জনে ধ্যান, জপ, স্মরণ-মননের অভিনয় করেন, কেহ বা সম্পূর্ণ মৌন থাকিয়া প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির ভয় হইতে আপনাকে সংরক্ষিত বিচার করেন। কেহ কেহ আবার ধাতুপাত্র স্পর্শ করেন না, মুদ্রা স্পর্শ করেন না, টিকেট কিনিবার কালে অর্থাদি স্পর্শ করিতে হইবে ভয়ে রেলে, ষ্টিমারে উঠেন না ইত্যাদি! প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত এবং প্রতিষ্ঠার আশা হইতে পরিমুক্ত অভিমানকারী এই সকল লোকের আচরণগুলি শ্রীরূপশিক্ষার রাসায়নিক বিশ্লেষণাগারে বিশ্লিষ্ট হইলে দেখা যায়, ঐসকল ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির ভয়

অপেক্ষা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার সামান্য পুঁজিটুকু পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়েই তাঁহারা অধিকতর ভীত হইয়া ঐসকল বাহ্য আচরণের কপট বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকেন। প্রবাদ বলে,—'তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।' প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত-পরিচরাকাঙ্ক্ষ কীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী মৌনব্রতধারিগণের অন্তরের অন্তঃস্থল অন্তর্ভেদী শ্রীরূপশিক্ষালোকের দ্বারা দর্শন করিলে তাঁহাদের অন্তরে ঐরূপ প্রবাদেরই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত দেখা যাইবে। পাছে কিছু প্রচার করিলে আমার অজ্ঞতা ও মূর্খতা ধরা পড়িয়া যায়, সেইজন্য অনেক সময় আমরা মৌনব্রতী সাজিয়া থাকি, পাছে হরিকথা প্রচার করিলে আমার আচরণের অন্যায় ও অসামঞ্জস্যগুলি লোকে ধরিয়া দেয় এবং তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, এইজন্য আমরা অনেক সময় প্রচারক হওয়া অপেক্ষা নির্জ্জন-ভজনকারীর প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-বরণ করাকে ভাল মনে করি। ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করিবার প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন আমি নিজে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রচার না করিলেও আমার কোন শিষ্য বা অনুগত ব্যক্তি উহা কোন না কোন উপায়ে লোকের নিকট প্রচার করিয়া দিবে অন্তরে জানিয়া আমি নিজে নীরব, নিথর ও নিরপেক্ষের বাহ্য প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠাই সংগ্রহ করি। সুতরাং স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে আমরা সকলেই প্রতিষ্ঠা চাই। যাহারা মুখে সরলভাবে প্রতিষ্ঠা চাই বলে, তাহারা ত' চায়-ই, আর যাহারা অসরলভাবে মুখে প্রতিষ্ঠা চায় না বলে, তাহারাও 'দ্রাবিড়-প্রাণায়াম'-ন্যায়ে আরও অধিকতর প্রতিষ্ঠাই চায়। অতএব

প্রতিষ্ঠা চাওয়াই আমাদের স্বভাব, না চাওয়া কথাটী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, অসত্য ও অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম, শ্রীরূপের ধর্ম্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম স্বাভাবিকতা, সত্য ও সরলতায় প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা রূপশিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত, তাঁহারা স্বভাব, সত্য ও সরলতারই উপাসক। তাঁহারা দেখেন, কোন্ প্রতিষ্ঠাটী—প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। 'প্রতি' পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতু ভাবে 'ঙ' করিয়া 'প্রতিষ্ঠা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'স্থা' ধাতুর অর্থ—অবস্থান, স্থিতি। কোন্ জিনিষ বা কাহার জিনিষে আমাদের স্থিতি পূর্ণ দায়িত্ব লাভ করিতে পারে? জন্ম-ভঙ্গের দেশে, জন্মভঙ্গের কালে ও জন্ম-ভঙ্গের পাত্রে যে স্থিতি, তাহা নিত্য স্থিতি নহে; সাময়িক স্থিতি মাত্র। সকল স্থিতি-শক্তি বা সত্তা-শক্তি, যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় 'সন্ধিনীশক্তি' বলা হয়, তাহার মালিক বা শক্তিমদ্‌বিগ্রহ কে? সেই মূল পুরুষের অনুসন্ধান করা হউক। অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায়, শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দই নিখিল স্থিতি-শক্তির পূর্ণ মালিক। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে সকল সত্তা নিঃসৃত হইয়াছে। যাবতীয় প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক—একমাত্র নিত্যানন্দ-রায়। সেই নিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ই জীবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ কৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি জগদ্‌গুরুর শ্রীচরণে আশ্রিত, তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত—তাঁহারাই প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠার উত্তরাধিকারী।

যাবতীয় প্রতিষ্ঠা আমার গুরুদেবের সম্মুখেই নিত্যকাল প্রতীক্ষা করেন। আমার গুরুদেবের মত আর প্রতিষ্ঠা-সম্পত্তি

জগতে কাহারও থাকিতে পারে না—কেহ তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতে পারে না ; প্রতিযোগিতা করিলে তাহার 'অপ্রতিষ্ঠা' বা 'পতন' অনিবার্য্য। নিখিল জগৎ সেবোন্মুখ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমার গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার আরতি করিলেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। তখন তাঁহারা জানিতে পারেন, 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' অভিমানই তাঁহাদের নিত্য প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার পতাকা প্রচার করাই—বার্ষভানবীর প্রতিষ্ঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করানই প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা।

অস্থায়ী স্থান-কাল-পাত্রের প্রতিষ্ঠা– প্রতিষ্ঠা নহে ; উহা—অপ্রতিষ্ঠা বা পতন। ভোগী প্রতিষ্ঠার মোহে প্রলুব্ধ হইয়া যতই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর সাজুন না কেন, আর ত্যাগী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী-ভয়ে ভীত হইয়া হিমালয়-গহ্বরে লুক্কায়িত হউন না কেন, তাঁহারা পতনোন্মুখ ; কিন্তু যাঁহারা নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠা-পতাকার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহারা গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস অভিমান প্রবল করিতে পারিয়াছেন, নিখিল প্রতিষ্ঠা তাঁহাদেরই, তাঁহারা পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির বা অপ্রাপ্তির ভয়ে ভীত নহেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মেই প্রতিষ্ঠার পাতিব্রত্য রক্ষিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলে প্রতিষ্ঠা-সতীর আনুকরণিক প্রতিযোগিনী 'ধৃষ্টা শ্বপচরমণী' শৌকর-বিষ্ঠাতুল্যা জড় প্রতিষ্ঠা বহুরূপিণী হইয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐ বহুরূপিণীর ব্যভিচারের কথা আলোচনা-

মুখে তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের বাণী আবৃত্তি করিব।

—০—

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-কার্য্যটি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যেইরূপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। সাধক ভক্ত জীবনে প্রবেশ-লাভ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে দুঃসঙ্গ-পরিহার ততোঽধিক প্রয়োজনীয়। সাধন ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। ভাগ্যবান জীব পূর্ব্বসুকৃতি-ক্রমে সাধু-শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে দৃঢ়-বিশ্বাসযুক্ত হন এবং প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে সাধুর আদেশ ও উপদেশ-সমূহ আপন জীবনে পালন করিতে থাকেন। এই ভজনক্রিয়ার ফলে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া নিরন্তর শ্রীনামানুশীলনে আগ্রহ বা নিষ্ঠা হইয়া থাকে। উহাই সাধনভক্তির প্রথম প্রকাশ। সাধুসঙ্গ নিখিল-কল্যাণ-লাভের একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গই অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করিয়া ভক্তিরাজ্যের উত্তরোত্তর উন্নত-সোপানে উপনীত

করে। ভক্তজীবনের সকল অবস্থাতেই সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে কাম্য।

সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হইলে অসাধুসঙ্গ পরিহারের আবশ্যকতাও আমাদের চিন্তার বিষয় হয়। ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হইলে. সাধুর কৃপা লাভ করিতে হইলে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন সর্ব্ব প্রথমেই করিতে হইবে, নতুবা মঙ্গলের আশা করা বৃথা। আমরা বর্ত্তমানে দুঃসঙ্গের পঙ্কে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া আছি। আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষা, সংস্কার, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল, অনাদি কর্ম্মবাসনা সমস্তই অসৎ। সকলের উপরে আমাদের পরিচালক মন সর্ব্বাপেক্ষা অসৎ এবং সেই মনের সঙ্গ অত্যন্ত অনিষ্টকর। আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টাদ্বারা আমরা এই দুঃসঙ্গের দৃঢ় শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি না সত্য, তথাপি দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের আমাদের নিষ্কপট অভিলাষ এবং চেষ্টা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের যদি সত্য সত্যই দুঃসঙ্গ পরি-ত্যাগের জন্য ব্যাকুলতা জাগে, তাহা হইলে অন্তর্য্যামি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব আমাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাদিগকে দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনে সামর্থ্যদান করিয়া থাকেন। দুঃসঙ্গ-ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত বা সাধুসেবার যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, উহা পরিণামে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিতই হইয়া থাকে। সেই জন্য সাধু ও শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের অত্যাবশ্যকতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শেষ (প্রকাশিত) বক্তৃতায় জানাইয়াছেন – শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তাহা জানিতে হইলে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ সর্ব্বপ্রথমেই করা আবশ্যক। চৈতন্যবিমুখ সকলের সঙ্গই পরিত্যাগ করিতে হইবে, বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহারা যত অন্তরঙ্গ আপনজনই হউন না কেন। চৈতন্যবিমুখ যাবতীয় ব্যক্তির সঙ্গই দুঃসঙ্গ, উহারা কৃমিজাতীয়। ঐ গুলির সংস্পর্শ থাকা পর্য্যন্ত আত্মার পুষ্টিকর খাদ্যরূপে আমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিব, তাহাতে আত্মশরীর পুষ্ট না হইয়া কৃমির শরীরই পুষ্ট হইবে। দুঃসঙ্গ বজায় রাখিয়া আত্মমঙ্গললাভের জন্য যাহা কিছু করা যাইবে, তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আত্মমঙ্গল কিছুই হইবে না, বরং কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, বাসনা প্রভৃতি উপশাখাই বাড়িয়া যাইতে থাকিবে।

আমাদের যত কিছু দুর্ব্বলতা, লোকপ্রিয়তা, কৃষ্ণেতর-বাসনা, শৈথিল্য, ভক্তিপথে প্রগতির প্রতিকূলে আসিয়া দাঁড়ায়, যদি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব, উহার মূলে আছে দুঃসঙ্গ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশে আমরা জানিতে পারিয়াছি—প্রতি হরিবাসর-দিবসে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, গতপক্ষের মধ্যে আমাদের ভজনোন্নতি কতটুকু হইয়াছে। যদি দেখা যায়, উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে একমাত্র দুঃসঙ্গকেই উহার কারণ জানিয়া তাহা পরিহার করিবার যত্ন করা উচিত। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে ঐকান্তিক-চেষ্টা আসিলেই যাবতীয় অনর্থরাশি আপনা হইতেই দূরীভূত হইতে থাকে।

আমরা অনেকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশ্বাসময়ী বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করি। সাধ্যমত তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে চলিতে চেষ্টাও করিয়া থাকি। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন লাভালাভের হিসাব করিতে যাই, তখন দেখি জমার ঘরে শূন্য পড়িয়াছে। অথচ আমরা সকলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখ-বিগলিত বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত হইয়াই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। তাঁহারা যেরূপ আদেশ বা উপদেশ করেন, তাহা পালন করিবার সদিচ্ছা এবং চেষ্টা, মহাজন প্রদর্শিত পথে তাঁহাদের অনুগমনে অগ্রসর হইবার আশা যে আমাদের একেবারেই নাই, তাহাও নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট যখন আসিয়াছিলাম, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে জাগতিক সুখ-সুবিধা যতটা পারি আদায় করিয়া লইব, তাঁহাদিগকে হাতের পুতুল করিয়া মজা লুটিব—এইরূপ দুরভিসন্ধিও ত' আমাদের ছিল না, অথবা তাঁহাদের ছিল না, অথবা তাঁহাদের উপদেশ শুনিবই না, তাঁহাদের নির্দ্দেশমত চলিবই না, তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণই করিব, কেবল কপটতা এবং অপরাধই করিব, এইরূপ কিছু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়াও আমরা আসি নাই। আমাদের বহু প্রচ্ছন্ন দোষ ছিল এবং আছে সত্য, কিন্তু সেই দোষমুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা যে তখন ছিল না বা এখনও নাই—এইরূপ নহে। তথাপি কেন আমরা আশানুরূপ ফল পাই না? হৃদয়ে উৎসাহ আসে না, ইষ্টলাভে সুদৃঢ় নিশ্চয় করিতে পারি না, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ি? সাধুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে যখন আসি, তখন তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী কর্ণে প্রবেশ করিয়া সেই

সময়ের জন্য হৃদয়ে যেন চেতনার সঞ্চার করে। আমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি—"আর নারে বাপ"। যাহা করিয়াছি, আর করিব না। এখন হইতে সাধুর অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব। হয়ত' আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু ফল কিছু হয় না। চেষ্টাও সাময়িক, বেশীক্ষণ প্রতিজ্ঞা-রক্ষা করিয়া চলিতে পারি না। সাধুগণের শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং বিচারণরূপ বৃত্তির অনুগমন করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। আমরা অনেকেই বহুবার এইরূপ সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু কোনবারই সেই সঙ্কল্প স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, সুদৃঢ় পাষাণের রেখার ন্যায় চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। "সতো বৃত্তিঃ" অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া আমরা অবশেষে অসদ্‌বৃত্তিকেই বহুমানন করিতে থাকি। সাধুর কৃপায় ও শক্তিতে অনাস্থাযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার অপরাধের আবাহন করিতে থাকি।

এই সকলের একমাত্র কারণ দুঃসঙ্গ। সদ্‌বৃত্তি বলিতে সাধুর অনুসরণকেই বুঝায়। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিয়া, দুঃসঙ্গ পুষিয়া রাখিয়া সাধুসঙ্গ হয় না, সাধুর অনুগমন হয় না। অসৎসঙ্গ আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তজ্জন্য আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাহা কিছু সমস্তই সছিদ্রপাত্রে জল আহরণের প্রয়াসের ন্যায় বিফল হইতেছে মাত্র। ইহা সত্য যে, সাধুসঙ্গ-ব্যতীত দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে যায় না। বিষয় হইতে মনকে জোর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেও করা যায় না, কারণ জড়াভি-নিবিষ্ট মনের স্বভাবই বিষয় গ্রহণ করা। স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ পরিহার-

পূর্ব্বক নির্জ্জনে গিয়া বাস করিলেও নির্জন বা নিঃসঙ্গ হওয়া যায় না। বিষয়োন্মুখ মন বনে গিয়াও বিষয় চিন্তা করিবে। সাধুসঙ্গ হইতেই হেয় দুঃসঙ্গের পরিহার হয়। সাধুর সঙ্গ-ব্যতীত অসাধু-সঙ্গের প্রভাবনির্ম্মুক্ত হওয়া যায় না, ইহা সমস্ত সংশাস্ত্র এবং মহাজনগণ বলিয়াছেন। কিন্তু সাধুসঙ্গ হইবে কি করিয়া? জগাই মাধাই "আর নারে বাপ" বলিয়া যখন সকল-প্রকার দুষ্কার্য্য: দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন, তখনই তাঁহারা শ্রীনিত্যা-নন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গমহিমা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গস্পর্শ (?) করিয়াও তাঁহাদের হৃদয় কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। অবশ্য এই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিও সাধুগণের কৃপাফলেই হইয়া থাকে। শ্রীনিত্যানন্দের অভূতপূর্ব্বা উদারতা দস্যুগণের হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়াছিল। আমরা কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণার প্রকাশ সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়াও দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। এইখানেই আমাদের দুর্দ্দৈব। একে ভবরোগী আমরা সর্ব্বদা রোগতাপে ক্লিষ্ট, তাহার উপর সর্ব্বদা কুপথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তুলিতেছি। রোগমুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়ত আমাদের আছে, কিন্তু কুপথ্যটী কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ঔষধ সেইখানে কার্য্যকর হইবে কেন?

দুঃসঙ্গ বস্তুটী ঠিক আগুনের মত। আগুন এমনই একটী জিনিষ, যাহার সহিত জগতের অন্য কোন বস্তুই তাহার অস্তিত্ব

সংরক্ষণ করিয়া মিলিত হইতে পারে না। আগুন উহাকে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিবে। জল ঢালিলে আগুন নিভিয়া যাইবে, কিন্তু জলে আগুনে মিশিয়া আর একটা পদার্থ হইবে না। অসৎসঙ্গের এমনই প্রভাব যে উহা অত্যন্ত সমর্থ ব্যক্তিরও বুদ্ধিনাশ করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য সর্ব্বদা উহা হইতে দূরে থাকাই নিঃশ্রেয়-সার্থীর কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীগুরুদেবের বলে অত্যন্ত বলীয়ান্ হইয়া গিয়াছি, আমরা অসদ্ব্যক্তির সহিত ব্যবহারাদি করিলেও আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না, ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় আমরা স্বয়ং নির্ব্বিকার থাকিয়া অন্যকে উদ্ধার করিয়া দিতে পারি, এইরূপ অহঙ্কার আমাদের অত্যন্ত শোচনীয় অধঃপতনেরই পূর্ব্বাভাস। সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপাদ এইরূপ মনোবৃত্তির কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। আমাদের ন্যায় সতত স্খলিতপদ, অনর্থ-যুক্ত ক্ষুদ্র জীবের ত' কা কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীভগবান আচার্য্য তাঁহার ভ্রাতার নিকট বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবিচারপর ভাষ্য শ্রবণ করাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু তাহাতে সম্মত হন নাই। কারণ—

"বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণপ্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥"

ভগবান্ আচার্য্য এ বিষয়ে নির্ব্বন্ধ করিলেও শ্রীল স্বরূপ

দামোদর গোস্বামী প্রভু কিছুতেই মায়াবাদীর ভাষ্য-শ্রবণে স্বীকৃত হন নাই। বঙ্গদেশীয় কবিকে 'যদ্বা তদ্বা' কবি এবং তাঁহার কাব্যে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী কেবলমাত্র তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই তাঁহার নাটক শ্রবণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মায়াবাদীকে অসম্ভাষ্য জ্ঞানে ভগবান্ আচার্য্যের ভ্রাতা গোপালের নিকট ভাষ্য শ্রবণ করেন নাই। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট যখন রামচন্দ্র খানের প্রেরিত বেশ্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে পাপের প্রতিমূর্ত্তি জানিয়াও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাহার উপস্থিতিতে সেই স্থান ত্যাগ করেন নাই, পরন্তু তাহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে তিন রাত্রি হরিনাম শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু হরিনদী গ্রামের গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণব্রুব যখন শ্রীনামের মহিমা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিল, তখন শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তাহাকে শোধন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, তিনি স্বয়ং সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ; কারণ সেই ব্যক্তি নামাপরাধী, নামে তাহার শ্রদ্ধা নাই। প্রাকৃত সহজিয়া হইতে মায়াবাদী এবং মায়াবাদী হইতেও বৈষ্ণবাপরাধী অধিকতর নিন্দিত ও অপরাধী। বৈষ্ণব মহাজনগণ কখনও জীব উদ্ধারকামনায়ও মায়াবাদী বা বিষ্ণুবৈষ্ণব-অপরাধী ব্যক্তির সহিত ব্যবহারাদি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। মায়াবাদী বা বিষ্ণুবৈষ্ণব-দ্বেষীর নিকট তাঁহারা চিরদিনই মৌন। সেইজন্যই বেশ্যার উদ্ধার হইলেও তৎপ্রেরক রামচন্দ্র খানের উদ্ধার হয় নাই, তাহার

অপরাধ ক্রমশঃ ঈশ্বর পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছিল। আবার অত্যন্ত পাপাচারী যাহারা এ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছে, তাহারাও যে কোন প্রকারে বা যে কোন উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবের নিকট আসিয়া তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে ইহাই দেখা যায়। কোন বৈষ্ণব কোন প্রকারেই পাপাচারী বা মায়াবাদী প্রভৃতির সঙ্গলাভের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। বৈষ্ণবগণ নিত্যকালই দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের শিক্ষাই দিয়া থাকেন। দুঃসঙ্গকে প্রতিযোগী জ্ঞান না করিয়া পরিহারযোগ্য জ্ঞান করিলেই আমাদের মঙ্গল হয়।

অবধূতকুলশিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দের পাষণ্ডদলন-কার্য্য এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মরজোঽভিলাষী হইয়া তাঁহার দাসানুদাসের আনুগত্যে দুঃসঙ্গবর্জ্জনকার্য্যটী অবান্তর, অবাঞ্ছিত অথবা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে; উহা শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমপ্রচার এবং তাঁহার দাসানুদাসের দাস্যাভিলাষী জনগণের শুদ্ধভক্তি-যাজনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য অনুকূল কার্য্য। আমরা অনেকে ধ্বংস অপেক্ষা গঠনের পক্ষপাতী এবং 'সাধুসঙ্গেই দুঃসঙ্গ নাশ হয়. সাধুসঙ্গ-ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনের চেষ্টা-দ্বারা কোন লাভ হয় না, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অন্তর এবং বহিঃস্থিত অসদ্‌বুদ্ধি ও অসদ্ব্যক্তির প্রভাব আমাদিগকে কত প্রকারে কপটতা শিখাইতেছে, তাহার অনুসন্ধান আমরা করি না কেন? সাধুসঙ্গে থাকিলে দুঃসঙ্গের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু বর্ত্তমানে সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইয়াও

আমাদের অনর্থ কাটিতেছে না কেন ইহাই ত' সমস্যা। দুঃসঙ্গ যখন যাইতেছে না, তখন সাধুসঙ্গ নিশ্চয়ই হইতেছে না। আলোর ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যায়। আলো এবং অন্ধকার একই স্থানে একই সময়ে কখনও থাকে না। বাহিরের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের দুর্দ্দমনীয় অসংপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিবার জন্য অকপট চেষ্টাযুক্ত হইয়া সাধুর নিকট অভিগমন করিলেই সাধুগণ বীর্য্যবতী বাণীরূপ অস্ত্র-দ্বারা "মনোব্যাসঙ্গ" ছেদন করিয়া থাকেন। এই জন্যই সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রে এবং মহাজনগণের আচরণে অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের আদেশ ও আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে দুঃসঙ্গ-ত্যাগ অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনেরই সোপানস্বরূপ হইয়া থাকে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী।

নামহট্টের মূল মহাজন পাষণ্ডদলনবানা শ্রীনিত্যানন্দ রায় পাষণ্ডদলনপূর্ব্বক প্রেমপ্রচারের যে অদ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, 'নামহট্টের ঝাড়ুদার' পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর প্রপঞ্চমার্জ্জনলীলায় যে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ এবং তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রপঞ্চমার্জ্জনের উপকরণ-রূপ শতমুখীর শলাকারূপে দুঃসঙ্গবর্জ্জনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা আমাদের নিত্য সেবনীয় হইলেই আমরা দুঃসঙ্গত্যাগের অত্যা-বশ্যকতা এবং দুঃসঙ্গ বজায় রাখিয়া বা দুঃসঙ্গবর্জ্জনে ঔদাসীন্য দেখাইয়া প্রেমপ্রচারে অত্যাগ্রহ প্রদর্শনের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব।

হরিভজন হ'ল না !!

আমার হরিভজন হ'ল না। হৃদয়ের কপটতা গেল না, আমার দেহ, ইন্দ্রিয় সকলই হরিভজনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সেবোন্মুখ হইল না, তাই আমি সদ্গুরু ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের অযাচিত সঙ্গলাভ করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ করিতে পারিলাম না। ভোগোন্মুখ কর্ণে তাঁহাদের শুদ্ধকীর্ত্তন প্রবেশ করিল না ও তাঁহাদের কীর্ত্তিত নাম আমার রসনাগ্রে উদিত হইল না। আমার হরিভজনে উৎসাহ নাই, হরিভজনই যে আমার নিত্যধর্ম্ম তাহাতে নিশ্চয়তা নাই, সেবাকার্য্যে ধৈর্য্য নাই, গুরু-বৈষ্ণবের মহান্ আদর্শ দেখিয়াও তাঁহাদের আচরণ অনুবর্ত্তন করিবার রুচি নাই, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগে যত্ন ও দৃঢ়সঙ্কল্প নাই, সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবার আগ্রহ নাই, তাই আমার দুর্দ্দৈব কাটিল না। আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে আর কেহ নাই, আমি কুক্কুর হইতেও ঘৃণ্য—কুকুর অমেধ্যভোজী আর আমি মানুষ নামে পরিচয় দিয়া, ভক্তের পোষাক পরিয়া গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে সেবা-বুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণবস্তুতে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ, আমার লালসার পরিতৃপ্তিকর বস্তুগুলি পাইলে আমি গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে অনুরাগ দেখাইয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রভুর আচরণের আদর্শ আমি একবারও হৃদয়ে স্থান দিই না। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার প্রভুপাদ মহাপ্রসাদের চিন্ময়ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমায়াপুরে

শ্রীগৌরজন্মোৎসবে সকলের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কুক্কুর ভক্ষণ করিয়া গেলে তদবশেষ তিনি গ্রহণ করিয়া ছিলেন. আমি তাঁহার এই আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াও মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিতেছি। মহাপ্রসাদে "যথাবিষ্ণুস্তথৈব তৎ" এই বুদ্ধি আমার উদিত হইতেছে না। আমার প্রাকৃত বুদ্ধি গেল না, আমি কনিষ্ঠাধিকার হইতে আর উন্নত অধিকার লাভ করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবে আমার নিয়তই প্রাকৃতবুদ্ধি রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেবে আমি সততই মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিতেছি। আমি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করি, আমার 'কাঠের ঠাকুর' 'মাটীর ঠাকুর' বুদ্ধি লইয়া আমি বৈষ্ণব সাজিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে গিয়া শক্তি-পূজা করিয়া ফেলি এবং প্রাকৃত শাক্ত হইয়া পড়ি। আমার ঘণ্টাবাদনই সার হয়, অধোক্ষজ-বিষ্ণু আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন—আমার ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত চেষ্টা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

আমি তুলসীকে পত্র মাত্র, গঙ্গাকে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের অর্থাৎ আমার পাপস্খালনের বা পুণ্যার্জ্জনের বস্তুমাত্র জ্ঞান করি। আমি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি, লোকে আমাকে 'ভক্ত' বলিবে—এইজন্য, আমি কপটতাপূর্ব্বক ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনতাশ্রয় করিয়া থাকি. লোককে জানাই আমি নির্জ্জনভজনানন্দী কিন্তু আমি মনোধর্ম্মের অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি। তাই বলিতেছিলাম, 'আমার হরিভজন হইল না'।

যদি আমার হরিভজন হইত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া" ও সৎসিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই প্রস্ফুটিত হইয়া

আমার জীবনটীকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া তুলিত। আমার কুরূপ ঘুচাইয়া আমাকে সুরূপ করিত, আমার হৃদয়ের পূতিগন্ধময় অভদ্র-রাশি বিদূরিত করিয়া সেই স্থানে ভক্তিলতাবীজের অঙ্কুরোদ্গম হইত, রূপানুগ বৈষ্ণবগণ আমাকে কুরূপ বা কুদর্শন দেখিয়া আমার প্রতি আর উদাসীন থাকিতেন না, আমার সেবাসৌন্দর্য্য দেখিয়া আমাকে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদের অনুগত পাল্য ও আশ্রিত-বর্গের মধ্যে স্থান প্রদান করিতেন।

কিন্তু আমার বড়ই দুর্দ্দৈব, আমার হরিভজন হইল না। আমি কোন সময় কর্ম্মবুদ্ধি লইয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকি, কখনও বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া—আমি বড়ই সেবা করিতেছি দেখাইয়া থাকি, কখনও ভাবি আমার যখন বৈষ্ণবগণের আনীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হয় তখন তদনুপাতে কিছু পরিশ্রম না করিলে বোধ হয় বৈষ্ণবগণ আমার অন্ন বন্ধ করিবেন। কখনও ভাবি, বেশী শ্রমশীলতা দেখাইলে তাঁহারা আমাকে আদর করিয়া অধিক পরিমাণে চর্ব্ব্যচুষ্যাদি প্রদান করিবেন এইরূপ ভাবে বৈষ্ণব-গণের ভিক্ষান্নে পরিপুষ্ট হইয়া আমার জীবনটী কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি করিতেছি, কোথায় আসিয়াছি, ইঁহাদের সঙ্গে আমার কতদূর কি লাভ হইতেছে, পর-উপদেশে পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া নিজের জীবনে হরিগুরুবৈষ্ণবের আদর্শ কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, আমাদের হৃদয়ে ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্তগুলি কতটুকু পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছে তাহার

অনুসন্ধান একবারও করি না। দিন যায় রাত্রি আসে, আবার রাত্রি চলিয়া যায় পুনরায় দিন আগমন করে, কিন্তু আমার হরিভজনে একচুলও উন্নতি দেখা যায় না। হায়! আমি এমন হরিভজনের দুর্লভ জন্ম, হরিভজনের উপযোগিদেহ, গুরু-কর্ণধার, নিত্যপ্রবাহিত ভগবৎকৃপারূপ-অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়াও উহাদিগকে আমার হরিভজনের প্রতিকূল করিয়া ফেলিলাম! দেহ আমার হরিভজন না করিয়া মায়ার ভজন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমি গুরুপাদপদ্ম পরিহারপূর্ব্বক কামক্রোধাদিরিপুবর্গকে আমার 'প্রভু' বলিয়া বরণ করিলাম; কিন্তু বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্নিদেশ পালন করিলেও তাহারা আমার প্রতি একবারও কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না, আমি এতই নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ যে তথাপি আমি উহাদিগেরই দাস্য করিবার জন্যই লালায়িত! আমার লোক দেখান গোরা-ভজা, দুই নৌকায় পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না. দুঃসঙ্গে আমার আত্মীয় পরিজন বুদ্ধি, তৎসঙ্গে পর বুদ্ধি! যে দিন আমার দুঃসঙ্গে অনাদর, গৌরবিরোধী নিজজনে পর্য্যন্ত পরবুদ্ধি ও সদ্‌গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবে আপন বুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক "টান" হইবে সেই দিন আমার হরিভজন আরম্ভ হইবে।

"যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥"—

— বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।২০

—:*:—

"অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা !"

অতুল জীবদুঃখকাতর মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতির এই পদটি আমার ন্যায় কুলাঙ্গার শিষ্যাভিমানীর জন্য কীর্ত্তন করাইতে করাইতে নিজ শিরে করাঘাত করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের আচরণের তাৎপর্য্য আমার ন্যায় বিষমচিত্তবৃত্তিযুক্ত জীব ধারণা করিতে পারে নাই ; এমন কি, এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া তাঁহার শ্রীচরণেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই ; যেরূপ জগদ্‌গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-পাদের নির্য্যাণ-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যাভিমানী রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রের অপ্রাকৃত-বিরহ-বিধুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া—শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মবিৎ হইয়াও কেন দেহের যন্ত্রণায় বদ্ধজীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে ব্রহ্ম-উপদেশ প্রদান করিবার পাষণ্ডতা করিয়াছিল, সেইরূপ শিষ্যাভিমানী কুলাঙ্গার আমি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঐ গীতি কীর্ত্তন করাইবার তাৎপর্য্য ও তৎসঙ্গে স্ব-শিরে করাঘাত করিবার গূঢ় রহস্য ধারণা না করিতে পারিয়া তাঁহার শ্রীচরণে কতই না অপরাধ করিয়াছি ও করিতেছি !

আমি মনে করিয়াছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদ বোধ হয় অন্তিম-শয্যায় শয়ন করিয়া শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছেন,

সেইজন্যই ঐরূপ কপালে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর পাষণ্ডপূর্ণ চিন্তাস্রোত আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে!

যিনি শ্রীনামশ্রেষ্ঠ শ্রীযুগল নাম, মনোধর্ম্ম-বিনাশক মন্ত্র, ঔদার্য্যাবতার শ্রীশচীপুত্র, তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু, তাঁহার মিত্র শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, ঔদার্য্যময়ী পুরী শ্রীমায়াপুরী, শ্রীমথুরা, শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-ধামের শ্রীগোষ্ঠবাটিকা, শ্রীরাধাসরসী, শ্রীগিরিরাজ ও শ্রীরাধিকা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাপ্তির নিশ্চয়াত্মিকা আশা প্রদান করিয়াছেন, সেই মহোদার্য্যাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐরূপ পরমোদারা দয়া অজস্রধারে অবিরাম বর্ষিত হইলেও অতিশয় দুর্দ্দৈব-বশতঃ আমি তাহা গ্রহণ করি নাই, তাহা গ্রহণ করিব বলিয়াও কোন চিন্তা ও যত্ন নাই, বরং সেই দয়ার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্যই আমার হৃদয় সতত চেষ্টিত!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিপ্রলম্ভবিভাবিত হইয়া এই গীতি গান করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্বভজন। এই স্বভজন-বিভজনকার্য্যের মধ্যে আমার ন্যায় বদ্ধজীবের জন্য তাঁহার কৃপার নিদর্শন এই যে, তিনি আমার নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আমাকে জাগরিত এবং আমার দাম্ভিকতা ও সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি দূর করিবার জন্য আমার মন্দভাগ্যের ও তাঁহার পরমোদারা কৃপার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার অপ্রকট-লীলা-তিথি এই প্রপঞ্চে পূর্ণ-বর্ষ-চতুষ্টয়ে আবর্ত্তন করিল, তথাপি তাঁহার অপ্রকটলীলা-কালীয় সেই গীতির ঝঙ্কার এই চারি বৎসরের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও আমার পাষাণ-হৃদয়ে কোন ক্রিয়া করিল না! আমার লোকদেখান দৈন্য, অন্তরের দম্ভদৈত্যের আস্ফালন ও কপটতাকেই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে! আমার চক্ষে অশ্রুধারা শ্রীল প্রভুপাদের ঐ বাণীর অনুসরণে আবির্ভূত হয় নাই। ভাবী সম্ভোগের অভাবের আশঙ্কায়, শোকধর্ম্মাচ্ছন্ন শূদ্রের ন্যায় শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সেব্য বিষয় অর্থাৎ শ্রীনাম-প্রভুর সেবা-সম্ভার ভোগাভাবের আশঙ্কায় ঐ অশ্রু নির্গত হইয়াছে। আমার ভাগ্য যে অতিশয় মন্দ, তাহার প্রধান সাক্ষ্য এই যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে যে শ্রীরূপ-প্রভুর পদ-ধূলিত্বকে একমাত্র আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু বলিয়া কৃপা-পূর্ব্বক জানাইয়া-ছেন, আমি সেই শ্রীরূপানুগ-গণের পদধূলিত্ব বা নিষ্কিঞ্চনত্বকে বরণ না করিয়া বিষয়ের প্রভুত্ব বা পুরুষাভিমানে প্রমত্ত হইয়াছি! অধিক কি, শ্রীজগদ্গুরুর উপর প্রভুত্ব, শ্রীগুরুর উপর গুরুত্ব বিস্তার করিবার জন্য আমি কত ভাবেই-না চেষ্টিত হইয়াছি, তজ্জন্য কত কৌশলই-না অবলম্বন করিয়াছি। অশোক, অভয়, অমৃত শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে শোকধর্ম্মাচ্ছন্ন, সভয় ও মর্ত্ত্য বলিয়া পাষণ্ডতা করিতেও পশ্চাৎপদ হই নাই। শ্রীল গৌরসুন্দরের কথিত 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ' শ্লোকটি আমার পাষণ্ডপূর্ণ হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই বলিয়া,

গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'—এই বিচারের অনুভব এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যসিদ্ধা গোপী বা গোপী-শিরোমণিরূপে দর্শন করিতে পারি নাই। নিজেকে গোপীভর্ত্তা, বা শ্রীগুরুদেবের ভর্ত্তা—পালয়িতা, রক্ষাকর্ত্তা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কল্পনা করিয়া 'ভবানীভর্ত্তা'র নির্ব্বিশেষ বিচারের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়াছি।

শ্রীগোপী শ্রীগোপীজনবল্লভকেই একমাত্র গোপ্তা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ অনুভব করেন। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সত্তা। কাহারও সেই শ্রীগোপীর ভর্ত্তা বিচার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কেহ অভিমন্যু প্রভৃতির অভিনয় করিলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার বা দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিলে শ্রীগোপী সেই পুরুষাভিমানীকে বঞ্চনা করেন। পুরুষাভিমানী শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতিযোগী। সে কখনও শিষ্য হইতে পারে না। যিনি গোপীর নিত্য আনুগত্য করেন, তিনি সর্ব্বত্র গুরুদর্শন করেন বলিয়া প্রকৃত শিষ্য, অতএব নিত্য জগদ্‌গুরু।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা'—এই গীতি কীর্ত্তন করাইয়া যে প্রভুপদেশ প্রদান করাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণে-বর্ণে সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতিশয় মন্দ ভাগ্যের লক্ষণ এই যে, তাহার সাধুতে বিশ্বাস নাই ; যে শ্রীনামাচার্য্য সাধু জগতে শ্রীনাম-প্রভুকে বিস্তার করেন, সেই সাধুর আচার্য্যত্বের প্রতিই তাহার সংশয়, সেই সাধুর নিন্দা নামাপরাধরূপ পরমাপরাধ বিস্তার করে। সাধুর

নিন্দা হইলে শ্রীনামে কখনও রুচি হইতে পারে না, মালা-টানার অভিনয়ই সার হয়, শ্রীনামের প্রতি প্রীতি, রুচি বা আসক্তি হয় না। শ্রীনাম-প্রভুকে আপনার হইতেও আপনার, পরম অমৃত, পরম জীবন ও পরম ভূষণ শ্রীগোকুল-মহামহোৎসব বলিয়া উপলব্ধি হয় না। জাড্য, আলস্য, অন্যাভিলাষ, ভুক্তি-মুক্তি-প্রতিষ্ঠা-কামনা, কপট দৈন্যের নামে প্রচ্ছন্ন দম্ভ, আচারহীন পরোপদেশে পাণ্ডিত্য, পরছিদ্রানুসন্ধিৎসা, বৈষ্ণব-বিদ্বেষে দক্ষতা ও উৎসাহ, শ্রীরূপ-প্রভু-কথিত উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য প্রভৃতিকে বৈষ্ণবের বিদ্বেষ-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রযত্ন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে নিজের প্রতি, জীবের প্রতি হিংসা-আচরণে অপূর্ব্ব কর্ম্মঠতা দৃষ্ট হয়। 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবা' – এই তিনটি সৌভাগ্যবানের বৃত্তি হৃদয় হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়,— ইহাই মন্দ ভাগ্য।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব্ব হইতে প্রচ্ছন্ন গুর্ব্ব-পরাধরূপ যে মত্তহস্তী হৃদয়ে পরিপুষ্ট হইতেছিল, শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর তাহা স্পষ্ট স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা বৈষ্ণব-বিদ্বেষের এইরূপ ষড়যন্ত্রের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন কালে, কোন পাত্রে, কোন স্থানে, কোন ইতিহাসে দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক্, শ্রুতও হয় নাই।

শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব যখন অমায়ায় শাসন করেন, নির্ম্মম-ভাবে দণ্ড প্রদান করেন, অত্যন্ত কর্কশ, রুক্ষ, মর্ম্মভেদী শাণিত-বাক্যে হৃদয়ের অন্যাভিলাষ-গ্রন্থি-সমূহ ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য অবঞ্চনাময়ী কৃপা বিস্তার করেন, তখন যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে

আমারই ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, অর্থাৎ পরছিদ্রান্বেষী মনে করে, তাহার ন্যায় অতিশয় মন্দ ভাগ্য আর কে? যে শ্রীগুরুদেবকে নৈতিক চরিত্রবান্, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, জীবকোটির অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ, অথবা আরোপ-বলে কিম্বা কোন সুবিধাবাদ চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করে, তাহার ন্যায় অতিশয় দুর্ভাগ্য আর কে? যে ব্যক্তি 'বৈষ্ণব চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি', ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'—এই পরম শিক্ষাময়ী বাণী উল্লঙ্ঘন করে, তাহার ন্যায় অতিশয় মন্দ ভাগ্য আর কে? যে বৈষ্ণবের সেবা না করিয়া নিজেই বৈষ্ণব হইতে চাহে অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত নির্ম্মল, চেতন সুপ্রসূনরাজিকে অঞ্জলি প্রদান না করিয়া তাহাদিগকে কেবল তোষামোদ-বাক্যে তুষ্ট করিয়া তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা-আচরণ ও লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন-রূপ শৌকরীবিষ্ঠা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে, তাহার ন্যায় অতিশয় মন্দভাগ্য আর কে? আমি 'ভাল আমি' হইব না, অপরকেও 'ভাল আমি' হইতে দিব না, আমি 'বড় আমি' থাকিবার জন্য অপরকে তোষামোদ করিব, অপরের অন্যাভিলাষ, পাষণ্ড বা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিব;—এইরূপ চিত্তবৃত্তি অতিশয় মন্দভাগ্য ব্যতীত আর কাহার? আমি সেইরূপ মন্দভাগ্য হইয়াছি! আমি অতুল কৃপাময়, জগদ্‌গুরু, আচার্য্যকেশরীর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইবার অভিনয় করিয়াও, 'ভাল আমি' হইবার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি হইবার জন্যই সর্ব্বদা অখিল চেষ্টা করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাস্যে অখিল-চেষ্টা নিযুক্ত

করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে ভোগ করিবার যত্ন বা তাঁহাদিগের বিদ্বেষ করিবার জন্য আমার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি। আমি অন্যাভিলাষসাগরের ভীষণাবর্ত্তে পতিত হইয়া ইচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণব-বিদ্বেষের ন্যায় ভীষণতম মন্দ ভাগ্যের কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই, তদপেক্ষাও দুর্ভাগ্য এই যে, আমি আমার বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কার্য্যকেই প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবা মনে করিতেছি !

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মর্ম্ম কিছুমাত্র না বুঝিতে পারিয়া, আমি বা আমরা তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছি ও তদনুসারেই বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম ও অপ্রিয়তম বিচার করিতেছি ! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী আমার চরিত্রে ও আচরণে কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে ? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত, আচার-বিচার কি তাঁহার শ্রীগুরুবর্গের, শ্রীস্বরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ শ্রীশ্রীজীব প্রভুর আচার-বিচার হইতে পৃথক্ ? অন্যাভিলাষ কি শুদ্ধভক্তির জনক বা পুত্র ? শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে করিতে, শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আকুমারিকা হিমাচল ও পৃথিবী আলোড়ন করিতে করিতে তৎফলস্বরূপ কি আমার অন্যাভিলাষ-রাশি বর্দ্ধিত হইবে ? শুদ্ধভক্তির সেবা করিতে করিতে কি আমার হৃদয়ে দম্ভদৈত্যের বাসস্থান হইবে ? শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর অন্তরঙ্গ সেবা করিতে করিতে কি আমার হৃদয়ে 'বড় আমি' হইবার স্পৃহাই অধিক বলবতী হইবে ও 'ভাল আমি' হইবার আন্তরিকতা ক্ষীণা বা বিলীনা হইয়া যাইবে ? শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-

সরস্বতীর সেবা দ্বাদশ বর্ষ, অষ্টাদশ বর্ষ বা চতুর্বিংশতি বর্ষ করিবার ফলে কি আমার হৃদয়ে প্রভুত্ব-কামনা, পুরুষাভিমান, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা, নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোতঃ ও শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি প্রবল হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ কিজন্য 'অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা'—এই গান গাহিয়াছিলেন,—ইহা তো একদিনও চিন্তা করি না। যদিও চিন্তা করি, তখন নিজের দিকে তাকাই না, অপরের ছবিই দেখি অর্থাৎ আমার মন্দ ভাগ্য হয় নাই, আমি ভালই আছি, ঠিকই আছি, অপরের মন্দ ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, অপরেই নানা দোষে দুষ্ট হইয়াছে, এইরূপ আত্মম্ভরিতায় অভিভূত হইয়া পড়ি। আমার এই চিন্তাস্রোত: শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর একমাত্র যে মহাপুরুষ উল্টাইয়া দিয়াছেন—অন্ততঃ তাহা চিন্তা করিবার জন্য প্রেরণা দান করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের কৃপায়ই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, অতিশয় মন্দভাগ্য হইয়াও আমি অতিশয় সৌভাগ্যবান্—কেন না, একমুহূর্ত্তের জন্যও যদি আমার হৃদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই অপ্রকটকালীয় মহতি শিক্ষা অনুধ্যান করিবার প্রেরণা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইতে আমি এখনও বঞ্চিত হই নাই। যখন নিজের অযোগ্যতা, নিজের অভাববোধ ও কৃপার বল উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন তাহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা, শ্রীবলদেবের বল, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অনুকম্পা ব্যতীত কোন পার্থিব বস্তু হইতে পারে না। নিজের বল, ভরসা, যোগ্যতা, দক্ষতা দ্বারা অযোগ্যতার উপলব্ধি হয় না। নিজের

বলে বা বাহাদুরিতে কেহ 'ভাল আমি' হইতে পারে না, তাহাতে 'বড় আমি' হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা-কালে যে গীতি গান করাইয়াছিলেন, সেই গীতির ঝঙ্কারে যিনি সকল নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়-মন্দির মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট শ্রীশ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথের বাণী প্রচারক, সর্ব্বআচার্য্য-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিব। এতদ্ব্যতীত আচার্য্যের অন্য কোন লক্ষণ প্রাকৃত আগমাপায়ী, লোক-বঞ্চনাময় লক্ষণ বলিয়াই জানিব। পরোপদেশে পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় বাগ্মিতা, লোকরঞ্জনে পটুতা, ক্রিয়াদাক্ষ্য, জাতি-বয়স-দেহ, প্রবীণতা, ত্যাগ, তপস্যা—এই সকল কোনটিই আচার্য্যত্ব নহে; অথবা সৎকুল, বিপুলৈশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য বা আভিজাত্য, অন্যাভিলাষপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা কোনটিই শিষ্যত্বও নহে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর কোন্‌দিকে অধিক গণমত বা অন্যাভিলাষযুক্ত মত বা জাগতিক দক্ষতা, পাণ্ডিত্য তাহা দেখিয়া সত্য নির্ণয় হইবে না; শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-কালীয় শ্রীভক্তিবিনোদবাণী 'অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা' যাঁহার বা যাঁহাদের চিত্তে অনুক্ষণ জাগরিত তিনি বা তাঁহারাই শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরবাণীর কিঙ্কর বা প্রকৃত শিষ্য। আমার হৃদয়ে ইহা অধিক জাগরিত আছে, বা আমিও ঐসকল কথা জানি, ইহা কিছু নূতন কথা নহে—এইরূপ চিন্তা-স্রোত

কাহারও থাকিলে তিনি 'বড় আমি' বটে. কিন্তু তিনি 'ভাল আমি' বা 'শিষ্য আমি' নহেন। তাঁহার হৃদয়ে 'অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা'—এই গীতির উপলব্ধি নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরম বাণী বলিয়া কেহ কেহ 'বড় আমি', 'শ্রেষ্ঠ আমি' বা 'প্রভু আমি' হইবার কথাকেই প্রচার করেন; কিন্তু—

"তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা!"

ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরম বাণী, ইহাই বিপ্রলম্ভরস-পোষ্টা শ্রীগৌর-জনের স্বভজন-বিভজনময়ী বাণী, ইহাই তাঁহার জীবদুঃখ-কাতরতার বাণী; ইহাই শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা, ইহাই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী, ইহাই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা।

এই ধারায়, এই চিন্তা-স্রোতে যাঁহার হৃদয় সর্ব্বত্র স্নাত, তিনিই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজ-জন, তিনিই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌর সরস্বতীর সেবা-সংরক্ষক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই চরম বাণী কবে আমদের হৃদয়-পথের পথিক হইবে? কবে অভাববোধ ও অন্তর্দাহের চিত্তবৃত্তি শ্রীবৈষ্ণবের প্রভুত্ব করিবার কামনাকে ও তজ্জনিত কলি ও দ্বন্দ্বকে বিদূরিত করিয়া যিনি ঐ বাণীর স্মৃতি হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয়, তাঁহার শাসন, সংশোধন ও দণ্ডকে পরম করুণা বলিয়া গ্রহণ করিবে? কেবল মৌখিক বা লৌকিকভাবে, কিম্বা কাব্যচ্ছটা-প্রদর্শন-কল্পে, অথবা হস্তিস্নানের ন্যায় সাময়িকভাবে এই কথা

বিচার না করিয়া কবে আমি সমগ্র প্রাণ বলি দিয়া এই শ্রীভক্তি-বিনোদ-শ্রীগৌরবাণীকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইব ?

—:❁:—

'বড় আমি' ও 'ভাল আমি'

চেতনের ধর্ম্মের নির্ব্বিকাশক্রমে জীবের 'বড় আমি'র প্রগতি লাভজনক বলিয়া শ্রুতিশাস্ত্র গান করেন। আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগের বিচারে 'বড় আমি'কে ভোক্তা বা ভোগ-রহিত বলিয়া বিচার করেন। আর নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবতার্ক-মরীচিমালা 'বড় আমি'র বিচার ভোগে বা ত্যাগে নিযুক্ত না করিয়া 'ভাল আমি'র বিচার ব্যক্ত করেন। সেই বিচার অনুসরণ করিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ আমি' জড়জগতে 'ছোট আমি'র দৌর্ব্বল্য-বাণে বিদ্ধ হয়। প্রাকৃত-বিচারে 'ছোট আমি'র আদর নাই; 'রহিত আমি'র আদরমূলে অনুভূতিরাহিত্যই 'ক্লিষ্ট আমি'র পরিণামে কর্ত্তব্য বলিয়া গীত হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ 'আর্ত্ত আমি'কে অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণের অনুগমন করিতে সুযোগ দিয়াছেন।

আধ্যক্ষিকতা ও অনাধ্যক্ষিকতা উভয় বিচারই বাস্তবসত্য-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক বলিয়া অধোক্ষজ ভগবান্ মহাবদান্যরূপে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। 'ভাল আমি'র বুদ্ধিদাতা মুণ্ডকশ্রুতি

পূরন—সেই বস্তু বৃহৎ হইতেও অতি বৃহৎ. সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম। আধ্যক্ষিকের বিচার আত্ম-প্রতারিত হইয়া বৃহত্ত্ব ও পূর্ণত্বের অবৈধ অধিকার-লাভে প্রযত্নবান্; আর 'ভাল আমি'র বিচার-প্রণালীতে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম জীবের অমঙ্গল নাশ করিয়া বদ্ধ বিচার হইতে মুক্ত করে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট গানকালে বলেন যে,—"ভক্ত্যা মামভি-জানাতি"। এইজন্যই অজ্ঞতাপরিহারকল্পে বিজ্ঞম্মন্যের নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তচ্ছ্রদ্দধানা সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" এই বিচাররহিত ব্যক্তিগণ বিচারের কৈতব আবাহন করিয়া ও অভক্তিপথে স্বীয় রোচমানা প্রবৃত্তি দেখাইয়া মায়াবাদী সাজেন; তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণা-শ্রয়ে বিচরণ করিলে নিজ স্বরূপের সুষ্ঠু উপলব্ধি করিতে পারেন।

কেবল-চেতনের কেবল-চেতনসেবা কেবল-চেতনের সুসূক্ষ্মা-নুভূতি হইতে উদিত হয় বলিয়া ইংরাজী ভাষায় "Immanent" শব্দ বা সংস্কৃত ভাষায় "অন্তর্যামী" শব্দ প্রত্যেক অণুচিৎএর আশ্রয়ে আত্মস্বরূপ জ্ঞাপন করেন। সুতরাং 'ভাল আমি'র পরিবর্ত্তে যদি 'বড় আমি'র জন্য জড়ের প্রতি ধাবিত হওয়া যায়, তবে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান পরবিদ্যার অনুসন্ধান দিবে না।

পরবিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন মুক্তজীবহৃদয়ে প্রাকট্য-লাভ না করিলে বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরীর মহিমা অত্যধিক—ইহা বুঝা যাইবে না। 'ভাল আমি' হইতে পারিলে বৈকুণ্ঠ-বাস, নতুবা মায়া-বাস মাত্র লভ্য হইবে। তখন আমাদের মুখ বাক্য-

বেগের বশবৰ্ত্তী হইয়া মায়াবাদবিচার প্রবল হয়, সুতরাং মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কায়বেগ আমাদিগকে প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া ফেলে, অবৈদান্তিক করিয়া ফেলে অথবা কর্ম্মরাজ্যের আলানে মনঃকুঞ্জরকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য উৎকণ্ঠিত করে। মাপারাণীর মহারাজ হইবার জন্য 'বড় আমি' নিজত্বকে লীন করায়। তখন রাধারাণীকে বড় জড়াভিমানে শূদ্রামাত্র জ্ঞানে তাঁহার সেবিকার বৃত্তি আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া 'ভাল আমি'র তদীয় জ্ঞান আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষিপ্ত তারকার ন্যায় তমিস্রভোগের দিকে পরিণামে ত্যাগ-তমিস্রের দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা ঈশোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ স্কন্ধারূঢ় ভূতকে তাড়াই।

'বড় আমি'র চাকরাণ ভোগীদিগের বেইমানি-বিচারে নানারূপ বে-আদবী ছাড়িয়া যদি রাধারাণীর মন্দিরের সৌন্দর্য্য-দর্শনে 'ভাল আমি'র বা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই আমি শ্যামসুন্দরের আকর্ষণ অচিরেই লাভ করিব। তখনই আমি 'ভাল আমি' হইবার জন্য 'মাপারাণী'র প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে রাধারাণীর দাস্যে আত্মনিয়োগ করিব। অপৌরুষেয় শ্রুতিগুলি আধ্যক্ষিকতার বা প্রচ্ছন্নতর্কের গোলামিতে নিযুক্ত হওয়ায় যে-প্রকার শ্রুতিব্যাখ্যা-দ্বারা মায়াবাদি-সম্প্রদায় জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, নৈমিষারণ্যের আরণ্যকসমূহ আমাদিগকে পরমহংসী-সংহিতার মঠে আশ্রয় দিয়া অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত করিবে। এইজন্যই শ্রীনারদোপদিষ্ট ভক্তিপথাবলম্বী শুনিয়াছেন - "অনর্থো-

...মং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ-মধোক্ষজে"।

আমাদের বৈষ্ণববন্ধু ভারতী স্বামী আমার মঙ্গলবিধানের জন্য শ্রুতিমৌলিরত্নমালা বা ভাগবতার্ক-মরীচিমালা গাঁথিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কাষ্ঠের মার্জ্জার যেরূপ সেতুবন্ধনে অসমর্থ, বামনের চন্দ্রধারণ যেরূপ অসম্ভব, আমারও শ্রুতিসার-সেবা ভাগবতার্কোদয় আলোকিত হইবার প্রয়াস তদ্রূপ। যাহা হউক, "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচার অনুসরণ করিয়া 'ভাল আমি'র দলের শ্রৌতদর্শন, শ্রৌতশ্রবণ শ্রৌতঘ্রাণ, শ্রৌতআস্বাদন, শ্রৌতস্পর্শন ও শ্রৌত-মননের অনুগমন-চেষ্টা করিব।

পরম-কারুণিক-গৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। সেই প্রেমের কথা কি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে না? শুনিয়াছি—কলিকাল দোষসমুদ্র, কিন্তু এই সমুদ্রের একটি মহাগুণ আছে। কীর্ত্তনবিহারী শুকদেব প্রভু শ্রীসূতদেবকে ভাগবতী কথা বলিয়াছিলেন। সেই ভাগবতী কথাই তৃতীয় অধিবেশনে নৈমিষারণ্যে—যেস্থানে ব্রহ্মার নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, সেই অধোক্ষজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গিয়াই শ্রীব্যাসের কৃপা আমরা যাহাতে লাভ করিতে পারি—ইহাই ভরসা।

স্যমন্তপঞ্চকে দিশাহারা ব্রজবাসিগণ দিক্ লাভ করিয়াছিলেন। যোগমায়ার কৃপায় তাঁহার পুরপীঠে কি কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী স্ুবর্ণবিহারে তাঁহার যে রুক্মবর্ণের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? "যঃ পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং

পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।” সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণবিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোদ্রুমবিহারী কি আমাদের শুকমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিতফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে গোবিন্দস্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার গোবিন্দস্তবের গান কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেই দিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া মৌখিক রূপানুগত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকিব? শ্রবণাখ্য সীমন্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপবিহারী স্বীয়রূপমূর্ত্তি অধোক্ষজসেব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগত্যে 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপঞ্চাস্য আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পদসেবায় অসমর্থ হইব? মহাকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগসেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? দীর্ঘ বকারদ্বয়ের প্রথম বকারে গোলোকোপরিস্থিতি বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের অঁাকশী বা আকর্ষণী আমাদিগের

স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়বাহনের কৃপাক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া মাপারাণীর প্রভু সাজ হইতে রাধারাণীর পরম সৌন্দর্য্যময়ী পদনখশোভা কৃষ্ণকর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে। তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দনপরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূরপরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দ্বাদশগোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্মসমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুবপীঠেব স'ন্নহিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে চিরবঞ্চিত হইব?

শুনিয়াছি—আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের শোভায় জগন্নাথবল্লভের লেখকের রাধাগোবিন্দমিলনের কথা বুঝিতে পারিব না? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে, "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে"। সুতরাং শ্রীধামসেবা কি শ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা ত নহে!! নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মকল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফল পাওয়া যায়। অন্য প্রকারে কৃষ্ণপ্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিব না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়েই শিক্ষামন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্-

ভজনে আশাবন্ধ-অবস্থা আমাদিগের নিত্যকল্যাণ বিধান করুক্। আমি বড় হইব না. ভাল হইব, তবেই ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ বুঝিতে পারিব—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়গান —ভাগবতার্কমরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।

—:•:—

সকল ত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না

সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ, না হয় পরম অনর্থ। পরমার্থপিপাসু পরমার্থের জন্য—কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু পরমার্থ বা কৃষ্ণসেবাকে ঐ সমস্তের অন্তর্গত করেন না, অর্থাৎ যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিতে গিয়ে হরিসেবা বা পরমার্থকেও ত্যাগ করিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে 'মায়াবাদী', শূন্যবাদী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যে-বস্তু ত্যাগের যোগ্য নহে, তাহাই প্রকৃত পরমার্থ-পদবাচ্য।

অনর্থই ত্যাগের বস্তু। 'অর্থ'-শব্দের অর্থ—প্রয়োজন ; যাহা অপ্রয়োজনীয়, তাহাই লোকে ত্যাগ করিয়া থাকে। খাদ্য প্রয়োজনীয় বস্তু, তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টিতুষ্টিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়;

বস্তু খাদ্যের অসারভাগ পুরীষ স্বাস্থ্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগের বস্তু, তাহা পরিত্যক্ত না হইলে শরীরে গ্লানি উপস্থিত হয়। আত্মশরীর বা চিন্ময় শরীরের পক্ষেও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা চেতনশরীর বা আত্মার স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়, তাহাই পরমার্থ, আর যাহা চেতনশরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তাহাই অনর্থ। এই অনর্থগুলি মল-মূত্রাদির ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু। সকল অনর্থ পরিত্যাগ করিয়াও যে অনর্থটিকে পরিত্যাগ করা যায় না, তাহাই পরম অনর্থ ; উহা কি ? শাস্ত্র বলেন,—

"সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়া যাঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শেন বরম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাস. ৯৮ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না, যাহা নিখিল অনর্থের কারণ, তাহাই প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা, তাহা যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত।

কোন কোন মহাজন প্রতিষ্ঠাশাকে শূকরের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিষ্ঠা অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যাগের বস্তু ; কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হইলেও আবার জীববিশেষের প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়। কুক্কুর-শূকরাদি প্রাণী সেই সকল অসার-ভাগকেই প্রয়োজনীয় সারভাগ বলিয়া গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠাশার প্রভাবও ঐরূপ। সকল অনর্থ ত্যাগ করিয়াও ইহাকে ত্যাগ করা যায় না। লোক যখন ধাম্মিক হইবার জন্য অগ্রসর হন, তখন

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" বলিতে বলিতে অর্থকে ত্যাগ করেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" বলিতে বলিতে স্ত্রী পুত্রও পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন, তথাপি তিনি যে কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইয়াছেন—এই গর্ব্বটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়,—যশের আকাঙ্ক্ষায়—সম্মানের লোভে মানুষ কি না করিয়া থাকে! বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যে-কোন মানবের, এমন কি, কোন কোন বিকশিতজ্ঞান পশুর মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকলেই যশের লোভে তাহাদের প্রিয়তম প্রাণকেও তুচ্ছ করিতে পারে। [ক্ষুদ্র শিশুকে যদি ভাল বলা যায়, গৃহপালিত কুক্কুরাদি ইতর জন্তুকে যদি আদর করা যায়, অমনি তাহাদের দ্বারা অনেক কিছু দুষ্কর কার্য্যও করান' যাইতে পারে। আবার তাহাদিগকেই মন্দ বলিলে তাহারা এইরূপ রুষ্ট হইয়া পড়ে যে, তাহাদের দ্বারা অনেক অভাবনীয় লোমহর্ষক ঘটনাও সংঘটিত হইয়া থাকে।] যশের লোভে বিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন পণ করিয়া অধ্যয়ন করে, সম্মানের লোভে বিশ্ব-সন্তরণ-প্রতিযোগিতা দেখাইতে গিয়া অনেকে সলিল-সমাধি লাভ করে, যশের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া অনেকে মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর করাল বদনের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইতেও দ্বিধা বোধ করে না, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া লোক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, গণ-মতের অভিনন্দন পাইবার জন্য লোক প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কারাবরণ করিয়া থাকে; এমন কি, আধুনিক যে সন্ত্রাসবাদ এক মহাসমস্যার

প্রতীকরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে প্রতিষ্ঠা-
শার প্রবল প্রেরণা। মানুষ জীবিতাবস্থায় যশের ডালি ভোগ না
করিয়াও মৃত্যুর পরে গৌরবলাভের জীবনবীমা করিয়া যাইতে
চাহে। প্রতিষ্ঠাশার এইরূপ প্রভাব! কামিনী-কাঞ্চন-স্পৃহার
দৌড় বা পরমায়ু মানুষের জীবনকাল পর্যান্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা
মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকে; এই জন্যই জাগতিক নীতিবিদ্‌গণ
বলেন,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" এই নীতিতে প্রলুব্ধ হইয়া
মানুষ আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদিও জীবিতাবস্থায় সেই
যশোগৌরব তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি বিলক্ষণ
জানেন, তথাপি তাঁহার অবর্ত্তমানে ভবিষ্যৎকালে তাঁহার যে যশঃ
হইবে, বর্ত্তমানে তাহারই মানসিক ভোগে প্রমত্ত হইয়া তিনি
যশঃক্রয় করিবার জন্য মৃত্যু পণ করিয়া থাকেন! এইরূপ প্রেরণায়
প্রমত্ত হইয়া কেহ গ্রন্থকর্ত্তা, কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ শিল্পী,
কেহ বা সমুদ্রের অতলগর্ভের সন্ধানকারী, কেহ বা গৌরীশঙ্কর-
শৃঙ্গের অভিযানকারী, কেহ বা উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু-আবিষ্কার-
কারী, কেহ হিংস্রজন্তুবহুল অরণ্যানীর মধ্যে জীবনপণকারী হইয়া
পড়েন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা
মানবজাতির উপকারের স্পৃহা বা পরার্থিতাই ঐ সকল অভিযান-
কারীকে তত্তৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। আজ যদি দুঃসাহ-
সিকতায় প্রণোদিত না হইয়া পর্ত্তুগালের নাবিক ভাস্কোডাগামা
উত্তমাশা-অন্তরীপের পথ আবিষ্কার না করিতেন, ইটালীর নাবিক

কলম্বাস ভারতবর্ষের পথ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার না করিতেন, আজ যদি উত্তরমেরুর ও দক্ষিণমেরুর সন্ধান করিতে গিয়া ন্যান্‌সেন্ (Nansen), পিয়ারী (Peary), স্কট (Scott), রস্ (Ross), স্যাক্‌লটন (Shakleton), এমণ্ডসেন (Amundsen) প্রভৃতি অভিযানকারিগণ প্রাণপণ না করিতেন, আজ যদি ভিক্টোরিয়া-জল-প্রপাত, অষ্ট্রিয়ার মরুভূমি-অঞ্চল এবং বিভিন্ন দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, দ্বীপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে মানবের শিক্ষা, সভ্যতা সকলই সঙ্কীর্ণ থাকিয়া যাইত; অতএব যাঁহারা আবিষ্কার-কর্ত্তা বা অভিযানকারী, তাঁহারা যে কেবল প্রতিষ্ঠাশায় তত্তৎকার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছেন, ইহা বলা যায় না। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার সামুয়েল হ্যানিম্যান নিজের শরীরের উপর কতই না বিষ প্রয়োগ করিয়া ভাবী মানবজাতির উপকারের ধ্যান করিয়া গিয়াছেন ; উহাকে কি কেবল প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত ব্যাপার বলা যাইবে ? অধ্যাপক চার্লস্ ও তাঁহার স কারী রবার্ট যখন হাইড্রোজেন বেলুনে চড়িয়া প্রথম আকাশে উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি জীবন পণ করিয়াই ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন কে জানিত যে, পরবর্ত্তিকালে এয়ারশিপ্ ও য়্যারোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়া সভ্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে ? বৈজ্ঞানিকগণ জগতের সম্মুখে এক একটি আবিষ্কার প্রকাশিত করিতে গিয়া মার্টারের (martyr) মত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন ! ইঁহাদের চেষ্টাসমূহ কি প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত ?

আমাদের মস্তিষ্ক জাগতিক সুবিধাবাদের চিন্তায় ভরপুর; সেইখানে অন্য কোন সুসূক্ষ্ম চিন্তার তিলধারণেরও স্থান নাই। এই বিরাট্ বহির্ম্মুখ মানবজাতির ধারণায় যাহা পরার্থিতা-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়, তাহার ফল যখন সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট না হয়, তখন তাহাতে যতই পরার্থিতার বাহ্য রূপ-লাবণ্য থাকুক না কেন, তাহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির সুবিধাবাদে ব্যাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাশারই অবগুণ্ঠিত মূর্ত্তি। মানব কখনও আপনাতে সকল বহির্ম্মুখ আমিত্ব গুটাইয়া লইয়া বা সঙ্কীর্ণ করিয়া যশঃ বা সম্মান ভোগ করে, কখনও বা সেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ কোন বিশেষ জাতি, দেশ, অথবা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করাইয়া যশোগৌরবের ভোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; বরং আমিত্ব-প্রসারিত শেষোক্ত সম্মানের আকাঙ্ক্ষাটি আরও বিরাট্—আরও ব্যাপক।

সমষ্টি বা জাতির পরার্থিতার প্রতি চেষ্টা না থাকিলে সমষ্টি বা সমগ্র মানবজাতি কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে একাধিপতি করিয়া কেনই বা প্রতিষ্ঠাশুল্ক প্রদান করিবেন? এখন ঐ পরার্থিতা অহৈতুকী কি না, তাহাই প্রশ্নের বিষয়। যে-সকল সুবৈজ্ঞানিক সুসূক্ষ্ম আত্মবিচারের রঞ্জন-রশ্মিদ্বারা এই পরার্থিতা-প্রতীকের অন্তর দর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—যে পরার্থিতার ফল পুরুষোত্তমের ভোগ্য না হইয়া জীব বা জাতিবিশেষের ভোগ্য হইয়াছে, সেই পরার্থিতা কখনও অহৈতুকী হইতে পারে না; উহা "গরু মারিয়া জুতা-দান-"ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ঋষি ছাগলাদ্য

ঘৃতের আবিষ্কারই করুন, আর শর্ম্মনদেশের ঋষি হ্যানিম্যান্ নিজের প্রাণ পণ করিয়া মানবজাতির জন্য নূতন চিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কারই করুন, উহা দ্বারা অন্য প্রাণিজাতির পরার্থিতার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়িয়াছে। হোমিওপ্যাথির মধ্যেও এমন সকল মূল অরিষ্ট (ক্যান্থারিস্ প্রভৃতি) আছে—যাহা ইতর প্রাণীর প্রাণ কোন না কোন ভাবে ধ্বংস না করিলে সুলভ্য নহে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য চরক, কিম্বা ডাক্তার-হ্যানিম্যান্ কাহারও মানবজাতিকে প্রাণ দিবার বা একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যের কথা শুনা যায় নাই। তাঁহাদের কোন বিশেষ ব্যাধির প্রাবল্য উপশম করিবার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে মাত্র; কাজেই যেখানে তাঁহারা পরার্থিতা-প্রণোদিত হইয়া এক জাতির উপকার করিতে গিয়া আর একজাতির ন্যূনাধিক অপকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন কি অনেক সময় জড়চিকিৎসাবিজ্ঞান এক মানবের উপকার করিতে গিয়া অপর মানবের রক্তশোষণ—এমন কি প্রাণ হরণ করিতে বাধ্য হয়, সেইখানে ঐরূপ সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট পরোপকার-চিকীর্ষা বাহ্যমূর্ত্তিতে 'পরার্থিতা' বলিয়া মনে হইলেও তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাশার গুপ্ত মাদকতা ও প্রেরণা আছে।

আমরা যখন ভূতগ্রস্ত হই, তখন নিজেরা তাহা বুঝিতে পারি না; ইহারই নাম—মায়া। আর্থিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, যখন পরমার্থ-পথের পথিক বলিয়া পরিচয় দিই, তখনও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অনর্থে অভিভূত হইয়া আমরা আমাদিগকে উহাদের

দ্বারা গ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী কন্থবৈরাগীর নিকট যান, তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবেন না যে, তিনি সকল ত্যাগ করিয়াও প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হয় ত' বৈরাগীর বেশ লইয়াছি, বহির্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, ব্রজের (?) বনে বনে মাধুকরী মাগিয়া খাইতেছি, ধাতু-দ্রব্য স্পর্শ করি না, শিষ্য করি না, কুটীর বাঁধি না, কোন স্থানে এক দিবসের অধিক থাকি না—বাহ্যদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ (!), নিষ্কিঞ্চন (!!); কিন্তু এত ত্যাগ করিয়াও ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করা -শিষ্য না করা- কুটীরে বাস না করা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাটি ত্যাগ করিতে পারি নাই! এইজন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, সকল ত্যাগ করিলেও যাহা ত্যাগ করা যায় না, অথচ যাহা সকল অনর্থের জননী তাহাই প্রতিষ্ঠাশা।

প্রতিষ্ঠাশার কেরামতই এই যে, ইহা যাহাকে পাইয়া বসে, পিশাচী-গ্রস্তের ন্যায় সে তাহা বুঝিতে পারে না। আধিক সাহিত্যিকগণও এইজন্য ইহাকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—Last remains of noble Mind – মহদন্তঃকরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। জাগতিক পরার্থি-সম্প্রদায়ের অন্তর মহৎ,—এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ নাই; কিন্তু সেই মহদন্তঃকরণও প্রতিষ্ঠাশার কাছে দাসখৎ না লিখিয়া পারে না।

যাহা পরিত্যাগ করা যায় না, তাহা লইয়া মারামারি করিবার দরকার কি? যখন পরিত্যাগই করা যাইবে না, তখন পরিত্যাগ

না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবার কোন উপায় আবিষ্কারের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু এই আবিষ্কার-কার্য্যটি আমাদের নিজের পরিকল্পনা বা মতলব-অনুসারে করিতে গেলে এক বিপদ্ এড়াইয়া আবার আর একটি ভীষণতর বিপদে পড়িতে হইবে। তাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞগণ যে প্রণালী জানাইয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি,—সকল ত্যাগ করিলেও যাহা কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ,—না হয় অনর্থ। প্রতিষ্ঠাকে পরম অনর্থ না করিয়া পরমার্থে পর্য্যবসিত করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়। মহাজনের গীতিতে এই সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান আছে,—

"জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

জড়ের প্রতিষ্ঠাই বিষ্ঠাভোজী শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু; কিন্তু তাহা হরিবিমুখ জগৎ—যাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত বিড়্‌বরাহ বা গ্রাম্য শূকরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই জগতের নিকট পরম লোভনীয় খাদ্য। এই জন্যই তাহাকে মায়ার বৈভব বলা হইয়াছে। মায়িক রাজ্যে এত বড় বৈভব আর কিছুই নাই।

যাঁহারা সকল বস্তুকে হরিসেবার উপকরণ করিতে পারিয়াছেন,

সকল ব্যাপারকে পরমার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠাও হরিসেবার উপকরণ বা পরমার্থ হইয়াছে। ইহারই নাম—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, ইহাতেই নিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে নিষ্ঠা না থাকিলে কখন ভোগের, কখনও বা নাস্তিকতাময় ত্যাগের পাদগোলক হইয়া পড়িতে হইবে। "আমি হরিসেবকগণের জুতাবরদার,"—এই প্রতিষ্ঠা যাহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহারা অন্যান্য অনর্থ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হরিসেবার অনুকূল অভিমানকেও অনর্থের অন্যতম মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহারা কখনও সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত হরিসেবাকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বরণ করিতে পারে নাই। এইজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমকল্পবৃক্ষের মালাকাররূপে বলিয়াছেন,—

"অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে **পুণ্যখ্যাতি।**"
সুখী হইয়া লোকে মোর **গাহিবেক কীর্ত্তি॥**"

(চৈঃ চঃ আ ৯।৩৯-৪০)

আবার শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে শুনিতে পাই,—

"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ **বড় কীর্ত্তি ?**
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় **খ্যাতি।**"

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৫)

কৃষ্ণের সেবকাভিমানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশোগৌরব। বৈষ্ণবের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা অনুগমন করে বলিয়া তাহাকে অনিত্য বা মায়িক বৈভব মনে করিতে হইবে না—

"বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের বৈভব ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥"

(চৈঃ চঃ ম ৪।১৪৬-১৪৭)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণসেবার ছলনায় বা প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা-আহরণের কোন অন্তর্নিহিত কপট চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই; কাজেই যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা-আহরণেরই অভিসন্ধি লইয়া ভাবের ঘরে চুরি করিয়া থাকেন। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন,—

"কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানিব ॥

তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তা'র সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব॥"

জড় প্রতিষ্ঠাশা মৎসরতার জন্মভূমি। পরের উৎকর্ষ বা উন্নতি যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহারাই মৎসর। অপরের উন্নতি হইলে—অপরের প্রতিষ্ঠা হইলে পাছে নিজের আপেক্ষিক জড়প্রতিষ্ঠার পরিমাণটুকু ম্লান হইয়া পড়ে, এইজন্য আমরা পরের ভাল শুনিতে পারি না। আর্থিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, পারমার্থিক-রাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও অপরের পারমার্থিক উন্নতির কথা শুনিলে কাহারও কাহারও বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হয়। যখনই কাহারও এইরূপ চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তখনই জানিতে হইবে,—তাহার হৃদয়ে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই, হৃদয় জড়-প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। কারণ, ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম পরম নির্ম্মৎসর সাধুদিগেরই ধর্ম্ম। যেখানে এক গুরুভ্রাতা আর এক গুরুভ্রাতার পারমার্থিক উন্নতি কিম্বা হরি-গুরুসেবায় অধিকতর নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হইবার পরিবর্ত্তে ব্যথিত ও ম্লান হইয়া পড়েন, সেইখানে জানিতে হইবে জড়প্রতিষ্ঠাশা-পিশাচী ধৃষ্টা শ্বপচরমণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাই মনঃশিক্ষায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।

সদা তং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥”

—:॰:—

নিত্যসিদ্ধ

পারমার্থিক সাহিত্যে ‘নিত্যসিদ্ধ’-শব্দটির প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১২) নিত্যসিদ্ধভক্তের অর্থ বা পর্য্যায় শব্দ দিয়াছেন—**‘পার্ষদভক্ত’, ‘দিব্যসূরি’**। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের দ্রাবিড়ী ‘আঢ়্বর্’ বা ‘আল্বর্’ শব্দেও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত বুঝায়। এই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ‘বিধিভক্ত’ ও ‘রাগভক্ত’ ভেদে দ্বিবিধ। আবার নিত্যসিদ্ধ বিধিভক্ত ও নিত্যসিদ্ধ রাগভক্ত প্রত্যেকে—‘দাস’, ‘সখা’, ‘গুরু’ ও ‘কান্তা’ ভেদে চতুর্ব্বিধ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

“* * নিত্যসিদ্ধ—পারিষদ, ‘দাস’।
‘সখা’, ‘গুরু’, ‘কান্তাগণ’,—চারিবিধ প্রকাশ ॥”
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৮৩)

—এই পদের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। পারিষদগণই নিত্যসিদ্ধ। **বলদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবগণ—নিত্যসিদ্ধ; তাঁহারা গুরু,** তাঁহাদিগকে অসূয়াপরবশ হইয়া জীব

মনে করা অপরাধ। দ্বাদশ-গোপালাদি যাঁহারা বলদেবের গণ, তাঁহারা জীব নহেন—**তাঁহারা বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ।**

'বদ্ধ', 'তটস্থ' ও 'মুক্ত' পরস্পর পৃথক্। স্বরূপে তটস্থভাব সুপ্তভাবে থাকিলেও বদ্ধজীব তটস্থ নহে, মায়াকবলিত হইয়া গিয়াছে, অতএব বদ্ধ; মুক্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ তটস্থাভাবশূন্যতা, তাঁহারা সতত ভগবৎসেবারত।

শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে 'নিত্যমুক্ত', 'নিত্য-উন্মুখ', 'কৃষ্ণপার্ষদ' আর তদ্বিপরীত 'নিত্যবদ্ধ', 'নিত্যবহির্ম্মুখ', বা 'নিত্যসংসার' জীবের ভেদ বর্ণিত আছে।

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১১-১২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়া-সম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া কৃষ্ণপারিষদনামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবাসুখই তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীব-সকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারের স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষের জন্য মায়াপিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে বড়ই জর্জ্জরিত

করে; তাহারা কাম-ক্রোধাদি ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়া-পিশাচীর লাথি খাইতে থাকে।”

শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে (চৈঃ চঃ অ ৫।৪৫) লিখিয়াছেন,—“যিনি শ্রীরূপের অপ্রাকৃতভাবানুসারে সর্ব্বক্ষণই শুদ্ধ অকৃত্রিম রাগবিশিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ফল-প্রাপ্তি প্রাকৃত-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, অথবা তাঁহার সিদ্ধপ্রায় শরীর লোকলোচনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপ-সিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণসেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠান-হেতু অপ্রাকৃত-চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহার শরীর সিদ্ধ-প্রায় অপ্রাকৃত।”

নির্ব্বিশেষ ধারণা সাধারণ বহির্ম্মুখ জীবমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ। যাঁহারা সেই নির্ব্বিশেষ-ধাতুগ্রস্ত, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ-সম্বন্ধে অনেক প্রকার কল্পনা-জল্পনা পোষণ করিয়া থাকেন। কেহ মনে করেন,—নিত্যসিদ্ধ হইলে তাঁহার বুঝি দশমুণ্ড বিশ হাত বাহির হইবে; কেহ মনে করেন,—নিত্যসিদ্ধপুরুষ ‘সর্ব্বদা ভাবে ডগমগ হইয়া হেলিতে-দুলিতে থাকিবেন’। নির্ব্বিশেষ সমন্বয়বাদিগণের আখড়ায় নিত্যসিদ্ধের যে-সকল সংজ্ঞা শুনিয়াছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহাতে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যাহার হাতে টাকা দিলে হাত বাঁকিয়া যাইবে, কিংবা যাহার জিহ্বায় শর্করা দিলে কর্পূরের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, কিংবা যিনি নির্জ্জন কান্তারে একাকিনী ষোড়শী যুবতীকে দেখিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন, অথবা যিনি সর্ব্বদা বুঁদ হইয়া

বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার অভিনয় দেখাইতে পারেন, যিনি উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে পারেন, যিনি বালকের মত বা পাগলের মত হাবভাবের অভিনয় দেখাইতে পারেন, তিনিই নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণশোভা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের বাণী, চরিত্র ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ-সরস্বতীর উপদেশাবলী শ্রবণের পর "নিত্যসিদ্ধ"-সম্বন্ধে এইরূপ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধময় ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগবরগণের উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে, নিত্যসিদ্ধ অধোক্ষজ-ভক্তিতে, নিত্য-সিদ্ধ অপ্রাকৃত সেবাতে যাঁহারা নিত্য উন্মুখ, তাহা হইতে যাঁহাদের কোন দিনই পতন ঘটে নাই, যাঁহারা অপতিত-চরিত্র, যাঁহারা কোনদিনই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভোগে লুব্ধ হইয়া পতিত হন নাই, যাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি-কামনার খাজাঞ্চিগিরি করাইয়া লইবার কোনপ্রকার চেষ্টায় মুগ্ধ হন নাই, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যবদ্ধ সংসারতাপে অত্যন্ত তপ্ত হইয়া কখনও কখনও সদ্গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ থাকে। তাঁহারা কখনও কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-দ্বারা লুব্ধ হন, কখনও বা অন্যাভিলাষিতাযুক্ত মিছা-ভক্তিকেই 'ভক্তি' মনে করেন, কখনও নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ করেন, কখনও আশ্রয়-বিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন, কখনও বা

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবিচারের অনুগমন করেন, কখনও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করিয়া ফেলেন, কখনও বিপ্রলিপ্সার বশীভূত হন, কখনও আবার হরিসেবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হন, কখনও বা অকৃত্রিম গুরুবৈষ্ণবের অকপট আনুগত্য করিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার মুখে ছাই পড়িবে ভাবিয়া গুরুবৈষ্ণব-নিন্দক হইয়া পড়েন ; কিন্তু নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধের স্বভাব তাহা নহে। তিনি নিত্যকাল শ্রীরূপের জীবনস্বরূপ অপ্রাকৃত শ্রীনাম-প্রভুর দ্বারা নিয়মিত, নিত্য আশ্রয় সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত, ভ্রমক্রমেও আশ্রয় বা বিষয়-বিগ্রহের নিকট হইতে ভুক্তি-মুক্তি লাভের জন্য লালায়িত নহেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে জীবন্মুক্তের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাতে প্রকাশিত—

"ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৮৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—"দাস্যে নিমিত্তে ঈহা দাসো ভবানীতি স্পৃহেত্যর্থঃ" অর্থাৎ দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা শ্রীহরির সেবার জন্য অর্থাৎ 'আমি যেন তাঁহার দাস হইতে পারি'—সকল অবস্থাতেই যাঁহার এইরূপ চেষ্টা বা স্পৃহা, তাঁহাকেই 'জীবন্মুক্ত' বলা হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কৃষ্ণভক্তপ্রকরণে সাধক ও সিদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে—কৃষ্ণসেবা-ভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণকে

'কৃষ্ণভক্ত' বলা যায় "তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ।" —(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৪২)। সেই 'কৃষ্ণভক্ত' সাধক ও সিদ্ধভেদে দ্বিবিধ। সাধকের লক্ষণ এইরূপ—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৪৪)

যাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিঘ্ন নিবৃত্তি হয় নাই. অথচ যাঁহারা আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের প্রতি অপরাধী নহেন বলিয়া কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারাই 'সাধক' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উদাহরণস্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু বিল্বমঙ্গলের নাম উদ্ধার করিয়াছেন—"বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।" —(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৪৫)। যাঁহারা বিল্বমঙ্গল-তুল্য, তাঁহারাই সাধক। বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্ব ইতিহাসে জড়-কামাদিতে অভিনিবেশ ও অন্য সময় ভোগের প্রতি বিরক্তিতে ত্যাগ-প্রধান অদ্বৈতবাদে আসক্তি হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি প্রাকৃত-চিন্তামণির সঙ্গবিলাস ও অদ্বৈতবীথি পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবারসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে পরিমুক্ত হইয়া একান্ত ভগবৎ-পাদপদ্মাশ্রিত হইলেন. যখন তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণকারিণী বাণীর সেবক, তখন তাঁহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে বিকাশিত। জগদ্গুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্যগণ তখন আর বিল্ব-

মঙ্গলকে সাধক বা সাধনসিদ্ধ বিচার করেন না, নিত্যসিদ্ধ বলিয়াই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে 'কর্ণামৃত' অনুক্ষণ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ জনগণের সহিত আস্বাদন করিতেন, যাঁহার বাণী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের কর্ণরসায়নস্বরূপ এবং পরমমুক্তকুলের একমাত্র ভজনের বস্তু, সেই কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখককে সাধক বা সাধনসিদ্ধ-বিচার শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ বা শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ করেন না। শ্রীরূপের বিল্বমঙ্গলকে সাধকের দৃষ্টান্তে প্রদর্শন বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্ব-ইতিহাস-বিচারে। যখন বিল্বমঙ্গলে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ বিকশিত, তখন তিনি জগদ্‌গুরু আচার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধিলাভের পর অর্থাৎ লব্ধসিদ্ধি ভগবদ্ভক্তের প্রতি সাধন বা সাধকত্বের অথবা কোনপ্রকার পূর্ব্ব অনর্থ বা প্রাকৃতত্বের আরোপ —নগ্নমাতৃক-ন্যায়ানুসারে অবৈধ ও অপরাধজনক।

আত্মা—যাহা কৃষ্ণভজন করেন, যাঁহাতে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে সাধক বা সিদ্ধ বলা যায় না। আত্মাতে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বদাই অনুস্যূত আছে, শ্রবণাদি-দ্বারা তাহার প্রাকট্য-বিধানই সাধন—

"নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ (চৈঃ চঃ ম ২২।১০৪)
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২)

সাধ্য ভাবভক্তি যখন ইন্দ্রিয়-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-

ভক্তি' বলে। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা।

চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ বা নির্ব্বিশেষবাদিগণ কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণ-প্রেমকে আত্মার নিত্যসিদ্ধ অবস্থা বিচার করেন না। তাই তাঁহারা বলেন,—যথাক্রমে নৈকষ্যকুলীন ও ভঙ্গের মত নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পুরুষ। কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার বা দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে না। আত্মায় নিত্যাসদ্ধ ভক্তিবৃত্তি উদিত হইলেই তিনি নিত্যসিদ্ধরূপে প্রকাশিত। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের আদি-গুরু শ্রীনারদ পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্র ছিলেন বা তাঁহার সাধনাভিনয়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৬।২১-২৭) শুনা যায় বলিয়া শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়ের পূর্ব্বগুরু সাধনসিদ্ধ, তিনি নিত্যসিদ্ধ নহেন বা শ্রীব্যাসদেবের চিত্তে পূর্ব্বে অশান্ত ভাব ছিল, তিনি শ্রীনারদের কৃপা লাভপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে সাধন করিবার পর ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্যাসদেব সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন, কিংবা শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম "দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে, ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া" প্রভৃতি দৈন্যময় বাক্য বলিয়াছেন, অথবা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, আচার্য্যের কার্য্য করিবার কালেও তাঁহার সন্তান-সন্ততি হইয়াছে বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ নহেন—এইরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদী ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণে দৃষ্ট হয়। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহারও আত্মবৃত্তিতে অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদির

আবরণ-রহিত হইয়া প্রকাশিত হইলে অপর অনর্থমুক্ত পুরুষগণ সেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তের স্বরূপের পূর্ণপরিচয় পাইতে পারেন, অপরে নহে! অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ নিত্যসিদ্ধের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূর্ণ নিত্যসিদ্ধত্ব দর্শন করিতে পারেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্র-পুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। রূপকবিরাজ ও প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ - প্রতীপ দল শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ দর্শন করিতে পারে নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু সিদ্ধের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া সিদ্ধের মধ্যেও বিচিত্রতা নির্ণয় করিয়াছেন—

"অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১।৪৬)

যাঁহাদের নিকট অখিল ক্লেশ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ যাঁহারা অখিল জাগতিক ক্লেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও শ্রীহরিপাদপদ্মসেবা হইতে বিচ্যুত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণাশ্রিত কর্ম্মতৎপর অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে প্রেমসৌখ্যাদির আস্বাদ-পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধ। এই সিদ্ধ দুইপ্রকার—(১) সংপ্রাপ্তসিদ্ধ ও (২) নিত্যসিদ্ধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধ আবার দুই প্রকার— সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ। **সাধনসিদ্ধের** উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু

মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন ; আর যজ্ঞপত্নী, বিরোচন-নন্দন **বলি ও শুকদেব** প্রভৃতিকে কৃপা-সিদ্ধের আদর্শ বলিয়াছেন।

সাধনসিদ্ধগণ গুরুকুলে বাস, আত্মবিচার, শৌচাচার, সন্ধ্যা-উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন ; আর যাঁহারা গুরুকুলে বাস না করিয়াও, সাধনবিধিতে বিন্দুমাত্র যত্ন না করিয়াও যজ্ঞপত্নী, বলি বা শুকদেবের ন্যায় কেবল মুকুন্দচরণপদ্মের প্রেমসুধাপ্রবাহের দ্বারা চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কৃপাসিদ্ধ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৪৮-১৪৯)। শুকদেবও কিন্তু নিত্যসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হন নাই !

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু নিত্যসিদ্ধের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

> "আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
> নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥"
>
> (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৫০)

যাঁহাদের গুণাবলী মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দস্বরূপ এবং যাঁহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেমবিধান করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ।

উদাহরণস্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু **যাদব** ও **গোপ-সকলকে 'নিত্যসিদ্ধ'** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা স্বেচ্ছায় ভগবানের সহিত ভগবানের লীলার সহায়তার জন্য আবির্ভূত হন ও ভগবানের সহিতই নিত্যধামে গমন করেন। ইঁহাদের জন্ম-মৃত্যু বা কর্ম্মবন্ধন নাই। তবে যে ইঁহাদের জন্মাদির

কথা শুনা যায় বা আধ্যক্ষিকগণের দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবানের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪৫ সংখ্যা)।

যাদব ও গোপাদি প্রকট ও অপ্রকট—উভয়লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ নিজ-জন ও নিত্যসিদ্ধ সেবক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইয়াও কেন যাদবগণ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, গোপগণ কালীয়-হ্রদের বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীবসুদেব, শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব মহাশয় সমাগত মুনিদিগের নিকট সংসার-নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যা) বলিতেছেন,—

"তদেবমুভয়েষামপি নিত্যপার্ষদত্বে সিদ্ধে, যত্তু শস্ত্রাঘাতক্ষত-বিষপানমূর্চ্ছাতত্ত্ববুভুৎসাসংসারনিস্তারোপদেশাস্পদত্বাদিকং শ্রূয়তে, তদ্ভগবত ইব নরলীলোপয়িকতয়া প্রাপঞ্চিকমিতি মন্তব্যম।"

তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ভগবান্ নরলীলার উপযোগী নানাবিধ মনুষ্য-চেষ্টা করেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপাদি নিত্যপার্ষদ-গণও কেবল নরলীলার উপযোগিরূপেই মনুষ্য-চেষ্টা বিস্তার করিয়া থাকেন।

এইখানে পুনরায় সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের সাধারণ মনুষ্যের মতই রাগাদি দেখা যায়, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের নিত্যপরিকর হইতে পারেন?—

"নন্বেষাং মনুষ্যান্তরবৎ রাগাদিকং দৃশ্যতে, কথং তর্হি স্বয়ং ভগবতো নিত্যপরিকরত্বং, তত্র কৈমুত্যেনাহ—তাবদ্রাগাদয় ইত্যাদি। স্তেনাঃ পুরুষসারহরাঃ। অন্যেষাং প্রাকৃতজনানামপি তাবদেব রাগাদয়শ্চৌরাদয়ো ভবন্তি, যাবত্তে জনাস্তে তব ন ভবন্তি সর্ব্বতোভাবেন ত্বয্যাত্মানং ন সমর্পয়ন্তি। সমর্পিতে চাত্মনি তেষাং রাগাদয়োঽপি ত্বন্নিষ্ঠা এবেতি রাগাদীনাং প্রাকৃতত্বাভাবান্ন চৌরাদিত্বং প্রত্যুত পরমানন্দরূপত্বমেবেত্যর্থঃ। তথৈব প্রার্থিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন—যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ইতি। অতো যদি সাধকানামেবং বার্ত্তা তদা কিং বক্তব্যং, নিত্যমেব তাদৃশপ্রিয়ত্বেন সতাং শ্রীগোকুলবাসিনামেবমিতি। ইত্থমেবোক্তম—ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা। কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনামিতি।"

—(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪২-১৪৩)

তাৎপর্য্য—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন,—ব্রজবাসিগণের যদি সাধারণ মনুষ্যগণের ন্যায় রাগাদিই দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপে স্বয়ং ভগবানের নিত্যপরিকর হইতে পারেন? তদুত্তরে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে বলিতেছেন,—

"তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৩৪)

হে কৃষ্ণ, যে পর্য্যন্ত জীব আপনাতে আত্মসমর্পণ না করে, সেইকাল পর্য্যন্তই রাগাদি—তস্করস্বরূপ, ততদিনই গৃহ—কারাগার-

স্বরূপ এবং মোহ—পদশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া থাকে। অন্য প্রাকৃত-জন-সম্বন্ধে রাগাদি ততদিনই চৌরাদিসদৃশ কার্য্য করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা আপনার না হয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আপনাতে আত্মসমর্পণ না করে। যাঁহারা আপনাতে আত্মসমর্পণ করেন, আপনার সম্বন্ধেই তাঁহাদের রাগাদি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাঁহাদের সেই রাগাদি প্রাকৃত অর্থাৎ নিজভোগ্য নহে বলিয়া চোরের ন্যায় পুরুষের ধৈর্য্যাদি হরণকারী নহে, প্রত্যুত পরমানন্দ-স্বরূপ; এই জন্যই শ্রীল প্রহ্লাদ সেইরূপ রাগাদিরই প্রার্থনা করিয়াছেন। অবিবেকিগণের মায়িক-বিষয়ে যেরূপ অনপায়িনী (অবিনাশিনী) প্রীতি, আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন নিরন্তর তোমার অনুস্মরণকালে তিরোহিত না হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী সাধকগণের সম্বন্ধেই যখন এইরূপ বার্ত্তা পাওয়া যায়, তখন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় প্রিয়রূপে বিরাজ-মান, সেই গোকুলবাসিগণের কথা আর কি? এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, নন্দাদি ব্রজগোপগণ কৃষ্ণ-বলরামের কথা পরমানন্দ-ভরে আলোচনা করিয়া এবং তাহাতে স্বাভাবিক প্রীতিশীল হইয়া ভববেদনা জানেন নাই।

নিত্যসিদ্ধগণের মুখ্য লক্ষণ এই যে, তাঁহারা **আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি অপেক্ষা কৃষ্ণে কোটিগুণ অধিক প্রেম বিধান করেন** এবং **কৃষ্ণের তুল্যধর্ম্মতা** তাঁহাদিগের মধ্যে স্বাভাবিক। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর ন্যায় তদনুগ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যা) নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের স্বরূপ

লক্ষণের কথা জানাইয়াছেন,—

"অন্তরঙ্গানাং ভগবৎসাধারণ্যন্তু যাদবানুদ্দিশ্যোক্তম্—মত্তুল্যগুণশালিন ইতি।"

অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের তুল্যধর্ম্মতা যাদবগণের উদ্দেশ্যে পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—ইঁহারা আমার ন্যায় গুণশালী।

"যুক্তঞ্চৈষাং তৎসাদৃশ্যং, তস্মাদাত্মতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ পরস্য মায়াধিপতেঃ মহাত্মনঃ প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরাশ্চরন্তি তদ্রূপ-গুণস্বভাবাঃ ইতি। শ্রীযমবাক্যাদ্যনুগতত্বাৎ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১১৭ সংখ্যা)

অর্থাৎ গোপগণের শ্রীকৃষ্ণসাদৃশ্য সমীচীন বটে; যেহেতু ধর্ম্মরাজ যম নিজ-দূতগণকে বলিতেছেন (ভাঃ ৬।৩।১৭)—সম্পূর্ণ স্বাধীন, সকলের অধীশ্বর মায়াধীশ মহাত্মা পরমপুরুষ শ্রীহরির রূপ, গুণ ও স্বভাবাদি যেরূপ, তাঁহার মনোহর অনুচরদিগের স্বভাবাদিও সেইরূপ। তাঁহারা লোকমঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

বাঙ্গলা ১৩৩২ সালে ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার যখন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহার শ্রীচরণকমল-প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট হইতে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার বিবৃতি শ্রবণ করিবার ও লিখিয়া লইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তখন তাঁহার এই অতি নির্ঘৃণ্য কিঙ্করাভাস—

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।"

—এই পদটিতে 'নিত্যসিদ্ধ' শব্দের তাৎপর্য্য জানিবার জন্য কএকটি পরিপ্রশ্ন করিয়াছিল। তাহা গৌড়ীয়ের ৪র্থ বর্ষ ৪:শ সংখ্যায় "শ্রীল ঠাকুরের কীর্ত্তন "শীর্ষক স্তম্ভে প্রকাশিত আছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক এই পরিপ্রশ্নসমূহের যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথভাবে তখনই লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সংশোধন করাইয়া পরে "গৌড়ীয়ে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৭ম ও ৮ম পৃষ্ঠা হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল—

পরিপ্রশ্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি? যদি থাকেন, তাঁহারা কে?

প্রভুপাদের উত্তর—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যিনি পূর্ব্বে কর্ম্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন (গৌ: গ: ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য – যিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌ: গ: ৭৫), তাঁহাদিগকে 'সাধনসিদ্ধ' বলা যায়। **প্রভুপার্ষদ বিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে বিদ্ধ-দর্শনে 'সাধন-সিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।**

পরিপ্রশ্ন—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব? তাঁহাকে ত' কেহ কেহ 'ব্রহ্মা' বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ?

প্রভুপাদের উত্তর—ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ঋচিক্‌মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই ঠাকুর হরিদাস। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীল মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনি-পুত্র তুলসীপত্র আহরণ পূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। **যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ;** আর **যাঁহারা পূর্ব্বে বহির্ম্মুখ হইলেও ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পরে সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ।** প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণচরণে নিত্য উন্মুখ।

পরিপ্রশ্ন—জগাই মাধাই কি সাধনসিদ্ধ? —অথবা নিত্যসিদ্ধ?

প্রভুপাদের উত্তর—**জয়-বিজয়ই** গৌরাবতারে জগাই-মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন (গৌঃ গঃ ১১৫)। **তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।**

পরিপ্রশ্ন—ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, **নিত্যসিদ্ধ** করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।"

—এই স্থলে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলিতে কাঁহাদের বুঝিব?

প্রভুপাদের উত্তর—**যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভ-**

ভাবের সহায়ক, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। যাঁহারা গৌরমনোঽভীষ্টের পরিপূরণকারী, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণদেশে প্রচারকালে গ্রামকে গ্রাম সকল লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলা যাইতে পারে? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'ভক্ত' হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে পার্ষদ। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী, কারণ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত—মহাপ্রভুর হৃদ্‌গতভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভ-ভাবের পরিপোষ্টা; সুতরাং ঠাকুর মহাশয় 'নিত্যসিদ্ধ'।

—:*:—

আম্নায় ও আচার্য

'আম্নায়'-শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়াষ্টমাধস্তন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপভাবে জানাইয়াছেন,—

"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥"

বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যানাম্নী শ্রুতি-সকলকে আম্নায় বলা যায়। যথা মুণ্ডকে (১।১।১, ।২ ১৩)—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম॥"

বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০—

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃসাম-বেদাথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥"

মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে— রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে— শ্রীমদ্

ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। উপনিষৎ-শব্দে – ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক-শব্দে – ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্র-শব্দে – প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্য-কৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্রসম্বন্ধে আচার্য্যগণ কৃত ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা। এই সমস্তই 'আম্নায়'-শব্দে কথিত। **'আম্নায়'-শব্দের মুখ্যার্থ – বেদ।**

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।"

* * *

"যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদিত্যে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ-ভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। **সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা।** প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টি-সময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন

হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থদ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব. যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছেন।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম—আম্নায় (আ-ম্না-ঘঞ)। যে সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ড-মত প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর, ইহাতে সন্দেহ কি? সে যাহা হউক, সমস্ত ভাগ্যবান্ লোকেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আপ্তবাক্যরূপ আম্নায়-কেই প্রমাণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম শিক্ষা।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রদর্শিত প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায়,—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে, সেই বাণীর নাম—আম্নায়।"

যাঁহারা সেই আম্নায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তানুসারে পাষণ্ডমত-প্রচারক। 'কলির গুপ্তচর' কথাটি ব্যবহার করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার সত্ত্বেও আম্নায়ের অবিচ্ছিন্নত্ব অস্বীকার যে কিরূপ নাস্তিক্য-বিচার, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। **যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু,** ইহাতে আর সন্দেহ কি ?"

অতএব আম্নায় বা গুরু-প্রণালীর নিত্যত্ব নির্ব্বিশেষবাদী ব্যতীত ভক্তিপথের পথিকগণ সকলেই স্বীকার করিবেন। এই **আম্নায় বা গুরু-প্রণালী রক্ষা করাই আচার্য্যের একমাত্র কার্য্য।** ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—"গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধাবাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম—আম্নায়।" **সম্প্রদায় রক্ষা বা ভগবদ্ধর্ম-রক্ষা একমাত্র বিশুদ্ধাবাণী বা আম্নায় রক্ষার দ্বারাই হইয়া থাকে।** এইজন্য আচার্য্যের আর একটি নাম—ভগবদ্ধর্ম্ম-সংরক্ষক বা সম্প্রদায়-সংরক্ষক। যাঁহারা শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মের বাণীকে অনাবৃত ও নির্ম্মলভাবে সংরক্ষণ করিতে পারেন, তাঁহারাই আচার্য্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা'র ৪র্থ খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

'আচার্য্য শব্দের অর্থ কি?—যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব-লাভ হয় না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থসকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

"ভক্তগণ তিনপ্রকার অর্থাৎ আচার-প্রধান-ভক্ত, প্রচার-প্রধান ভক্ত ও আচার-প্রচার-প্রধান ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচার-প্রধান ভক্ত—মধ্যম; কেবল প্রচার-প্রধান ভক্ত—কনিষ্ঠ। সাধুগণের ধর্ম্ম-আচরণের নাম—আচার। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য লোকের নিকট প্রচার করার নাম—প্রচার। আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুগণের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে।"—(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রচারকগণকে আরও

বলিয়াছেন—"**দুষ্টমতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত্ত ও তঞ্চক লোকের সহিত যদি মনোবাদ হয়, তাহাও শ্রীমহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন।** মনুষ্যদেহ দুর্ল্লভ। ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। **নিঃস্বার্থ না হইলে আচার্য্যাসন-প্রাপ্তির অধিকার হয় না।**"

—(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সম্বন্ধে ঢাকা হইতে ষোল বৎসর পূর্ব্বে "আচার ও আচার্য্য" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ আচার্য্য-সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। ইহাতে সামাজিক সম্মানই আচার্য্যের আচার্য্যত্বের নিদর্শন নহে, পরন্তু নিরপেক্ষ সদাচারই আচার্যত্বের পরিচায়ক—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে:—

"**প্রভুর সন্তান** বলিয়া **মাননীয় হইলেও পরমার্থ-বিরোধী** হওয়ায় তাঁহাদিগকে **শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্যরূপে গ্রহণ করেন নাই।** তাঁহারা কেহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, কেহ বা পঞ্চোপাসনামূলে অপরাধী বা মায়াবাদী। শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যগণের নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় বা বাউল আখ্যা চলিয়া আসিয়াছে। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতুম পেঁচার নক্সা"য় "কাঁধে বাড়ী বলরামে"র "গুরুপ্রসাদীমত" প্রভু-সন্তানে আবদ্ধ ছিল দেখা যায়। * * শ্রীশাক্যসিংহ গৌতম— বিষ্ণুবস্তু, বীরভদ্র প্রভুও বিষ্ণুবস্তু। ইঁহাদের শুদ্ধভক্তি হইতে

যদি কেহ বিরুদ্ধ মত পাইয়া থাকেন, তাহা পারমার্থিক-সমাজে
সম্মানের বস্তু হইলেও আদরের বা গ্রহণের বস্তু নহে।
নেড়া-বাউল সম্প্রদায়ে বীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিয়া অথবা তদ্-
বংশজাত পরিচয়ে যে-সকল উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে,
তদ্দ্বারা আচার্য্য বা বিষ্ণুবস্তুর ক্ষতির কথা হয় না।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে বলিয়াছেন—
"ভগবান যখন উপদেশকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্য-
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি আচার্য্য-নামে অভিহিত।
উপদেশক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার
সহিত শিষ্য বা শিক্ষার্থী আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া
তাঁহার সহিত অসূয়া বা স্পর্দ্ধা করিতে গেলে শিক্ষার্থী
শিষ্যের শিক্ষকের প্রতি আস্থা না থাকায় ব্রত-সাফল্যের
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের জন্য আশ্রয়-
জাতীয় ভগবদ্‌বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তদ্বস্তুজ্ঞানে বিধিমত পূজা
করিবে। তাঁহাকে বিষয়জাতীয় ভগবান্ বলিয়া বিচার করিবার
পরিবর্ত্তে বিষয়জাতীয় বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে সেবনকারী আশ্রয়-
জাতীয় তদ্বস্তু বলিয়া জানিতে হইবে।"—(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন,—

"প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥

লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি'॥
এই শিক্ষা সবাকারে. সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥"
(চৈঃ চঃ আ ১২।৫০-৫৩)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত পদ্যাবলীর অমৃতপ্রবাহভাষ্যে বলিয়াছেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয়। চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি অভাবে জীবন বিফল হয়। সকল লোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ আচার্য্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থ লইয়া যাঁহারা নামোপদেশকের কার্য্য করেন, তাঁহারা নামোপদেশের যোগ্য নহেন, বরং অপরাধী। এইরূপ কার্য্য করিলে তাঁহাদের লোকলজ্জা ও ধর্ম্মকীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয়।"

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ" (ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১) প্রভৃতি শ্লোকে "অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ। বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ" বাক্যে দ্যূত, মদ্যাদি সেবন, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রী-আসক্তি, জীবহিংসা ও কনক এবং কনক হইতেই জাত মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজন্য কাম, রজোমূলা হিংসা ও শত্রুতা—এই সকল কলিস্থান আত্মোন্নতিকামী পুরুষের, বিশেষতঃ লোকশিক্ষক আচার্য্যের পক্ষে সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আচার্য্যের লক্ষণ শ্রীব্যাসদেব ও তদনুগত শ্রীমধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"পঞ্চরাত্র-প্রবুদ্ধস্তু সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ॥
স এবাচার্য্যস্তু জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্ বদামি তে॥"

—(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

"আচার্য্যস্তু ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
শৌচাচার-পরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ॥"

—(মাৎস্য)

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

—(বায়ুপুরাণ)

তাৎপর্য্য—যিনি পঞ্চরাত্র-বিষয়ক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ এবং যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তার্থের তত্ত্ববিৎ, তিনি অন্যান্য সমস্ত লক্ষণহীন হইলেও বিশেষরূপে আচার্য্য বলিয়া গণিত হইবেন। যাঁহার বিষ্ণুতে পরাভক্তি, বিষ্ণুর ন্যায় গুরুতেও পরাভক্তি, তাঁহাকেই 'আচার্য্য' বলিয়া জানিতে হইবে, ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি। আচার্য্য নিত্যকালই সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত, নিত্যশৌচাচারবিশিষ্ট ও পাষণ্ডকুলের প্রতি উদাসীন অর্থাৎ তাহাদের চীৎকারে ও অপ-চেষ্টায় সত্য হইতে অবিচলিত। যিনি শাস্ত্রের অর্থসমূহ সম্যগ্-রূপে মন্থন করিয়া সকলকে আচারে স্থাপন করাইবার চেষ্টা করেন

এবং স্বয়ং সেই সকল আচরণ করেন, তিনিই আচার্য্য-নামে কীর্ত্তিত হন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীভগবান্‌ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদ্ আচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবা বিমুখ হইয়া আচার্য্যাভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বৈরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্য ভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব সেব্যের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।"

আচার্য্যত্ব মূল আশ্রয়বিগ্রহের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত একটি স্বত সিদ্ধ ব্যাপারবিশেষ। আচার্য্যকে কেহ গঠন, সংশোধন, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। গুরু বা আচার্য্যের শিষ্যাভিমানি-মাত্রেই সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্য হইতে পারেন না। আচার্য্যত্বের যে-সকল নিত্যসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তিনি কৃষ্ণেচ্ছায় প্রকাশ করিলেই একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ আচার্য্য কৃপায় আচার্য্যের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। যুগে যুগে যে-সকল শুদ্ধভক্তিকথা আচার ও প্রচারকারী কৃষ্ণশক্তিস্বরূপ

আচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া অনেকে আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ভোগ-বুদ্ধিবশতঃ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আচার্য্য-পাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আচার্য্যের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট অপ্রাকৃত ভজনশীল পুরুষ বিশেষে পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচার্য্যত্ব প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বহ্বয়নশাখী না হইয়া একায়নস্কন্ধী সেই আচার্য্যের অনুগত হইয়াছেন, তাঁহারাই 'আচার্য্যের গণ', 'মহাভাগবত' ও 'আচার্য্য-কৃপাভাজন' হইয়া অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বহু শিষ্য থাকিলেও যাঁহারা একমাত্র আচার্য্যের চিত্তবৃত্তির সহিত একতাৎ-পর্য্যপর, একমাত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'আচার্য্যের গণ' ও মহাভাগবত হইতে পারিয়াছেন। স্বতন্ত্র হইয়া স্বমত-কল্পনাকারী ব্যক্তিগণের আচার্য্যত্ব নাই এবং তাঁহারা আচার্য্যের গণ বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারেন না, তাঁহারা অসার। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত॥
সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮-১০, ৭৩-৭৪)

—*—

উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে ছয়টি অনুকূল-বিষয়-গ্রহণ এবং ছয়টি প্রতিকূল-বিষয়-পরিত্যাগের বিধি উপদেশ করিয়াছেন। অনুকূল ছয়টি বিষয়ের প্রথম তিনটি দ্বারা ভক্তির অন্বয়-অনুশীলনের ব্যবস্থা এবং শেষ তিনটি দ্বারা ভক্ত-জীবনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। উৎসাহ, নিশ্চয় এবং ধৈর্য্য – এই তিনটি ভক্তি-অনুশীলনের অনুকূল ক্রিয়া।

ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য, আদরের সহিত ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুশীলনই উৎসাহ। 'কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা শত বৎসর পরে বা কোন জন্ম-জন্মান্তরে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার পাদপদ্ম কখনই ছাড়িব না"—এইরূপ সঙ্কল্পই ধৈর্য্য। ফলের আশা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সহিষ্ণু চিত্তে

অপতিতভাবে ভজনাঙ্গ সমূহের অনুশীলন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়।

উৎসাহ ভজনের প্রাণ। ভক্তি-যাজনের প্রথম হইতেই অনুশীলনকারীর শ্রদ্ধা উৎসাহময়ী হওয়া প্রয়োজন। উৎসাহ প্রমাদ বা অনবধানরূপ অনর্থ দূর করিয়া ভজনে নৈরন্তর্য আনয়ন করে। আবার উৎসাহ থাকা যেমন প্রয়োজন ধৈর্য্য থাকাও সেইরূপ বিশেষ প্রয়োজন। ধৈর্য্য না থাকিলে ফল-লাভের আশা ক্রমশ দুরাশা হইয়া উঠে।

আমাদের এইরূপ একটি প্রশ্ন সহসাই মনে জাগে যে উৎসাহ ও ধৈর্য্য একই সময় অধিক দিন কি থাকিতে পারে? উৎসাহ ঔৎসুক্য, ব্যগ্রতা, কর্ম্মব্যস্ততা আনয়ন করে। ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব বেশী থাকিলেই উৎসাহ আসে। কিন্তু ধৈর্য্য তাহার বিপরীত। যেখানে ফলপ্রাপ্তি বিলম্বে ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইখানেই ধৈর্য্যের কথা বলিয়াছেন। ফল যদি নিকটবর্ত্তী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উৎসাহ থাকে না। ধৈর্য্যে ব্যগ্রতা নাই, ব্যস্ততা নাই; উহাতে শান্তভাব আছে। সুতরাং ধৈর্য্য ও উৎসাহ অধিক দিন একস্থানে কি করিয়া থাকিতে পারে?

এখানে আমরা একটি ভুল করি। উৎসাহ বলিতে কর্ম্ম-তৎপরতা এবং ধৈর্য্য বলিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া বুঝায় না। বহির্ম্মুখ জনগণ স্বীয় অপার্থক অভিলাষ সিদ্ধির আশায় উৎফুল্ল হইয়া স্বীয় ভোগপর ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সাহায্যে যে কর্ম্মের উদ্যম দেখান, তাহা শ্রীরূপ-কথিত উৎসাহ নহে। আবার

ভোগ্যবস্তুর তুল্ল ভত্ব-দর্শনে হতাশ হইয়া অথচ তাহার লোভও ছাড়িতে না পারিয়া অথবা ইন্দ্রিয়-ক্লেশ-সহনে পরান্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে আকস্মিক, অস্বাভাবিকরূপে ফল-প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখিবার নাম ধৈর্য্য নহে। এক কথায় বলিতে গেলে উৎসাহ পুরুষকার এবং ধৈর্য্য অদৃষ্টবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কখনই নহে। উহার মূল শরণাগতি।

বাস্তবিক পক্ষে ধৈর্য্য ও উৎসাহ হৃদয়ে স্থায়িভাবে অবস্থান করিতে পারে কখন ? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্যই শ্রীরূপ-গোস্বামী উৎসাহ এবং ধৈর্য্য এই দুইটি শব্দের মধ্যস্থলে 'নিশ্চয়' একটি শব্দ বলিয়াছেন। নিশ্চয় অর্থে সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বুঝায়। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ, শ্রদ্ধাই অঙ্গী বস্তু। শ্রদ্ধা থাকিলেই উৎসাহ এবং ধৈর্য্য যুগপৎ থাকা সম্ভব,—এইজন্য নিশ্চয়-শব্দটিকে উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের মধ্যস্থানে বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাই সেই রজ্জু, যাহা দ্বারা আপাতবিরোধী দুইটি গুণ, উৎসাহ ও ধৈর্য্য, একস্থানে বদ্ধভাবে অবস্থান করে।

নিশ্চয় কাহাকে বলে ?

> "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
> কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

কোন ভাগ্যে কোন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধু-সঙ্গের প্রতি তাঁহার সামান্যাকারে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় সাধুর নিকট শ্রবণ করে। "ভজনীয়

বস্তু কে ? এই বিশ্ব কি ? আমি কে ? ভজনীয় বস্তুর সান্নিধ্যলাভ কি প্রকারে হইতে পারে এবং সান্নিধ্যলাভের পর কি ফলোদয় হয় ?” ইহা শ্রবণ করিবার পর সেই বাক্যে যে দৃঢ়প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা।

এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বা নিশ্চয়তাই ভজনের মূল উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের মূলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে উহা স্থায়ী এবং নিশ্চিত ফলদায়ক হয়। ভক্তিপথই ভগবৎপাদপদ্ম-লাভের একমাত্র উপায়, অন্য উপায় নাই—সাধু-মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া উহাতে যদি দৃঢ়তম বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে ভক্তিসাধনে উৎসাহের অভাব বা শৈথিল্য কখনই আসে না। আবার ভগবৎপাদপদ্ম-লাভই জীবের একমাত্র অভীষ্ট, ইহা দৃঢ়রূপে জানিলে তাহার প্রাপ্তিতে বিলম্ব হইলেও ধৈর্য্যচ্যুতি কখনই ঘটে না। উৎসাহ এবং ধৈর্য্য কেবলমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকিলেই থাকিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস না থাকিলে উৎসাহ-হীনতা বা ধৈর্য্যচ্যুতি সহজেই হইয়া পড়ে। ইহা কেবলমাত্র পরমার্থ-সাধন-বিষয়ে নহে, পরন্তু যে কোনও ব্যবহারিক কার্য্যেও এইরূপ দেখা যায়। যেখানে প্রাপ্যবস্তু সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়-এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নাই, অথবা সেই বস্তু লোভনীয় হইলেও আমি তাহা পাইবার উপযুক্ত কিনা, এইরূপ সন্দেহের অবকাশ যেখানে আছে, অথবা যে পথ আমি অবলম্বন করিয়াছি, সেই পথই যে অভীষ্ট-লাভের একমাত্র পথ—এইরূপ বিশ্বাস যেখানে নাই, সেইখানে লোকে একটা সাময়িক অস্থির বিশ্বাস এবং কতকটা কৌতুহলের

বশবর্ত্তী হইয়া কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়াই হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই আছে এবং এই প্রকারে অধ্যয়ন করিলে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইব, এইরূপ দৃঢ় ধারণা যে ছাত্রের আছে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে কিরূপ আনন্দ লাভ হয়, তাহা যে জানে, সে অধ্যয়নের শ্রম-স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইতেই পারে না। কিন্তু যেখানে নিজের যোগ্যতায় আস্থা নাই, কর্ম্ম-প্রণালীতে আস্থা নাই এবং প্রাপ্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, ও উপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে যেখানে সংশয় বিদ্যমান, সেইখানে প্রথম হইতেই উৎসাহের অভাব হইয়া থাকে। যে কোন সাময়িক কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও সে কিছু দিনের মধ্যেই ধৈর্যচ্যুত হইয়া পড়ে।

পরমার্থিক অনুশীলনে আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ না করিবার একমাত্র কারণই শ্রদ্ধার অভাব। ভজনক্রিয়া দুই প্রকার—নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অল্পদিনেই নিষ্ঠার উদয় হয়, তখন ভজনক্রিয়া নিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেও ভজনকারী ভক্তিপথ হইতে বিচলিত হন না। নিষ্ঠা না থাকিলে ভজনক্রিয়া অনিষ্ঠিতা হয়। অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার প্রবৃত্তি একটা সাময়িক উত্তেজনা-বশেই হইয়া থাকে। অনিষ্ঠিত সাধক যাঁহারা, তাহারা যখন ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন, তখন সাধুর নিকট হইতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতে দৃঢ়শ্রদ্ধ না হওয়ায় তিনি ভজনের প্রকৃত রহস্য

কিছুই জানিতে পারেন না। তাহার ধারণা থাকে—ভগবৎপাদপদ্ম দিল্লীর লাড্ডুর মতই একটি বস্তু বিশেষ। কিছুদিন কোন প্রকারে ভজনক্রিয়ার ক্লেশটি সহ্য করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই প্রয়োজন লাভ হইতে পারে। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর ব্যক্তাকারেই হউক,—শ্রৌতজ্ঞানের অভাব থাকিলে বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে আরব্য উপন্যাসের ন্যায় একটা অদ্ভুত ধারণা থাকিবেই। ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন, তাহাদের প্রথম কিছুকাল খুবই উৎসাহ থাকে। এই অবস্থাকে 'উৎসাহময়ী' বলে। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই যখন দেখা যায় বস্তুপ্রাপ্তির লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে না তখন উৎসাহ মাঝে মাঝে ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহার নাম 'ঘনতরলা' ভজনক্রিয়া। তারপর সেই সাধকপ্রতিম ব্যক্তির চিত্তে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। গৃহে থাকিয়া হরিভজনই শ্রেয়ঃ, অথবা গৃহত্যাগই শ্রেয়ঃ ইত্যাদি নানাপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প তাহার মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এই অবস্থাকে 'ব্যূঢ়বিকল্পা' বলা যায়। ক্রমে তিনি স্থির করেন, তাহার পক্ষে গৃহবাসই প্রশস্ত, যেহেতু, অপক্কাবস্থায় গৃহ ত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা বিপরীত ফল হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছা অপেক্ষা স্বীয় দেহমনের তৃপ্তিই তাঁহার নিকট তখন অধিক আদর পাইতে থাকে। এই অবস্থাকে মহাজনগণ 'বিষয়-সঙ্গরা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ক্রমশঃ উৎসাহ দূর হইয়া শৈথিল্য উপস্থিত হয়। নিয়মিতভাবে নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য করা আর তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই-

রূপ অবস্থাকে 'নিয়মক্ষমাং বলা হয়। অবশেষে তাঁহার ভক্ত'রূপে খ্যাতি হইয়া থাকে। তিনি তখন লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার তরঙ্গে ভক্তবেশে রঙ্গ করিতে থাকেন এই অবস্থার নাম ''তরঙ্গরঙ্গিণী'। এইরূপ ব্যক্তির মঙ্গল লাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। মূল ভিত্তি যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস না থাকায় এইরূপ দুঃখময় পরিণাম হইয়া থাকে।

এইজন্য নিশ্চয়তা বা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক। বিষয়ীর বিষয়-সংগ্রহে কি অদম্য উৎসাহ থাকে! বিষয় সংগ্রহ করিতে গিয়া কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কত উদ্যম বিফল হইয়া যায়; প্রকৃতির নিকট হইতে কতবার বিপুল পরাভব প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়ীর বিষয়সংগ্রহের প্রয়াস একটুও খর্ব্ব হয় না। তাহার ত' ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটে না বা নৈরাশ্য আসে না। ইহার একমাত্র কারণ—সে মনে প্রাণে বুঝিয়াছে, বিষয়টি বড় ভাল জিনিষ এবং সেই ঐ ভাল বস্তুর একমাত্র আস্বাদক। সুতরাং তাহার উদ্যম কি কখনও হ্রাস পায়?

কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর প্রার্থনীয় বস্তু কিছু নাই গতি নাই, কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত আর পথান্তর নাই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত অসহায়, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কীটাণুকীট আমরা মায়ার এই বিপুল রঙ্গ-মঞ্চে তাহার প্রবল আকর্ষণে কোন ক্রমেই বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আশা ছাড়িয়া দিলেই অনন্ত মৃত্যুর বিভীষিকা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে, সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত আর উপায় নাই—এই দৃঢ়বিশ্বাসটি হৃদয়ে বদ্ধমূল যখন হয়, তখনই

আমাদের হৃদয়ে অমিত উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে নহে। যতক্ষণ আমাদের এরূপ ধারণা থাকে--কৃষ্ণপাদ-পদ্মের উদ্দেশ ব্যতীত আমাদের জীবনের সার্থকতা থাকিতে পারে, আমাদের দিন বেশ আরামে কাটিতে পারে; কৃষ্ণ ছাড়াও আমা-দের অন্য গতি, অন্য অভিলাষ, অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য পথ, অন্য প্রভু থাকিতে পারে-- যতক্ষণ পরমহংসের ভৃত্যানুভৃত্যের আনুগত্যে একায়ন-পন্থার দিকে আমাদের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত না হয়, ততক্ষণ কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ এবং তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে?

যাঁহারা দুইচার দিন সখ করিয়া বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, সাধনভক্তির ক্লেশ স্বীকারের অভিনয় করিয়া তারপর--"না আমাদের আর কিছু হইল না।" বলিয়া নিরাশ হইয়া পড়েন, তাহারা বাহিরে কৃপা-অপ্রাপ্তিতে যত দুঃখই প্রকাশ করুন না কেন, অন্তর খুঁজিলে দেখা যাইবে, তাহারা কৃপা কখনও চান নাই। যাঁহার নিকট কৃপা চাহিবেন, তাহার তত্ত্বসম্বন্ধেই তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস হয় নাই। তাহাদের অন্তরে থাকে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা; অর্থাৎ সাধুগণ যখন প্রয়োজন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন, তখন পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাউক তাঁহাদের কথিত পন্থা অব-লম্বনে সত্য সত্যই ঐরূপ ফল পাওয়া যায় কিনা--ইহাই তাহাদের বিচার। এই যে যাচাই করিয়া লইবার দাম্ভিকতা, ইহাকে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতি তাহাদিগকে শরণা-

গত হইতে দেয় না—ইহা তাহাদের চরমতম দুর্ভাগ্য। বহু ভাগ্য এবং কৃপাবল না থাকিলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয় না।

কিন্তু নিশ্চয়তা বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি জানেন, অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন না কোন দিন হইবেই; কারণ কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত আর ত' গতি নাই। যাঁহারা কৃষ্ণ-কৃপালাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দেন, তাহারা কৃষ্ণভজন-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইলেও একেবারেই ত' নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন না, চেতনের সে স্বভাবই নহে। তাঁহারা তখন পূর্ণ উদ্যমে বিষয়-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ চিত্তবৃত্তি কোথা হইতে আসে? প্রথম হইতেই তাঁহাদের ধারণাই আছে, কৃষ্ণ-কৃপা-ব্যতীত আমাদের যে গতি নাই, এইরূপ নয়। যদি কৃষ্ণের নিকট হইতে সুখ-সুবিধা না পাই, বিষয় ত' রহিয়াছে; চক্রবৃদ্ধিহারে সুখ আদায় করিয়া লইব। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সুখটা ত' অতিরিক্ত। লাভ হয় ভালই, নতুবা "হাতের পাঁচ" বিষয়সুখ ত' আছেই।

কিন্তু একায়নপন্থী যাঁহারা তাঁহাদের এইরূপ চিন্তা আসে না। সতী স্ত্রী নিজের ভরণপোষণের চিন্তা করে না, সুখ-সুবিধার জন্য আর কাহারও দ্বারস্থ হয় না, হইবার কথা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ কেবলমাত্র তাহার স্বামীকে লইয়া। স্বামীই একমাত্র গতি বলিয়া সুখ-দুঃখের সংঘাতে সে বিচলিত হয় না; তাহার উৎসাহ বা ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। কিন্তু একজন বার বিলাসিনী ঐরূপ উৎসাহ বা ধৈর্য্যের শতাংশের এক অংশ দিয়াও কোন ব্যক্তি-বিশেষের সেবা করিতে পারে না,

কারণ সে অনন্যাপেক্ষিণী নহে। সে জানে, তাহার উদরসংস্থান
বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার অন্য উপায়ও আছে।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, কত ক্ষুদ্র. অসহায় দুর্ব্বল সে থাকে ;
কতটা পরমুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু সেই অতিক্ষুদ্র শিশু একদিন
প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সর্ব্ববিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়া মাতার সুখবিধান
করিবে, এই দৃঢ় আশাবন্ধ লইয়াই মাতা কত অসীম উৎসাহ এবং
ধৈর্য্য সহকারে সেই শিশুকে লালন পালন করিয়া থাকে। শিশু
যদি রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়, তখন ত' মাতা আশার
প্রদীপকে নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয় না ; মাতার
উৎসাহ বরং আরও বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

—:•:—

আমাদের অবস্থা

আমরা অনেকেই হরিভজন করিতে আসিয়াছিলাম - কেহ
কেহ তীব্র অনুরাগ, অকপট সত্যপিপাসা লইয়া তৃষিত চাতকের
ন্যায় বাস্তবসত্যসমুদ্রের একবিন্দুলাভে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য
নিষ্কপটেই আসিয়াছিলাম এবং নিষ্কপটেই যাঁহাদিগের গুরু, বৈষ্ণব
বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছি। তবে
ইহার মধ্যে কেহ কেহ যে সংসারের ভয়ে জ্বালা-যন্ত্রণায় একদিকে
অত্যন্ত ভীত ও তপ্ত হইয়া— জাগতিক অভাবে প্রপীড়িত হইয়া,

আর একদিকে গৌড়ীয়মঠের তদানীন্তন উদীয়মান ঐশ্বর্য্য বৈভবে, উৎসবাদির আড়ম্বরে, পাণ্ডিত্য ও বাক্যছটার মোহে মুগ্ধ হইয়া এবং পূর্ব্বসঞ্চিত অন্যাভিলাষপুঞ্জ হৃদয়ে বহন করিয়া না আসিয়াছি, তাহাও নহে। মঠের দৌলতে নিজের কোন-না-কোন প্রচ্ছন্ন অভাব-পূরণ, মিশনের জৌলুসে নিজেকে কোন না-কোন ভাবে জাহির করিবার যে প্রচ্ছন্ন পিপাসা না ছিল, তাহাও বুকে হাত দিয়া আমরা কেহ কেহ একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

কোমল শ্রদ্ধার অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া, সত্যের বুভুক্ষা লইয়া অথচ অন্যাভিলাষের জন্মজন্মান্তরীয় ভগ্নাবশেষের বিরাট স্তূপ অন্তরে চাপা রাখিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলাম, তাঁহারা যখন দেখিলাম, অন্যাভিলাষী কেহ কেহ মাঝে মাঝে মুখ ঢাকিয়া মঠেও নিজের অপস্বার্থ পরিপূরণ করিয়া লয়; আবার যখন দেখিলাম, বাহিরে যাঁহাদিগের নাম 'অন্তরঙ্গ' (?) বলিয়া বিঘোষিত, তাঁহারাও সময় সময় এমন অনেক কিছু কার্য্য করেন, যাহা সাধু-শাস্ত্রের কোন নজিরের দ্বারাই সমর্থিত হইতে পারে না; তখন আমরা দুই একজন কেন আর ঠকিয়া যাই—এইরূপ মনে করিয়া একটুকু একটুকু করিয়া অন্যাভিলাষের টোপ খাওয়ার মাত্রা বাড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাশ্রমে যে-সকল ভোগ আমাদের ভাগ্যে জুটিত না, সেই সকল অসংখ্য ভোগও জুটিয়া গেল এবং পূর্ব্বে বিরাগী থাকিলেও ভোগসুখের একটু একটু আস্বাদ পাইয়া অজ্ঞাতসারে ভোগের দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে থাকিলাম। কেহ বা বৈষ্ণবকে চাকর-রূপে পাইলাম, কাহারও বা ইলেকট্রিক

ফ্যান, মোটরগাড়ী, নেটের মশারী জুটিল, কাহারও হাত দিয়া অগণিত জাতরূপের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল, কেহ বা অভ্যাসযোগের দ্বারা বাক্যবাগীশতার ফুলঝুরি প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া লইলাম ; কেহ বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার গৌরবে ধরাকে সরাজ্ঞান করিতে লাগিলাম, গুরুদেব অপেক্ষা নিজেকে অধিক বুদ্ধিমান্ বিচার করিতে লাগিলাম এবং সেইরূপ অনেক সার্টিফিকেটও কলে-কৌশলে সংগ্রহ করিলাম। কেহ বা শ্রীগুরু-দেবকে উত্তম পাক করিয়া খাওয়াইতে পারি মনে করিয়া নিজের মহত্ত্ব অনুভব করিতে লাগিলাম ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্তরে ব্যাঙ ফাটা হইতে লাগিলাম। কেহ বা ইংরাজী বুলি আমার মত কেহ জানে না, গুরুদেবও জানেন না, কেহ বা আমার মত মোড়লী করিতে জানে না, গুরুদেবও জানেন না, কেহ বা আমার মত লোক ভুলাইতে, শরীর নাচাইতে, রাজা-রাণী সংগ্রহ করিতে আর কেহ পারে না, সুতরাং এইরূপ আমরা না হইলে গুরুদেবের মিশন অচল হইবে—এইরূপ বিচার করিয়া অন্তরে অন্তরে গুরু-দেবের সর্ব্বনিয়ামকত্বের চিন্তাস্রোতঃকে অবরুদ্ধ করিয়া দিলাম ; কিন্তু বাহিরে লোক-দেখানভাবে সকল কার্য্যেই গুরুদেবের দোহাই, জয় ও দয়ার কথা বলিয়া নিজের গুরুভক্তির বাহাদুরী প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিলাম।

অনেকেই গোপনে গোপনে 'গুরু'ও সাজিয়া বসিলাম। কাহারও সন্তান বাঁচে না, কিন্তু আমার বাক্যসিদ্ধির প্রভাবে সন্তান বাঁচিল দেখিয়া তাহারা সবংশে আমাকে 'গুরু' (?) করিল, কিন্তু

বাহিরে সাইনবোর্ড টাঙ্গাইলাম ইহারা প্রভুপাদেরই শিষ্য। কাহাকেও চরণতুলসী পাঠাইয়া রোগ ভাল করিয়া দিলাম দেখিয়া, কাহারও ছেলেপিলের আদর করিয়া গৃহিণীর মনোরঞ্জন করিলাম দেখিয়া গৃহিণীর পরামর্শে গৃহকর্ত্তা শিষ্য হইয়া গেল, সকলকে জানাইলাম, ইহারা প্রভুপাদের শিষ্য; কিন্তু বস্তুতঃ আমিই ইহাদের অন্যাভিলাষের তোষামোদকারী খিদমৎগার বা শিষ্য হইয়া পড়িলাম। এইরূপভাবে আমাদের সুপারিসে যে-সকল অন্যাভিলাষী-সম্প্রদায় আমার ভবিষ্যতে দল পাকাইবার জন্য 'প্রভুপাদের শিষ্য' নাম করিয়া আমার কক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে আমাকে প্রতিষ্ঠাশা-শৌকরী-বিষ্ঠার নরক-কুণ্ডে ডুবাইবার সহায়তা করিলেন। প্রতিষ্ঠার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত কনক-কামিনী-লাভেচ্ছাও বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। আবার কনক-কামিনী-লাভেচ্ছা প্রতিষ্ঠাশাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। প্রতিষ্ঠাশা বর্দ্ধিত হওয়ায় বহু পূর্ব্বের সত্য-পিপাসার অঙ্কুরটী অকালেই ঝরিয়া পড়িল। প্রতিষ্ঠাশা ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বৈষ্ণব ও সর্বোত্তম গুরুসেবকের প্রতি— আদর্শ শিক্ষা-গুরুর প্রতি মৎসরতার উদয় করাইল। নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম-কুসুমে মৎসরতাকীট প্রবেশ করিল। ভাগবতধর্ম্মের স্থানে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ ও রাবণের ধর্ম্ম উদিত হইয়া প্রহ্লাদানুগ-গণকে, শ্রৌতপথকে ও ভক্তিলক্ষ্মীকে বিনাশ ও হত্যা করিবার চেষ্টা হইল। বৈষ্ণবাপরাধমত্তহস্তীর উদয়ে শ্রীগুরুপ্রদত্ত ভক্তি-লতার অঙ্কুরটী উৎপাটিত, পত্র শুষ্ক ও তৎস্থানে লাভ-পূজা-

প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-জীবহিংসা-গ্রাম্যকথা-বৈষ্ণবনিন্দা, আচার্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার প্রভৃতি নাস্তিকতার বন্ধুগণ আমাদের চতুর্দ্দিকে জুটিল।

এইরূপ অবস্থার সূচনা দেখিয়া জগদ্গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। তিনি কলির ব্রহ্মাণ্ডে যে গোলোকের প্রেমধন অবতরণ করাইয়াছিলেন, তাহা আবার স্বতন্ত্র জীবগণ কলির দ্বারা আবৃত করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে জগদ্গুরু, আত্মবঞ্চনা-কামিগণকে দ্রবিণাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া, কাহাকেও বা প্রকটকালেই রামচন্দ্র-পুরীর আদর্শের ন্যায় "দূর হ পাপী" বলিয়া বর্জ্জন করিয়া প্রকট-লীলা সংগোপন করিলেন এবং নেপথ্যে থাকিয়া অসারগণকে পাংনা উড়াইয়া পৃথক্ করিবার এক কৌশল প্রকাশ করিলেন। কিছু-দিনের মধ্যেই মেকি ও আসল, চূণগোলা ও গোরস, ভণ্ড ও ভক্তের দুইটী পৃথক্ স্বরূপ সহজেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদল বলিল – আমরা ভক্তিরাজ্যের প্রথম প্রতিজ্ঞা যে আচার্য্যানুগত্য, তাহা স্বীকার করি না, আমাদের আচার্য্য ঠুঁটোরাম দেবতা, তিনি কথা বলিবেন না, আমাদিগকে শাসন করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া পৈতা চুরি, নৈবেদ্য চুরি করিতে পারিব ও তাঁহাকে নুড়ি করিয়া আমাদের ভোগের বাদাম ভাঙ্গিব! আর একশ্রেণী বলিলেন,—আমরা গুরুদাসের আনুগত্যে গুরুসেবা করিব, মহান্ত আচার্য্য – যিনি সাক্ষাদ্ভাবে আমাদিগকে সংশোধন করিতে পারেন, তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া আত্মমঙ্গল সাধন করিব, শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ করিয়া লইব, প্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃ বলিয়া আত্ম-

বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিব না। আমরা আচার্য্যকে আচার্য্যোচিত সম্মান করিব, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিব না, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী মাত্র বলিব না। বৈষ্ণবের অপর নাম 'পরমহংস,'—শ্রীগুরুদেবের বাণী অনুসারে ইহাই জানিব। যাঁহাকে আমরা বরখাস্ত করিতে পারি, তিনি আমাদের আচার্য্য হইতে পারেন না, শ্রীগুরুদেবের এই শিক্ষা মানিব। এইরূপে এক ব্রহ্মারই শিষ্যব্রুব অসুর বিরোচন ও প্রকৃত শিষ্য দেবরাজের পক্ষীয় দুইটি বিভাগ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। অদৈব ও দৈবগণের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবগণের অন্য কোন অস্ত্র নাই, তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত সুদর্শন ; আর অদৈব-গণের অনেক জাগতিক অস্ত্র আছে। তাহারা প্রথমেই আচার্য্যকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে রাজযক্ষ্মার রোগী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল দেখিয়া তাঁহার পক্ষীয় বলির ন্যায় সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণকারী মহামহোপদেশককে বোকা ও পাগল বলিতে লাগিল। সুদর্শনের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—কেবল শাস্ত্রের প্রমাণে চিড়া ভিজিবে না, আমরা প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ম্যান। আচার্য্যের গুরুমনোঽভীষ্টপ্রচারকার্য্যে বাধা দিবার জন্য প্রাকৃতসহজিয়া ও জাতিগোস্বামীর শিষ্যগণের ন্যায় মঠসেবকগণের রুটী বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল ; তাহাদের কব্জার অন্তর্গত যে কএকটী অন্যাভিলাষী সমশীল বিষয়ী আছে, তাহা-দিগের দ্বারা সুদর্শন গৌড়ীয়ের ভিক্ষা অর্থাৎ কায়মনোবাক্য-সমর্পণ-রূপ ত্রিমুদ্রা বন্ধ করিল, মৎসরতাধৃষ্টাচণ্ডালিনী দ্বারা গৌড়ীয়

ও নদীয়াপ্রকাশের বিজ্ঞাপন বন্ধ করাইল, গ্রাম্যবার্ত্তাবহের পদ-
লেহন করিয়া সর্ব্বোত্তম সুনির্ম্মল চরিত্র পরমহংস আচার্য্যশ্রেষ্ঠের
সম্বন্ধে অলীক কথা প্রচার করিল, মৎসর রামচন্দ্র খাঁ ও রামচন্দ্র-
পুরীর চিত্তবৃত্তির আদর্শ দেখাইল ; সরল, নিষ্কপট সত্যানুরাগী
আচার্য্যানুগত্যকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণের নামে আদালতে মিথ্যা
অভিযোগ করিয়া নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব ও মৎসরতাচণ্ডালিনীর
স্বভাব পাশাপাশি ফুটাইয়া তুলিল, আচার্য্যপক্ষীয় শুক্লবিত্তার্জ্জন-
কারী গৃহস্থগণের রুটী বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের
মনিবগণকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল, জগতের লোকদিগকে
ধাপ্পাবাজী দিয়া জনমতকে দৈবপক্ষগণের প্রতি উত্তেজিত ও নিজ
পক্ষের প্রতি অনুকূল করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিল ; কোমলশ্রদ্ধ-
দিগকে ভাঙ্গাইবার জন্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহে ঘুষ দিয়া প্রচারিত কুৎসায়
লালকালির দাগ দিয়া মিশনের পয়সা খরচ করিয়া স্থানে স্থানে
প্রেরণ করিল ! দৈবগণ "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"
—এই বিচারাবলম্বনে খলগণের খলতা সুদর্শনাস্ত্রের দ্বারা অনা-
য়াসেই পরাভূত করিলেন। অদৈব পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বনমানুষ,
মেয়েমানুষ, স্ত্রীনায়ক, বহুনায়ক, শিশুনায়ক প্রভৃতি লইয়া শুদ্ধ-
ভক্তিকে উৎসাদিত করিবার জন্য অদৈব তপস্যা আরম্ভ করিল ;
কিন্তু—

"প্রতিষ্ঠাশাতরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।"

কপট-ত্রিদণ্ডি-বেষী ছায়াসীতাহরণকারী রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের

অনুগসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুঝিয়া কিছুতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না কেবল মায়ামরীচিকার জন্য বৃথা শক্তি ব্যয় করিয়া নির্বিবশেষগতি লাভ করিল।

অদৈবগণ তাহাদের বিষয়ী দালালদিগকে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় পরামর্শ দিল—"যখন আমরা গড়ের পারে থাকিলাম, কিছুতেই শুদ্ধভক্তিসঙ্ঘারামে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, তখন তোমরা চাঁদা বন্ধ করিয়া শুদ্ধভক্তিসঙ্ঘারামের সেবকগণের রুটী ও প্রচার বন্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা 'আচার্য্যানুগত্যের দ্বারা মিশন চালান গেল না. আমরা ছাড়া মিশন চলিবে না, প্রচার চলিবে না, টাকাই কৃষ্ণভক্তির নিয়ামক ও পরিমাপক, আমরাই কর্ত্তা, ভোক্তা'—ইহা দৈবগণকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া হাতে তালি দিতে পারিব"; কিন্তু দৈবপক্ষীয়গণ সুদর্শনাস্ত্রের সেবক বলিয়া তাঁহারা ঐ সকল নাস্তিকতার অস্ত্রে ভীত হইলেন না। তাঁহারা জানেন—গুরু, বৈষ্ণব ও কৃষ্ণ নিত্যবস্তু। "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে ত'ার প্রবর্ত্তন।" মিশনের পরিচালক—কৃষ্ণশক্তি; —বনমানুষ মেয়েমানুষ, টাকা বা ধাপ্পাবাজী পরিচালক নহে। সকলের উপাস্য কৃষ্ণ। মামলা-মোকদ্দমাদ্বারা ভক্তি জয় করা যায় না, সত্য করা যায় না, অর্থ বা অনর্থের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি-প্রচার হয় না। পরমার্থ বা কৃষ্ণশক্তিদ্বারাই ভক্তিপ্রচার হয়।

যখন মিশনের এইরূপ এক অবস্থায় আমরা উপস্থিত হইলাম, তখনও আমাদের মধ্যে কতকগুলি কোমলশ্রদ্ধ, আর কতকগুলি অদৈব-পক্ষীয়গণের দুঃসঙ্গের প্রভাবে কবলিত বা ব্যবসায়ি-

লৌকিকগুরুব্রুবের প্রাকৃত-সাহজিক অনুরাগিব্রুবের ন্যায় নানা-প্রকার অন্যাভিলাষের মোহে মুগ্ধ ও আবদ্ধ কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল "কোন্ পক্ষে সত্য আছে, তাহা কিরূপে বুঝিবে? তাহা-দিগকে দেখিয়াই ত' আমরা আসিয়াছি, তাহারাই ত' আমাদিগকে আনিয়াছে, তাহাদের দুঃসঙ্গের মোহ পরিত্যাগ করিব কিরূপে? তাহারা আমাদের অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় দেয়, ছেলেপিলেদিগকে আদর করে, আমাদের গৃহিণীগণের মনোরঞ্জন করে, ছেলে না হইলে ছেলে হওয়ায়, কন্যার পাত্র না জুটিলে পাত্র-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করে, রোগ হইলে ডাকে চরণতুলসী পাঠায়, নিকটে আসিলে পুষ্পান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়ায়, তাহা-দিগকে ছাড়িব কিরূপে? যতই হউক, তাহারাও ত' গুরুদেবেরই শিষ্য, তাহারাই ত' নামজাদা প্রচারক, তাহাদিগকে ছাড়িলে মিশন কিরূপে চলিবে? গুরুদেবই বা তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই কেন?"

যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী নহেন, যাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ বা হরিকথা শুনিবার কোন ধারই ধারেন না, লোকরঞ্জনকারী কথাকেই হরিকথা মনে করেন, যাঁহারা অন্যাভিলাষের ঠুলি পরিয়া দীক্ষা-শিক্ষার অভিনয় করায় শ্রীচৈতন্যবাণীকে আদৌ দর্শন করেন নাই, তাঁহার সম্মুখেই আসিতে পারেন নাই, শ্রীচৈতন্যবাণীর কোন কথাই যাঁহাদের কানে যায় নাই, যাঁহারা মঠের সাজা সাধু-সন্ন্যাসীর আদর-যত্ন, লৌকিকতা ও সামাজিকতাকেই গুরু করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে আত্মসংশোধন ও আত্মমঙ্গলের সুতীব্র অগ্নিশিখা

প্রজ্বলিত হয় নাই, তাঁহারাই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় তাঁহারই কৃপায় অতি সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশিত সৎ ও অসৎ-সঙ্গকে, আসল ও মেকীকে দেখিয়াও দেখিতেছেন না—শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করিতেছেন না। শ্রীগুরুকৃপায় অতি স্পষ্টভাবে অতি স্বচ্ছস্বরূপে আজ মেকী ও আসল ধরা পড়িয়াছে। একদিকে আত্মমঙ্গলকামী বলির ন্যায় নিষ্কপট আত্ম-বিসর্জ্জনকারী, আনুগত্য ও আশ্রয়ের জন্য চাতকের ন্যায় পিপাসু, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-প্রচারৈকব্রত, সুনির্ম্মল পবিত্র অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলশিরোমণি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ-হৃদয় যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থগণ, যাবতীয় মহামহোপদেশক, যাবতীয় সেবাবিগ্রহ, যাবতীয় সিদ্ধান্তবিৎ, জড় প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগিগণ; আর একদিকে নিত্য অহি-নকুল-সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু সাময়িক-স্বার্থ-সাধনের জন্য সম্মিলিত মুষ্টিমেয় অন্যাভিলাষী মৎসর ব্যক্তি, যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন ধার ধারে না, যাহারা কাহাকে শ্রীরূপানুগত্য বলে, কাহাকে রূপ-রঘুনাথের কথা-প্রচার বলে, কাহাকে আম্নায় বলে, কাহাকে আচার্য্য বলে, কাহাকে সেবা বলে, উহার কোন খবরই রাখে না,—এইরূপ কতকগুলি অপ-স্বার্থপর পাষণ্ড ব্যক্তি। একদিকে নির্ম্মৎসরতা ও অতিমর্ত্ত্য একের আনুগত্যের জন্য দৈন্য, আর একদিকে মৎসরতা ও স্বয়ংসিদ্ধ বহু মাতিয়া গুরু সাজিবার জন্য দাম্ভিকতা! সঙ্গের দ্বারাই সব পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ দিকে 'অজাতশত্রু' শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, বলির ন্যায় সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণকারী মহামহোপদেশক

ভক্তিসুধাকর প্রভু, কোন্ দিকে গুরু-বৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্য-
কারী ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী, জীবন্মুক্ত
মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর, কোন্ দিকে শ্রীধাম-মায়াপুরের
সেবক নিষ্কপট ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী পরিব্রাজক
গৌরভজনকারিগণ; আর কোন্ দিকে অতিমর্ত্ত্য জগদ্গুরুর পাদ-
পদ্মে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডিগণ, নারকিগণ, মৎসরগণ, গুরু-
ভোগিগণ, গুরুত্যাগিগণ ও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় Commer-
cial interest বা বেনেগিরির গোলামী ও চাটুকারিতায় অভ্যস্ত
ব্যক্তিগণ? কাজেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলায় সৎসঙ্গ
ও দুঃসঙ্গকে অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন
"সমশীলা ভজন্তি বৈ।" কপাল ভাল থাকিলে, হৃদয়ে অন্যাভিলাষ
না থাকিলে, অন্ততঃ অন্যাভিলাষ ছাড়িবার নিষ্কপট স্পৃহা থাকিলে
আমরা অবশ্যই সৎসঙ্গ বরণ করিয়া লইব।

—:•:—

আমি ভজন করি না কেন?

অপরে ভজন করুন, আর না-ই করুন, আমি ভজন করি না
কেন? ভজন ব্যক্তিগত কল্যাণ-সাধন। জগতের যদি কেহই
হরিভজন না করেন কিংবা হরিভজনের ছলনায় অন্যাভিলাষ পূরণ

করেন, তাহাতে আমার হরিভজন পরিত্যাগের কি মঙ্গলময় কারণ আছে? হরিভজন না করিবার প্রবল প্রচ্ছন্ন পিপাসা থাকিলেই 'অপরে হরিভজন করেন না'—ইহা অনুসন্ধানের মায়ামৃগ হয়। আর হরিভজনের প্রবল অকপট পিপাসায়

"বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কানে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এই মাত্র জানে॥"

নিজে হরিভজন না করিলে অমঙ্গল কাহার? নিজে হরিভজন ছাড়িলে অভদ্র—অনর্থ কাহার?

তাঁহারই হরিভজন আরম্ভ হইয়াছে, যাঁহার নিকট জাগতিক অভাবনীয় অনন্ত অভাব-অসুবিধার পাহাড়-পর্ব্বত, দুঃখ-দৈন্যের হিমালয় স্তরে স্তরে উপস্থিত হইয়াছে; আর তাঁহারই হরিভজনের নিষ্কপট পিপাসা উদিত হইয়াছে, যিনি মায়ামুগ্ধ মানবজাতির দুরধিগম্য আত্মকর্ম্ম-বিপাকের বৈচিত্র্যরূপ অভাব-অসুবিধা, দৈন্য-দুঃখের পাহাড়-পর্ব্বতকে কৃষ্ণানুকম্পার সোপান বলিয়া বরণ করিয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণাপেক্ষা সুনীচ, অনিন্দক, অমানী, মানদ, নির্ম্মৎসর হইয়া সৎসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মমুখশ্রুত কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তন-পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে পারেন।

আমরা যেন আত্মকর্ম্মবিপাককে 'পরকৃত হিংসা' মনে করিয়া অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, মৎসর, নিন্দক, অভিমানী, নিজমান-লাভে লিপ্স, না হইয়া পড়ি। বৈষ্ণবাপরাধমত্তহস্তী যেন আমাদের ভক্তিলতার বীজ বা নবাঙ্কুর উৎপাটন করিয়া কীর্ত্তনাপরাধের

দ্বারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগুলিই পরিবর্দ্ধিত করিয়া না তুলে।

আমরা শ্রীগুরুমুখে ত' অনুক্ষণ ইহাই শুনিয়াছি ; তাঁহার অতিমর্ত্ত্য, অভূতপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় আদর্শে ত' ইহাই জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি যে, জগতে যদি কেহই হরিভজন না করে, শত শত বাধা-বিঘ্নের আগ্নেয়গিরিগুলিও যদি অগ্নিপরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়, তথাপি আরও প্রবলতর বেগে, দ্বিগুণতর উৎসাহে হরিভজনই করা কর্ত্তব্য—আরও কোটিকণ্ঠে কৃষ্ণভজনের কীর্ত্তন-গৌরবই প্রচার করা কর্ত্তব্য। ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, আমার অসংখ্য অন্যাভিলাষের তাণ্ডবের মধ্যেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম "সবে কৃষ্ণভজন করে—এই মাত্র জানে" - বাক্যের মূর্ত্ত আদর্শ প্রকট করিয়া অন্যাভিলাষের যাবতীয় তাণ্ডব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দূরে - সম্পূর্ণভাবে গোলোকের অস্মিতায় আত্মভূমিকা সংরক্ষণ করিয়াছেন। হরিভজনের—হরিভজনকারীর আদর্শ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ঐ আদর্শ আমার জড়চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিয়া চেতনচক্ষুকে আত্মসাৎ করে না কেন ?

কৃষ্ণ কি আমাকে বাজাইয়া লইবেন না ? কৃষ্ণ কি আমাকে কষ্টিপাথরে কসিয়া লইবেন না ? আমি মেকী না আসল ? আমি জড়উপমণি না চিন্ময় সন্মণি ? আমি কুরূপের হাটের মাটিয়া ভাণ্ড, না শ্রীরূপের হাটের মহাজনগণের পদাঙ্করেণু ? কৃষ্ণ—পূর্ণতম বস্তু ; অপূর্ণ বস্তু, অসম্যক্ বস্তু, আংশিক বস্তু, প্রতিবিম্বিত বস্তু নহেন। তাই তাঁহাকে দান করিবার পূর্ব্বে তিনি কি আমাকে পরীক্ষা

করিয়া লইবেন না? আমি কি সত্য সত্য কৃষ্ণকে চাই, কৃষ্ণের সেবাসুখ চাই, কৃষ্ণের অকপট কৃপা চাই, না কৃষ্ণমায়ার যুপকাষ্ঠের মায়ামৃগ হইতে চাই? দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, স্বজন-তাড়ন-ভর্ৎসন, জাগতিক নশ্বর লোভ-লালসা—কর্ম্মি-জ্ঞানি-ধ্যানি-কুলের অহমিকা যাহারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, আনখকেশাগ্রে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই ত' আত্মসাৎ করিয়াছেন—'আপন জন' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আর আমি কি ফাঁক তালে—সবদিক্ বজায় রাখিয়া সব সুবিধা সংরক্ষণ করিয়া 'হরিভজনকারী'র মৌখিকতা দেখাইতে চাই?

কৃষ্ণ ত' জগতের প্রতি ব্যাপারে আমার প্রতি কার্য্যের অকৃতকার্য্যতা ও তথাকথিত কৃতকার্য্যতার অপূর্ণতার মধ্যে জগতের অনিত্যতা, সম্ভোগবাদের হেয়তা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত করিতেছেন, আবার ঐদিকে সকল মনোধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মিগণের তাণ্ডব ছাপাইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীগঙ্গার প্রবাহ "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোক কীর্ত্তনের তরঙ্গে ভাগবত মহামণিমরকত প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছে, কই, তথাপি হরিভজনের জন্য আমার নিষ্কপট আর্ত্তি—লৌল্য উদিত হয় না কেন?

ইহার কারণ কি? আমার কি ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ সংঘটিত হইয়াছে? অথবা আমি গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়াছি? নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তির সহিত অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাই কোথায়? নামে রুচি হয় না কেন?

অর্চ্চনাপরাধে পতিত হইয়াছি কি ? অর্চ্চনসিদ্ধ হইলে ত' মুখে নাম প্রকাশিত হইত। রোগ কোথায় ? হৃদয়দৌর্ব্বল্য-অনর্থই কি আমার রোগ ? কোথায়, সেই রোগ-উপশমের যে ঔষধ সদ্‌বৈদ্যরাজ ব্যবস্থা করেন, তাহা গ্রহণ করি কোথায় ? অনুক্ষণ অনাবিল সাধুসঙ্গ করি কোথায় ? সাধুসঙ্গের ছলনা করিতে করিতে অসৎসঙ্গে প্রধাবিত হই কেন ? সাধু ব্যতীত অসাধুর সহিত ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে কি ষড়্‌বিধ প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি ? হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে মৃদুরোগ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি কি ? হৃদয়-দৌর্ব্বল্য না জন্মাইতে পারে, এইরূপ ব্যাধি নাই। হৃদয়দৌর্ব্বল্য কিন্তু যাবতীয় উৎকট অনর্থব্যাধির জনক—দুরারোগ্য রোগ—কপটতার জনক। হৃদয়দৌর্ব্বল্য উৎপাটিত না হইলে উহা তুষাগ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে থাকিয়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড করিয়া ফেলে—বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ সকলগুলিই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয়ে ও প্রতিপালনে উদিত হয়।

তাহা হইলে ঔষধি কি ? ভগবৎ-কৃপায় ঔষধির দুর্ভিক্ষ এ যুগে অন্ততঃ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু ঔষধ যত আমার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া আসে, আমি ততই যে দূরে পলায়ন করি। ইহার উপায় কি ? উপায়—বৈষ্ণবের পরামর্শ গ্রহণ—অবৈষ্ণবের পুষ্পিত প্রলপিত বাক্য হইতে দূরে অবস্থান—অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ-কীর্ত্তন।

তাহা হইলেই কি সব হইবে ? সব হইবে হরিকথা শুনিলেই সব হইবে, নতুবা 'শব' হইতে হইবে। **"শুনিতে"** হইবে—

আগে দেখিতে হইবে না,- বা আগে আর কিছু করিতে হইবে না। কানের পথটি খোলা রাখিতে হইবে জাগিয়া ঘুমাইতে হইবে না।

আমি যে কথা শুনিতেছি না, তাহার প্রমাণ কি? আমি যে জাগিয়া ঘুমাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ আমার অবঞ্চক অন্তরই সাক্ষ্য দিবে। যদি হরিকথা সত্য সত্য কানে লইতাম—কান দিয়া শুনিতাম, তবে শরীর-সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্মরণ হইত, আর কৃষ্ণ-সংক্রান্ত বিষয়সকল প্রয়োজনীয়তার কূল ছাপাইয়া উঠিত।

"তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥" (ভাঃ ৪।৯।১২)

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ. যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় সাধুগণের প্রসঙ্গ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা এই অতিশয় প্রিয় দেহ এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

তাহা হইলে আমি 'হরিকথা' শুনি কই? হরিকথা অপেক্ষা যে আমার নশ্বর দেহ-গেহ-বিত্ত-পুত্র-কলত্র-মান-প্রতিষ্ঠা 'বড়' হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব কোনটী? কল্যাণকল্পলতিকা হরিকথা, না নিখিল অকল্যাণ-নিকেতন নশ্বর জড়বস্তুগুলি?

শ্রীগুরু-মুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণকারীর—অনুকীর্ত্তনকারীর ত' কোনই অসুবিধা নাই—কোন অভাব নাই—গ্রহ-বৈগুণ্য নাই, কোন অকল্যাণ নাই—

"রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চতম্।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ১০৩ সংখ্যাধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণ-বাক্য)

শত্রুগণ হরিভজনকারী ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না, গ্রহকুল বাধা প্রদান করিতে পারে না, রাক্ষসেরাও তাঁহাকে গ্রাস করিবার যোগ্য হয় না।

অহো, যে ধন্যাতিধন্য অবসরে আমার নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় অকৈতব কৃষ্ণকীর্ত্তন বিতরণ করিতে চাহিতেছেন, সেই কালে যেন আমি অন্য কিছু দান চাহিয়া বা তাঁহার অন্য কোনও দানের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আত্মমঙ্গলের অনর্পিতচর মহাসুযোগ না হারাই—শেষে অপরিশোধ্য অনুতাপে তপ্ত হইতে হইবে।

* * * *

"ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ॥
স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যাত্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বর'ৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ॥"

(ভাঃ ৪।৯।৩৪-৩৫)

অহো, ভবচ্ছিদ্ সংসার-ছেদক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াও ভাগ্য-বিবর্জ্জিত আমি আবার সেই অসৎ সংসারই প্রার্থনা করিতেছি। হায়, যেমন নির্ধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির

নিকট সতুষ-তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত যে, শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্‌বস্তু প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি—গুরু- পাদপদ্ম আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, আর আমি মূঢ়তা-বশতঃ তাঁহাদের নিকট অভিমানসেতু প্রার্থনা করিয়াছি।

—:০:—

আমার নির্জ্জন ভজন

আমি নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসী। 'ভজনানন্দী' বলিয়া প্রচারিত হইবার বাসনায় আমি গৃহত্যাগী। 'অধিবাসী' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় আমি দেশত্যাগী। 'ত্যাগী' ও 'বিরক্ত' বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছায় আমি কৌপীনধারী। আবার মর্কট বৈরাগী হইতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিবার জন্য আমি স্ত্রী-সম্ভাষণ ও ধাতুপাত্র প্রভৃতি পরিত্যাগকারী। কখনও বা আমাকে শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভুর সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সারাদিবসান্তে ঘোলপানকারী। কখনও আবার শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়ের—"অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব বেশে ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে"—এই বাক্যের একমাত্র 'মর্য্যাদা-রক্ষা-কারী' এবং লোকলোচনের নিকট মহাত্যাগী বৈষ্ণব বলিয়া প্রচা-রিত হইবার জন্য লোকের প্রদত্ত অর্থ-বস্ত্রাদি অগ্রাহ্যকারী। কখনও বা 'ঢঙ্গ বিপ্রের' শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচরণ অনুকরণ

করিবার ন্যায় অনর্থ নির্ম্মুক্ত পরমহংসকুলের নির্ব্যলীক ভজন চেষ্টায় ভোগবুদ্ধি করিয়া মাধুকরীজীবী।

আমি অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার প্রভাব এখনও বুঝিতে পারি নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" – অর্থাৎ সূরিগণও যে নিরস্ত কুহক সত্য বস্তুতে মোহ প্রাপ্ত হন, এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমি সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের লীলাশ্রবণকারী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য বহুবার বহু কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও ১০ম স্কন্ধের ব্রহ্মমোহন ব্যাপারটীর তাৎপর্য্য আমার মায়াবিজৃম্ভিত দৃষ্টির দুর্ভেদ্য স্তর ভেদ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতা পর্যন্ত যে মায়াবৈচিত্রে নানাভাবে মুগ্ধ হন, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই, শুনিয়াও শুনিতে পারি নাই। অথবা যাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি তাঁহারা বিপ্রলিপ্সার দ্বারা আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। কিম্বা তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত।

তাই আমি মায়াবাধিত দৃষ্টিতে কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানকাণ্ডও ভক্তি বিরোধী বলিয়া ত্যাজ্য মনে করিয়াছি বটে এবং ভক্তের পোষাকও লইয়াছি বটে কিন্তু আমি প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। ভক্তের পোষাক পরাই আমার সার হইয়াছে, কপটতাই আমার বৈষ্ণবতা হইয়াছে, আত্মবঞ্চনা পরবঞ্চনাই আমার ধর্ম্ম হইয়াছে, প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগী বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াও প্রতিষ্ঠা ভিক্ষাই আমার তপস্যা হইয়াছে। আমার

নির্জ্জন ভজন, আমার ত্যাগ, আমার সারাদিবস পরে ঘোলপান, আমার ধাম বাস, আমার লীলা-স্মরণ, আমার মাধুকরী-গ্রহণ, আমার ধাতুপাত্র পরিত্যাগ, আমার কৌপীনধারণ, আমার অর্থাদির প্রতি-মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণের প্রতি বিতৃষ্ণা, আমার কুটীর বাস, আমার বিষয় ত্যাগ, আমার স্বজন-পরিহার, আমার লোকালয় পরিত্যাগ, আমার শিষ্যাদি গ্রহণ না করা—ইহারা সকলেই আমাকে বিষ্ণুর দাস্য হইতে বিচ্যুত করিয়া ফল্গুত্যাগী বা জ্ঞানকাণ্ডী করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণবতার প্রাণহীন আচরণগুলি আমাকে অবৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছে। তবে উহারা জগতের লোকের নিকট 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন করে নাই। তাই আমি উহাদিগকে সাদরে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আমার ছদ্মবেশী মিত্রগুলিকে শত্রু বলিয়া চিনিতে পারি নাই। শ্রীল দাস গোস্বামীর 'কৃষ্ণ' প্রীতে ভোগ-ত্যাগের আদর্শ ছিল–তাঁর কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী আনু-রক্তি কিন্তু আমার ত্যাগ কপট আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার আদর্শ। তাই এক সময় আমার পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কোন কৌপীনধারী ব্যক্তি- ,অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরের সহজভজন চেষ্টার কৃত্রিম অনুকরণ করিয়া বাবাজী মহারাজের ন্যায় তিনিও পুরীষত্যাগের স্থানে কপট ভজন চেষ্টা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল গৌরকিশোর—"আপনার ন্যায় মহদ্‌ব্যক্তির সঙ্গ আমার ন্যায় দীনব্যক্তির' কখনই বাঞ্ছনীয় নহে,

অতএব আপনি আপনার যোগ্য স্থানে গিয়া ভজন করুন্" – এই-রূপ ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ঐ ব্যক্তির সঙ্গ অসৎসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণবতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার কি দুর্দ্দৈব ! আমি সেই সকল মহাত্মগণের শিক্ষাগ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলাম না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কথা বলিতে গিয়া—"রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা"—যে উক্তি করিয়াছেন, সেইরূপ কথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের আচরণে প্রতিফলিত হইলেও এবং তিনি অনিকেত-ভাবে অবস্থান ও অপক্ক তণ্ডুল মাত্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইলেও তাঁহার পরম সুহৃদ্ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন চেষ্টাকে বিশেষ সম্মান ও আমার শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভজন চেষ্টা তাঁহার (শ্রীল গৌরকিশোর) অপেক্ষাও অধিকতর বৈরাগ্যময়ী ও কৃষ্ণ তোষণ-পরা এবং ধামবাসি-নামে-পরিচিত, ধাতু পাত্র ত্যাগকারী, মাধু-করিজীবি, কৌপীনধারী ব্যক্তিগণের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কায়িত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার কথা শত সহস্রবার কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্বের নিগূঢ়ত্ব ও সূক্ষ্মত্ব শিক্ষা প্রদান করিলেও আমি এ শিক্ষা গ্রহণ করিলাম না।

আমি এতই ভাগ্যহীন যে, মনে করি, শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন বলিয়া

বা বহু বহু গ্রন্থপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, আমা অপেক্ষা কিছু কম ত্যাগী !' শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ধাতুপাত্রপরিত্যাগকারী আমা অপেক্ষা বৈষ্ণবতায় ন্যূন ছিলেন ! আমি প্রতিষ্ঠাত্যাগী নির্জ্জন ভজনানন্দী আর যেহেতু তাঁহারা লোকসমাজে বিচরণ করিতেন সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছিল ! কিন্তু হায়, আমি কি দৈবীমায়াবিমোহিত ! নির্জ্জন ভজনানন্দই আমার বন্ধনের কারণ, আমার কৌপীনই আমার বিষয়, আমার ধাতু পাত্র পরিত্যাগ করাই আমার প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষা আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি মনোধর্ম্মী হইয়া দ্বৈত বস্তুতে ভদ্রাভদ্র বিচার করিতেছি। তাই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাসুখতাৎপর্য্য বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। আমি মনে করি, নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাস শ্রীল মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচারক হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিয়া-ছিলেন বলিয়া এবং আমার ন্যায় কেবল লোকদেখান স্মরণাদিতে কাল কর্ত্তন করেন নাই বলিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় ভৌমবৃন্দাবনে বাস করেন নাই বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী ছিলেন না ! তাঁহারা আমার ন্যায় ধামবাসী ও রাধাকুণ্ডতটবাসী ছিলেন না !

অক্ষজজ্ঞানে আমার দৃষ্টি এত দূর আচ্ছন্ন যে, আমি কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে, 'গ্রহণ' ও 'ত্যাগ' হইতে 'সেবা' বা বৈষ্ণবতার

পার্থক্যটী বুঝিতে পারি না। গ্রহণ ও ত্যাগ ধর্ম্মেই আমার রুচি কখনও গ্রহণ ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া ত্যাগ ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া, বলিয়া থাকি - আমি ভগবানের মনোঽভীষ্ট প্রচারক একটি জীব—সৃষ্টিকার্য্য বৃদ্ধি করাই পরমেশ্বরের অভিমত। সুতরাং গ্রহণধর্ম্মে আসক্ত না হইলে—"সৃষ্টিরক্ষা হইবে কি প্রকারে ?" কখনও বা গ্রহণধর্ম্মের মধ্যে মিছাভক্তির আবরণ দিয়া নিত্যানন্দের চরণে অপরাধ করিতে করিতে বলিয়া থাকি, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন সুতরাং সেই নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া আমিও পশুর ন্যায় আচরণ করিব। কিন্তু যদি কেহ দেখাইয়া দেন যে, ঐরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও বলেন নাই বা উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে, আর যদি অভিপ্রেতই হইবে তাহা হইলে সেটীও নিত্যানন্দের ন্যায় বিষ্ণুবস্তুর পক্ষে শ্রীচৈতন্যতোষণকল্পে একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব, অপরে সম্ভব নহে। এবং যদি ঐরূপ বংশ-পরম্পরা রক্ষা করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি বীরভদ্র প্রভুকে নিঃসন্তান করিলেন কেন ?" এই সকল যুক্তির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া আমি গৃহব্রতধর্ম্মকেই, শুক্র-শোণিতজাত দেহকেই বহু মানন করিয়া শ্রুত্যুক্ত বীরোচনের ন্যায় দেহারামী হইয়া পড়ি।

আবার সময় সময় গ্রহণধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাশাটা কিছু কম পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া ও 'কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগী' শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-পর নিষ্কিঞ্চন যুক্তবৈরাগ্যবান্ মহজ্জনের বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠায় ভোগবুদ্ধি

করিয়া ফল্গুত্যাগধর্ম্মকে 'সেবাধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা পূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাকে বরণ করিয়া লই। আমার প্রত্যক্ষজ্ঞানজাত মনোধর্ম্ম ফল্গুত্যাগ, কপটত্যাগ, বা ভক্তির নামে মায়াবাদীর চিত্তবৃত্তিকেই ন্যূনাধিক বরণ করিয়া কৃষ্ণতোষণপর ভক্তিবৃত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। আমি তখন নিজেকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াও গৌড়ীয়ের একমাত্র গৌড়ীয়ত্বটি যে স্থানে অবস্থিত সেই মূল কেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাধারণ সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি। আমি তখন বলিয়া থাকি, নবধা ভক্তির যে কোন একটী যাজন করিলেই বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটী ভুলিয়া যাই, আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামীর ভক্তিসন্দর্ভপ্রতিপাদ্য—'যদ্যপ্যন্যভক্তি কলৌ কর্ত্তব্য তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা"—অর্থাৎ কলিতে নববিধভক্ত্যঙ্গ যাজন কর্ত্তব্য হইলেও ঐ সকল কীর্ত্তনমুখে হইলেই ফলপ্রসূ হয়, এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লিখিত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায়-প্রেমধন॥"

এবং রূপানুগ রসিককুলচূড়ামণি আচার্য্যবর শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের 'সারার্থ দর্শিনীর' সারার্থ—'শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ'—আচার্য্যগণের এই সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কীর্ত্তন ছাড়িয়া 'নির্জ্জনভজনানন্দীর' প্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রসাদ-লাভের জন্য

নানাবিধ ফল্গুত্যাগ দেখাইয়া থাকি। 'ভক্তিরসামৃত' ও উজ্জ্বল-নীলমণির আলোচনার ধৃষ্টতা দেখাইলেও—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

"শ্রীহরি সেবায়, যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"

এবং

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ!
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

"আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ-রহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর এই সকল উপদেশ লোকের নিকট
ঢাকা দিয়া থাকি, কখনও বা নানাপ্রকার কদর্থ করিয়া থাকি।
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসনৎকুমার পৃথু মহারাজকে যে অমুল্য উপদেশটী
প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না—

"অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরেগুর্ণপীযূষপানাৎ॥

অর্থাৎ ধন ও রূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয় তর্পণরত অসদ্-
ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাঁহাদিগের অভিমত অর্থকামাদি
পরিত্যাগ ও নির্জ্জন বাসে অভিরুচি,—এই সকল দ্বারা আত্মার

সন্তোষলাভ হয়, কিন্তু যে স্থানে সন্মুখরিত হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জন বাস কখনও স্পৃহা করিবে না; কারণ উহাদ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেও কৃষ্ণতোষণ হয় না।

কিন্তু আমি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকেই ভজন, কামকেই প্রেম, ভোগোন্মুখতাকেই সেবোন্মুখতা, নামাপরাধকেই নাম, মায়াকেই কৃষ্ণ, আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নির্জ্জনবাসকেই আমার ভজন বলিয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করিতেছি। তাই, নিষ্কপট ভজনানন্দিগণ আমাকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলিয়া থাকেন।

কিন্তু হায়! শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল উপদেশ আমার ভোগোন্মুখ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে না। আমি প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মের নানা প্রকার অভিনয় দেখাইতে যাই বটে, কিন্তু আমার বিষয়মলিন প্রাকৃতচিত্ত অপ্রাকৃতবস্তুর আস্বাদে সমর্থ হয় না। আমি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন"—এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া বিষয় বা অনর্থযুক্ত চিত্তে নিজকে ধামবাসী বলিয়া—ভজনানন্দী বলিয়া মনে করি। আমি সংসার ত্যাগ করিয়াও যে বিষয়ী, কৌপীন লইয়াও যে পরম সংসারী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থপ্রচার, নামপ্রচার, শ্রীবিগ্রহ, মন্দির প্রতিষ্ঠা, ধাতুপাত্র গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া বা না করিয়াও যে সংসারাসক্ত, শ্রীহরিদাস, রায় রামানন্দ, প্রভৃতির ন্যায় অক্ষজনেত্রে ভৌম ব্রজবাস বা রাধাকুণ্ড তটাশ্রয় ত্যাগ না করিয়াও যে কুণ্ডতট কেন বিরজারও নিম্নে অবস্থিত তাহা আমি ভাবিতে পারি না।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীনরোত্তম প্রভৃতির আচরণের প্রতিকূলে শিষ্য না করিয়াও অথবা পরমবিরক্ত ব্রজবাসী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় বহু শিষ্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকিয়াও আমার যে শিষ্যানুবন্ধ, জনানুবন্ধ, বিষয়ানুবন্ধ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে—আত্ম-বঞ্চিত আমি তাহা ধরিতে পারি না। তাই, কখনও কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বেই ব্যবসায়ী প্রচারক হইয়া পড়ি এবং গৃহব্রত ধর্ম্মকে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া থাকি; কখনও আবার প্রতিষ্ঠা লইবার জন্য কীর্ত্তন ছাড়িয়া নির্জ্জনভজনানন্দী হই।

কিন্তু হায়! আমি কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ মান্য করিয়া একবারও নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলাম না। তাই, আমার চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইল না। আমার মলিন-চিত্ত মনোধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া আমাকে যে পথে চালাইতেছে, আমি সেই পথেই চলিতেছি। তাই মহাজন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন—

"দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব ?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরি নাম কেবল কৈতব ॥"

* * *

প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, নির্জ্জনতা জালি
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব ॥

মাধবেন্দ্রপুরী ভাবঘরে চুরি
না করিল কভু, সদাই জানব ॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
তা'র সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে তুমি জড়রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব ॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন
প্রচারিছ ছলে কুযোগি বৈভব।
প্রভু সনাতনে পরম যতনে
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব ॥
সেই দু'টী কথা ভুল'না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরি নাম রব।
'ফল্গু' আর যুক্ত' বদ্ধ আর মুক্ত
কভু না ভাবিহ একাকার সব ॥

* * *

মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব।
যে ফল্গু-বৈরাগী কহে নিজে 'ত্যাগী',
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।

হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি'
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব ॥
রাধাদাস্যে রহি' ছাড়ি' ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা—নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা নিত্যজন. তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব ॥
ব্রজবাসিগণ প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তা'রা নহে শব ॥
প্রাণ আছে তা'র, সেহেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥
শ্রীদয়িত দাস কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥"

—:•:—

সাধুর অনুসন্ধান

গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে 'শ্রদ্ধা' সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রেমলাভের যে ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে 'শ্রদ্ধা'র পরেই 'সাধুসঙ্গের' কথা আছে। সুকৃতিশালী

শ্রদ্ধাবান জীবই প্রকৃত সাধুর সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত ও যত্নবান্ হন।

সাধু-সঙ্গ করিতে হইলে প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অসাধুকে 'সাধু' মনে করিয়া তাহার সঙ্গ করিলে কখনই প্রকৃত মঙ্গললাভ হইবে না।

প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান সযত্নে করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু এক শ্রেণীর লোকের এইরূপ স্বভাব যে, ইহারা সত্যের অনুসন্ধান করিবার আবরণে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে **আধ্যক্ষিকতাকেই সত্যানুসন্ধিৎসা মনে করেন।** ইহা ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসা-মূলক এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও কপটতা। প্রচ্ছন্ন আধ্যক্ষিকের স্বভাব এই যে, তিনি সত্যানুসন্ধান করিবার ছলে কেবল নূতন নূতন ধর্ম্মমত, নূতন নূতন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ও নূতন নূতন সাধুর ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। ইষ্টবস্তুর (?) আবাহন ও বিসর্জ্জন, গ্রহণ ও ত্যাগের ঘূর্ণীবাত্যার মধ্যে আপনাকে পাতিত করিয়া উহাকেই সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া কল্পনা করেন। সত্যানু-সন্ধিৎসুর অভিনয়ে আজ তিনি যে মত, পথ বা ব্যক্তিবিশেষকে অনেক বিচার যুক্তির দ্বারা একমাত্র বাস্তব সত্য বা একমাত্র সাধু, গুরু, বৈষ্ণব বা ইষ্টদেব বলিয়া আবাহন করিলেন, যাঁহাদের জন্য অপরের সহিত কতই না সংগ্রাম করিলেন, কএকদিন যাইতে না যাইতেই সেই একমাত্র বাস্তব সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন বা অদ্বিতীয় সাধু-গুরু বৈষ্ণবকে জঘন্যতম অসাধু ও বঞ্চক বলিয়া চিরতরে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন। এইরূপ আবাহন ও বিসর্জ্জন, শ্রীবিগ্রহ গড়া ও ভাঙ্গার স্বভাব নৈসর্গিক নির্ব্বিশেষ-

বাদিগণের চরিত্রে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঁহারা যখন ইঁহাদের পূর্ব্বস্বীকৃত 'বাস্তব' সত্যকে পরমুহূর্ত্তে 'অবাস্তব' বলিয়া প্রচার করেন, তখন তাঁহারা যুক্তি প্রদান করেন যে, তাঁহারা অনুসন্ধিৎসার পথে চলিয়াছেন, কাজেই এইরূপ আবাহন ও বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতেই একদিন না একদিন খাঁটি সত্য পাইয়া যাইবেন। আরোহবাদী আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের এইরূপ যুক্তি ভগবদ্ভক্তি-যাজনের অভিনয়কারী প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণের চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন এক প্রথিতনামা ধর্ম্মনেতা পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতে করিতে তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি হয়। তিনি উপবীতাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচারক হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মমত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার দুইজন নিকট আত্মীয় কোন এক ব্রাহ্ম-নেতার নিকট যাইতেছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বাধা প্রদান করেন, এমন কি, সেইজন্য তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু সেই ব্যক্তিই আবার তাঁহারই নিন্দিত মতকে প্রকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। পরে আবার সেই ব্রাহ্মমত পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোন যোগীকে প্রকৃত সাধু বলিয়া স্থির করেন এবং যোগমিশ্রিত কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের মতবাদ অবলম্বন করিয়া বহু শিষ্য করিতে আরম্ভ করেন।

আর এক পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-নেতা পূর্ব্বে শিব-ভক্ত ছিলেন। শিব-রাত্রি-দিবস সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া যখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কোন শিবমন্দিরে শিবের পূজা প্রদান করিতে গিয়াছিলেন, তখন দেখিলেন, কতকগুলি মূষিক শিব লিঙ্গের সম্মুখে প্রদত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে ও শিবলিঙ্গের উপর অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে, ইহা দেখিবামাত্রই তাহার শিবভক্তি (?) সমূলে উৎপাটিত হইল ! তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, যদি শিব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই হইবেন, তবে মূষিকগুলি তাঁহার উপরে বিচরণ করিতেছে কেন ? তিনি পরে সন্ন্যাসী সাজিয়া ভগবদ্বিগ্রহ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ছিদ্র অনুসন্ধানকেই 'সত্যানুসন্ধান' বলিয়া জগতে প্রচার পূর্ব্বক এক বিরাট্ আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় শত শত ব্যক্তি সত্যানুসন্ধানের ছলে আধ্যক্ষিক ও হরিগুরু-বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে !

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আশ্রিত হইবার অভিনয় করিয়া কোন এক ব্যক্তি প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনেতা হইয়া জাতি-গোস্বামী ও ভাড়াটিয়া প্রচারকদলের বিরুদ্ধে প্রচারক হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার জীবনে সকল ধর্ম্ম-মত ও সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দেরই সাধুত্ব ও গুরুত্বের আস্বাদন (!) করিয়া অবশেষে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের (?) স্তাবক হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণের কথা আধ্যক্ষিক কর্ণে শ্রবণ করিয়া তিনি প্রকৃত ভক্তির ও ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার অশেষ

প্রশংসিত মহাজনেরই (?) নিন্দক হইয়া পড়েন ও তাঁহার অসদ্‌গুরু-পরিত্যাগ এবং সদ্‌গুরু ও সংসঙ্গ লাভ হইয়াছে, ইহা বড় বড় সভাসমিতিতে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে প্রচার করিতে থাকেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সদ্‌গুরু আস্বাদন করিবার 'সখ' কিছু দিনের মধ্যেই মিটিয়া গেলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে অধিকতর সৌন্দর্য্য দেখিতে পা'ন, মহাপ্রভু হইতেও যিশুখ্রীষ্টের অধিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর আচার ও বিচার তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধান না করায়, তিনি মনোধর্ম্মের আবাহন ও বিসর্জ্জনের ঘূর্ণী বায়ুতে পতিত হন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এখনও উত্তর প্রদান করেন যে, "তিনি সত্যানুসন্ধিংসু ; যদি ভুলক্রমে কোন অসত্যকেই 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে গোঁড়ামী লইয়াই বা চিরকাল বসিয়া থাকিবেন কেন? প্রচ্ছন্ন পঞ্চোপাসকগণ এইরূপ মনোধর্ম্মের আবাহন ও বিসর্জ্জন-রূপ আধ্যক্ষিকতাকেই সত্যানুসন্ধিংসা মনে করিয়া নিত্য নূতন সাধুগুরুর প্রতীক গড়িয়া থাকেন ও পরমুহূর্ত্তেই তাহা ভগ্ন করেন।

পুরাণে এই জাতীয় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অনেক উদাহরণ আছে। বাণ রাজা শিবের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তাবক বলিয়া আপনাকে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু মহাদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত অস্ত্র অর্থাৎ সহস্র বাহুদ্বারা মহাদেবেরই সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

বৃকও সেইরূপ শিবের স্তাবক ছিলেন। অনেক তপস্যা

করিয়া বৃক বৈষ্ণবরাজ শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন যে, তিনি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবেন, সেই ব্যক্তির তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য শিবের মস্তকেই হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হন। যাঁহারা আধ্যক্ষিকতাকেই সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের বিচারও এইরূপ। যখন কোন প্রকৃত সাধু 'কৃষ্ণাভক্ত ও যোষিৎসঙ্গীর' বিরুদ্ধে প্রচার করেন, তখন আধ্যক্ষিক সেই সাধুর মস্তকেই হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়! মহাপ্রভু "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে" বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং রামচন্দ্রপুরী সেই অস্ত্র মহাপ্রভুর অঙ্গে (?) নিক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হন। রূপ-কবিরাজ বৃকের ন্যায় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মস্তকে হস্তস্থাপন (?) করিয়া তাঁহার সাধুত্ব পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এইরূপ প্রবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে কখনও সাধুর সঙ্গলাভ হয় না। কেবল সংশয়াত্মা হইয়া গঙ্গাতীরে জল-লাভের আশায় নিত্য নূতন কূপ সম্পূর্ণভাবে খনন করিবার পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়, অর্থাৎ গঙ্গার জলও লাভ হয় না, কোন একটি কূপকে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক পূর্ণভাবে খনন করিয়া তাহা হইতে জলও পাওয়া যায় না; ফলে গঙ্গার তীরে অবস্থান করিয়াও ঐ আধ্যক্ষিক ব্যক্তিকে জলাভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ আত্মহত্যাই হরিগুরুবৈষ্ণবের চিদ্বিলাস-অঙ্গীকারকারী নির্ব্বিশেষবাদীর চরম প্রাপ্য প্রয়োজন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্ম্মে বলিয়াছেন,—

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন। কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।"

(জৈবধর্ম্ম, ৭ম অধ্যায়)

অন্যত্র শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধু-সঙ্গের কোন ফল লাভ করি না।"

(সজ্জনতোষণী ১৫/২)

সাধুর অনুসন্ধানকালে আমরা গোড়ার কথাটি ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি, আমরা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-সুনীতি, বিচার-শক্তি প্রভৃতি পরিমাপ-যন্ত্রের বলে সাধু চিনিয়া লইতে পারি! আমাদের হাতে কষ্টি পাথর আছে, তাহাতে সাধুরূপ স্বর্ণ ও অসাধুরূপ 'মেকী-সোনা' আমরা কষিয়া লইতে পারিব; কিন্তু আমাদের হাতে যদি কষ্টি-পাথর থাকিবেই, তবে আমরা প্রতি মূহূর্ত্তে 'ভাঙ্গা-গড়ার' কৈঙ্কর্য্য করি কেন? আমাদের সিদ্ধান্তের স্থিরতা নাই কেন? আমরা বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত হই কেন? যাঁহার নিকট কষ্টি-পাথর আছে, তিনি ভাঙ্গা-গড়া অর্থাৎ মনোধর্ম্মের দাস নহেন, তাঁহার সিদ্ধান্তে অস্থিরতা নাই, হৃদয়ে সংশয় নাই, চিত্তে দোদুল্যমানতা নাই, নিষ্ঠার মধ্যে যবনিকা-পাত নাই; তাঁহার পতিব্রতা ধর্ম্মের মধ্যে ব্যভিচারিণীর চিত্তবৃত্তি নাই, তাঁহাকে কোন

অসাধু 'সাধু' বলিয়া বঞ্চনা করিতে পারে না, তাঁহার নিকট কোন প্রকৃত সাধু আত্মগোপনও করিতে পারেন না।

সাধুর কৃপায়ই সাধুকে চেনা যায়, সাধুর দেওয়া চক্ষুতে সাধুকে দেখা যায়, সাধুর নিকট প্রাপ্ত দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই সাধুর ক্রিয়ামুদ্রা উপলব্ধি করা যায় —এই ভাবেই প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান হয়।

শ্রীগৌরপার্ষদ জগদানন্দ গাহিয়াছেন,—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥"

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চক্ষু গৌরসুন্দরের সাধুত্ব দেখিবার পরিবর্ত্তে জিহ্বা-লাম্পট্য দর্শন করিয়াছে, নবদ্বীপের পাষণ্ডী হিন্দু-গণ মহাপ্রভুতে সাধুত্ব দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার অসদা-চার ও দুর্নীতি দর্শন করিয়াছে, অমোঘ মহাপ্রভুতে সাধুত্ব দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ঔদরিকতা দর্শন করিয়াছে।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র আধ্যক্ষিক চক্ষুতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্বৎসন্ন্যাসী রায় রামানন্দে যোষিৎসঙ্গ (!) দর্শন করিয়াছেন, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত লোকশিক্ষার্থ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিতে সাধুত্ব দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে বিষয় ও বিলাস দর্শন করিবার অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু তাহা-দের পরবর্ত্তী আচরণ ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে, সাধুর কৃপায় সাধুর সন্ধান পাওয়া যায়। সাধুর কৃপায় সাধুর অনুসন্ধান না করিয়া অন্য চেষ্টার দ্বারা সাধুর অনুসন্ধান করিতে গেলে অপরাধ ও নির্ব্বিশেষবাদ-মাত্র ভাগ্যে লাভ হইবে।

নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় দুর্ভাগ্য আর নাই, পাপী সবিশেষবাদী বরং মন্দের ভাল, কিন্তু তপস্বী নির্ব্বিশেষবাদী কোন মতেই ভাল নহে, তাহার সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসঙ্গ। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ইহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-জগতে পাপ যতটা ক্ষতি করিতে না পারিয়াছে, নির্ব্বিশেষবাদ তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ক্ষতি করিয়াছে। চার্ব্বাকের মত ধর্ম্মমত বলিয়া খুব কমই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধার্থের মত, মহাবীর, পরেশনাথ প্রভৃতির মত, অষ্টাবক্র, শক্তি প্রভৃতির মত, শঙ্করাচার্য্যের মত, পৃথিবীর শতকরা শতজন তথাকথিত ধার্ম্মিকই শ্লাঘ্য ধর্ম্মমত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, তাহাদের সুনীতি, ত্যাগ-তপস্যার ঐশ্বর্য্যে জীবের চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছে। একমাত্র গৌরভক্তগণই ঐরূপ আধ্যক্ষিকতার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া চিদ্‌বিলাসের জয়গান করিয়াছেন।

সাধু ও গুরুর অনুসন্ধান করিবার কালে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতে জাত নির্ব্বিশেষবাদ দৈত্য আমাদের সত্যানুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। সেই দৈত্যের পরামর্শে আমরা মনে করি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী তপস্বীই প্রকৃত সাধু। হরিগুরু বৈষ্ণবের চিদ্বিলাসের প্রতি নাস্তিক করিয়া দেওয়াই নির্ব্বিশেষবাদ-দৈত্যের প্রতিজ্ঞা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুর অন্য কোন সংজ্ঞা না দিয়া কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন, "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী-সম্প্রদায় কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববেতৃত্ব বা কৃষ্ণে অনন্যশরণা-

গতিরূপ কোন লক্ষণকে প্রকৃত গুরু ও সাধুর লক্ষণ বলিয়া বর্ণন করেন নাই। অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, যোগি-সম্প্রদায়ের তটস্থ লক্ষণের প্রতি অধিক আদর আর সবিশেষবাদিগণের নিকট স্বরূপ-লক্ষণের প্রতি অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছন্ন আধ্যক্ষিক তথাকথিত সাধুর ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া সাধু ও গুরু-পরিত্যাগের প্রতি উৎসাহবিশিষ্ট কিন্তু নিজের রিপু ও মনোধর্ম্মরূপ দুষ্ট গুরুর সঙ্গ পরিত্যাগে উদ্‌যোগী নহেন। স্ব-স্ব-রিপুচাঞ্চল্য, মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য, সিদ্ধান্তের অস্থিরতাকে তাহারা সযত্নে অনুকূল খাদ্যাদি-দানে পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন! তাঁহারা মনে করেন যে, নিজের মঙ্গল-সংগ্রহ ও পরের উপকার করিবার জন্যই তাঁহারা প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধানে আধ্যক্ষিকতার পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তিবৃত্তির প্রবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে আধ্যক্ষিকতার প্রবৃদ্ধির ফলে তাঁহাদের স্ব-পর মঙ্গলের অনুসন্ধান (?) মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবনবৎ ব্যাপার হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তের পথ এইরূপ নহে। মায়াধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি নহে। ভগবদ্ভক্ত **কৃপার অবতারের** জন্য অত্যন্ত **ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু** হইয়া সেবার পথই বরণ করেন। **আগে সত্যানুসন্ধান, পরে সেবা, ইহা আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদীর পথ,** ভগবদ্ভক্তির পথ নহে। **সেবার সঙ্গে সঙ্গে কৃপার অবতার, সত্যের স্বতঃপ্রকাশ** ও সত্যের সুদৃঢ় পরিচয় ভক্তি পথে পাওয়া যায়। **ভক্ত সেবার পথেই সত্যের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন;** সেবা ছাড়িয়া আরোহ

চেষ্টায় সত্যের বা সাধু-গুরুর অনুসন্ধান করেন না। সেবা পরিত্যাগ করিলে, প্রীতিপূর্ব্বক সেবায় সতত সংযুক্ত না থাকিলে বুদ্ধিযোগ কোথায় পাওয়া যাইবে? সাধুর কৃপা ব্যতীত কে প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান প্রদান করিবে? **যদি তপস্যা, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, সুনীতি, বিচারশক্তি এইসকল প্রকৃত সাধুর ও গুরুর সন্ধান দিতে পারিত, তবে অভক্তির দ্বারাই ভক্তির সন্ধান লাভ হয়;** ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যার দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া যায়—ইহাই **প্রমাণিত হইত।** প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সাধু দেখিতে পারা গেলে মহাজনগণ সাধুর বাণীর শুশ্রূষু সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারাই সাধু-দর্শনের কথা উপদেশ করিতেন না।

সাধুর আচার ও প্রচারের সামঞ্জস্যকেই বা আধ্যক্ষিকতা কিরূপে পরিমাপ করিতে পারিবে? **"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"**—এই মহাজনের সিদ্ধান্ত-বাক্যটি কি বন্ধ্যা যুক্তি-বিশেষ? শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের এই সকল কথা কি নিরর্থক?—

"অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৯।৩৮৭-৩৮৯

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সমদৃষ্টি-ফলে নরকে গমন করে। তাহারা বৈষ্ণবের মধ্যেও অসতের দুরাচার দর্শন করে ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব কখনও দুরাচারী নহেন। ভগবৎ-কৃপা না হইলে **ভক্ত-চরিত্রের আপাত দর্শনে কাহারও সর্ব্বনাশ** হয় এবং কেহ অপরাধ না করিয়া অপরাধ হইতে দূরে থাকেন। যাহারা সাবধানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন না ও ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের অমঙ্গল-লাভ ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্ দিব্যবুদ্ধি প্রদান করেন ; তাঁহাদের কোন অমঙ্গল আশঙ্কা থাকে না। **বিপৎ-প্রতিম ব্যাপারসমূহ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের অমঙ্গল লাভ ঘটে না।** ন্যূনাধিক ষষ্টি-বৎসর পূর্ব্বে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের, প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কৃপা-পরীক্ষা-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" —(গৌড়ীয় ভাষ্য)

পুরীর কাঁন্থাধারী শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয়, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বাবাজী মহাশয় সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং সকল কথা জানিতেন।" (স্বলিখিত জীবনী ১৪১ পৃঃ) বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনিও এক সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র বুঝিতে না পারায় তাঁহার অপরাধ হইয়াছে বলিয়া ঠাকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কাজেই "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"—এই মহাজন-বাক্য সর্ব্বতোভাবে সত্য। কন্থাধারী শ্রীরঘুনাথদাসমহাশয়ের ন্যায় বৈষ্ণবগণও যখন ভগবদ্ভক্তের চরিত্র বুঝিতে অসমর্থ বলিয়া অভিনয় করেন, তখন মনোধর্ম্ম-বশীভূত,

অনর্থযুক্ত, দোষ-চতুষ্টয়ের অধীন ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা ও চরিত্র বুঝিতে অসমর্থ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মনোধর্ম্মের কথায় পড়িয়া যদি আমরা গুরুবৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসি, তবে কি আর কোন দিন মঙ্গল লাভ করিতে পারিব? অতএব সাধুর অনুসন্ধান করিতে গিয়া যেন আমরা আধ্যক্ষিক-তাকেই সাধু ও গুরু করিয়া না ফেলি! মহতের ছিদ্রানুসন্ধিৎসাকে সত্যানুসন্ধিৎসা মনে না করি, প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রতারিত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে অবহেলা না করি। যাহারা এই ভক্তির অনুকূল বিচারকে, অন্বয়বিচারকে বরণ না করিয়া নিত্য নূতন প্রতিমা-ভাঙ্গাগড়ার বিচারে প্রধাবিত হইবে, তাহাদের আধ্যক্ষিক পরামর্শে চরমে অধঃপাত ব্যতীত আর কোনই ফল লাভ হইবে না।

—:•:—

ভক্তিলতা-বীজ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরূপশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় **ভক্তিলতা-বীজ**॥
মালী হঞা করে' সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥

তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে' আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে' প্রেম-ফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা॥
তা'তে মালী যত্ন করি' করে' আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তা'র লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটি', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে' আস্বাদন॥
এই ত' পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁ'র আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

(চৈ চ ম ১৯।১৫১-১৬৪)

শ্রীরূপশিক্ষার এই একটি সারগর্ভ উপদেশ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়,—ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও জীবের ভববন্ধক্ষয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তিনি মহতের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হ'ন। সেই সুকৃতিমান্ জীব সদনুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কৃপার বাহন গুরুরূপী মহতের কৃপায় হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হ'ন। সেই ভক্তিলতা-বীজই প্রেমফলরূপে সংপ্রকাশিত পরমপুরুষার্থ বা জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

ভক্তিলতার বীজ একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রসাদে লাভ হয়। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই ভাগ্যবান বা সুকৃতিশালী। এই ভক্তিলতা-বীজটি কি বস্তু? ইহা কি ভক্ত্যুন্মুখী 'সুকৃতি' অথবা ইহা কি 'শ্রদ্ধা'?

যদি ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই ভক্তিলতা-বীজ হয়, তবে 'ভাগ্যবান্ জীব বা সুকৃতিমান্ জীব ইহা লাভ করেন', এইরূপ উক্তির সার্থকতা থাকে না। সুকৃতিমান্ জীব 'সুকৃতি' লাভ করেন, ইহা পিষ্টপেষণ-ন্যায়ের ন্যায় নিরর্থক অর্থাৎ ধনীই ধনলাভ করিলে দাতার কৃপার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয় না। নির্ধন ধন লাভ করিয়া ধনী হইলে গুরুকৃষ্ণরূপী দাতার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। অতএব ভক্তিলতা-বীজকে কিরূপে 'ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি' বলা যাইবে?

মহাজন বলেন,—'আদৌ শ্রদ্ধা'। সকলের আদিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ আদর। শ্রদ্ধাই যদি পরমার্থ-রাজ্যের আদিস্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধাকেই ভক্তিলতা-বীজ বলা যায়। কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজন সমস্বরে বলেন,—"ভক্তিমাত্রন্তু তাং (শ্রদ্ধাং) বিনা

সিধ্যতি ; 'সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা, ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম' ইত্যাদৌ। * * * * তৎপূর্ব্বতোঽপি তস্যাঃ ফলদাতৃত্ব-শ্রবণাৎ, (ভা ৬।২।৪৯)—'ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥' —ইত্যাদৌ তয়া ফলদাতৃত্ব-সৌষ্ঠবশ্রবণাচ্চ। সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয়াবধারণস্যৈবাঙ্গম্. তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ ; ততো নানুষ্ঠানাঙ্গত্বে প্রবিশতি। ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিসাপেক্ষাপি ন স্যাৎ, দাহাদি-কর্ম্মণি বহ্ন্যাদিবৎ, ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদীনাং স্বরূপস্থ-তাদৃশ-শক্তিত্বাৎ ; ততস্তস্যাঃ শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা কুতঃ স্যাৎ ? অতঃ শ্রদ্ধাং বিনা ক্বচিন্মূঢ়াদৌ অপি সিদ্ধির্দৃশ্যতে 'শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা' ইত্যাদৌ।" (ভ স, ১৭২ অনু)

ভক্তির আকার শ্রদ্ধা ব্যতীতও হয় ; যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'হে ভৃগুবর ! শ্রদ্ধা অথবা হেলার সহিতও যদি নামাভাস হয়, তাহা হইলে তাহা মানবমাত্রকেই উদ্ধার করিয়া থাকে।' শ্রদ্ধার পূর্ব্বেও ভক্তি ফলদান করে। ইহা শ্রীঅজামিলের উদাহরণেও দৃষ্ট হয়। শ্রীঅজামিলের শ্রীভগবানের প্রতি বা শ্রীভগবন্নামের প্রতি কোনরূপ মমতা বা শ্রদ্ধার উদয় দৃষ্ট হয় নাই। তিনি পুত্রের নামের সহিত অভেদভাবে অবশে নামাভাস গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধা বা আদর—মানসিক-বৃত্তি ; তাহা শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস ; সুতরাং তাহা ক্রিয়াময়ী যে ভক্তি, তাহার অঙ্গ নহে। ভক্তি সর্ব্বদাই নিরপেক্ষা। তাহা ফলোৎপাদনে বিধি অপেক্ষা করে না ; যেমন,—দাহাদিকার্য্যে

অগ্নি কোন বিধির বাধ্য হয় না। শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপতঃই সেইরূপ শক্তি রহিয়াছে। অতএব সেই ভক্তির শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা কিরূপে থাকিবে? এই জন্য শ্রদ্ধা ব্যতীতও কোন কোন মূঢ়-প্রাণীতে সিদ্ধিলাভ দেখিতে পাওয়া যায়। হেলা যদি ইচ্ছাকৃত না হয় এবং তাহাতে কোন দৌরাত্ম্য না থাকে, তাহা হইলে শ্রদ্ধা না থাকিলেও ফল লাভ করা যায়।

সুতরাং যে শ্রদ্ধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেই প্রবিষ্ট নহে এবং যে শ্রদ্ধা ব্যতীতও ফল লাভ হয়, সেই শ্রদ্ধা কিরূপে ভক্তিলতা-বীজ বলিয়া গণ্য হইবে?

তাহা হইলে কি কর্ম্মার্পণ ভক্তিলতার বীজ? কর্ম্মার্পণকারীর শুদ্ধভক্ত সঙ্গেই নির্গুণা শুদ্ধভক্তির উদয় হইতে পারে; নতুবা জ্ঞানের দ্বার বা জ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মার্পণকেই বা কি করিয়া ভক্তিলতার বীজ বলা যাইতে পারে? শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—"সাম্মুখ্যদ্বারভূতস্য কর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্যরূপজ্ঞান-ভক্ত্যুদয়পর্য্যন্তত্বাৎ স্বয়মেব তাভ্যাং ন্যক্কারঃ।" (ভ স ১৭৬ অনু) অর্থাৎ ভগবানের সাম্মুখ্যের দ্বারস্বরূপ কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মার্পণের সাক্ষাৎসাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয়কাল পর্য্যন্ত-মাত্রই অবস্থান-হেতু কর্ম্মার্পণ তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞানী মহতের সঙ্গক্রমে কর্ম্মার্পণকারীর জ্ঞানলাভ এবং ভক্তমহতের সঙ্গ-ক্রমে কর্ম্মার্পণকারীর ভক্তিলাভ হয়।

বীজের মধ্যে মহীরুহের সমস্ত শক্তিই সূক্ষ্মাকারে নিহিত রহিয়াছে। যাহা ভক্তির অঙ্গ নহে বা যাহা বীজীভূত প্রেমভক্তি

নহে, তাহা ভক্তিলতার বীজ হইতে পারে না। কারণ, ভক্তিলতা-বীজ হইতে প্রেমফলেরই উদ্গম হয়; সুতরাং সুকৃতিমাত্র অথবা যাহা ভক্ত্যঙ্গ নহে, এইরূপ শ্রদ্ধা অথবা যাহা সাক্ষাৎসাম্মুখ্য নহে, এইরূপ কর্ম্মার্পণ সাম্মুখ্যশ্রেষ্ঠ প্রীতিফলের বীজ কিরূপে হইবে? তবে ভক্তিলতা-বীজ কি বস্তু? শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নবধাভক্তির স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।"

(ভা ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাদ্ভাবে সুখী করিবার নব প্রকার-শ্রীবিষ্ণুপর কার্য্যই 'নবধা ভক্তি'। তাহার অন্তর্ভুক্তরূপেই অন্যান্য যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ। ভক্তি বলিতে সাধারণতঃ নবধা ভক্তিই উদ্দিষ্ট হওয়ায় কেবলমাত্র নববিধা ভক্তির কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহৎ-সমাজে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য ৬৪ প্রকার বা শতসহস্র ভক্ত্যঙ্গ এই নবধা ভক্তিরই কায়ব্যূহ বা বিস্তার। ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ। শ্রীহ্লাদিনী পাদসেবন বা আরাধনার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির সহিত অবস্থিতা। এই-সকল-ভক্তি যদি অনুষ্ঠানকারীর দ্বারা শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা অর্থাৎ ভাবিতা; 'ইহা তাঁহারই সুখের জন্য' এইরূপ ভাবিতা (চিন্তিতা, ধ্যাতা) হয়, ধর্ম্মার্থকামাদিতে অর্পিতা না হইয়া কৃতা হয়, তবেই তাহা ফলপ্রসূ

হইয়া থাকে। ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্যেই বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের ধারণা বা আবেশ রাখিয়া যে ক্রিয়াময় অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই ভক্তি-যোগ-পদবাচ্য। এই যে ধারণা, ভাবনা, ভগবৎ-সুখের চিন্তা, অনুসন্ধান, ধ্যান, আবেশ বা স্মৃতি, তাহাই ভক্তিযোগের মূল। সুতরাং ভগবৎ-সুখচিন্তা বা স্মৃতিই ভক্তিলতার বীজ। শ্রীগুরু-পাদপদ্মরূপী মহৎশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বা কৃপাশক্তিরূপ এই ভক্তিলতা-বীজ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ অর্থাৎ হ্লাদিনীর বৃত্তি যে ভগবৎ-সুখানুসন্ধান-স্মৃতি, তাহা জীবহৃদয়ে অর্পিত হয়। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ব্যতীত আর কোন বস্তু শ্রীভগবান্ ও ভক্তকে সুখদান করিতে পারে না শ্রীভগবানের যে শক্তি শ্রীভগবানকে সুখদান করেন ও তৎসঙ্গে ভক্তকেও সুখদান করেন, তাহাই প্রীতি বা প্রেম। যেখানে প্রীতি আছে, সেইখানেই স্মৃতি বা অভীষ্ট বস্তুর সুখচিন্তা আছে। লোকে নিজে নিজে, অপরের অনুকরণে বা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কেবল আনুষ্ঠানিক কৃত্যসমূহ শিক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদরূপা যে ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি, তাহা হ্লাদিনী শক্তির দূতের কৃপা ব্যতীত কেহই লাভ করিতে পারেন না। এই যে ভগবৎসুখের চিন্তা বা স্মৃতি, এইটীই ভক্তিলতা-বীজ। এই জন্যই বলিলেন,—"গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ"

শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপী মহতের নিকট হইতে এই ভগবৎ-সুখানু-সন্ধানময়ী স্মৃতিরূপ ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়া সাধকমালী নিজ

হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা আরোপণ (সম্যগ্‌ভাবে রোপণ) করেন। এই বীজের বপনক্ষেত্র হৃদয়, মস্তিষ্ক নহে। মস্তিষ্কে ভক্তিলতাবীজের আরোপণ হয় না। বীজ আরোপিত হইলে তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিজলের দ্বারা সেচন করিতে হয়। ক্ষেত্র বীজ-হীন থাকিলে কেবল সেচনের দ্বারা ফল লাভ করা যায় না। এই জন্যই বলিলেন—"ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগবতি তদ্বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা, ন তু কর্ম্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং, তত্রাপি শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা ন তু ধর্ম্মার্থাদিষ্বর্পিতা ; এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়তে, তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং, তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ।" (ভ স, ১৬৯ অনু)

নবলক্ষণা ভক্তি যদি ভগবানে সাক্ষাদ্ভাবে (অর্থাৎ কর্ম্মার্পণাদি-রূপে ; পরম্পরাক্রমে গৌণ-উপাসনারূপে নহে) অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যেও ইহা শ্রীবিষ্ণুরই জন্য, এইরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তার সহিত অনুষ্ঠিত হয় ; ধর্ম্ম, অর্থ কাম বা মোক্ষাদির জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ভক্তির অনুষ্ঠাতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাই উত্তম। এই স্থানে 'অধ্যয়ন'-শব্দের দ্বারা শাস্ত্রবিধিচালিতা বৈধী ভক্তি নির্দ্দিষ্টা হইতেছেন।

স্মৃতিহীন অর্থাৎ ভক্তিলতার বীজহীন ক্ষেত্রে জল সেচন করিলে যে তাহা নিরর্থক হয় এবং পাপমলিন ও অপরাধযুক্ত চিত্তই স্মৃতিহীন বা চিন্তাহীন থাকে, তাহা শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"বহু জন্ম করে' যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"
(চৈঃ চঃ আ। ৮।১৬)

স্মৃতি বা সুখচিন্তারূপ ভক্তিলতা-বীজ শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সিঞ্চিত হইয়া ক্রমে ক্রমে লতাকারে বর্দ্ধিত হয়। ব্রহ্মাণ্ড বা জড়-বিষয়ের প্রতি যে স্মৃতি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-চিন্তালতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা, ব্রহ্মলোক অতিক্রম-পূর্ব্বক পরব্যোম বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়। যদি সেই সুখানুসন্ধান-স্মৃতি কোন অনুরাগী ভক্তের কৃপাবিশেষের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে গোলোকস্থ শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতরুতে আরোহণ করে। সেইস্থানে লতা পল্লবিত হইয়া প্রেমফলে সুশোভিত হয়। কিন্তু যদি বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্ত-হস্তী সেই সুখানুসন্ধানস্মৃতিরূপ মূল-বস্তুটিকে উৎপাটিত বা কোনরূপে ছিন্ন করিয়া দেয়, তবে লতার পল্লবাদি সকলই শুষ্ক হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-অপরাধ উপস্থিত হইলে আর স্মৃতি থাকে না। বৈষ্ণব-অপরাধই মস্তিষ্কের দ্বারা ওজন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি। যে-স্থানে হ্লাদিনীর দূতের প্রতি অপরাধ, তথায় হ্লাদিনীর বৃত্তি যে স্মৃতি, যাহার সহিত প্রীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা কিছুতেই থাকিতে পারে না। এইজন্য সাধক-মালী সর্ব্বদা যত্নের সহিত হৃদয়ক্ষেত্রকে আবরণ করিয়া রাখেন, যাহাতে কোনরূপে বৈষ্ণব-অপরাধরূপ হস্তী প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু যদি লতার সহিত ভোগকামনা, মোক্ষকামনা,

নিষিদ্ধাচার, কৌটিল্য, ভগবানের নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুতিকারক জড়াভিনিবেশ, ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুর প্রতি অনাদর, ভক্তিশিথিলতা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি উপশাখার উদ্গম হয়, তাহা হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল-সেচনের ফলে উপশাখাগুলিই বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; মূল শাখা অর্থাৎ কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্মৃতিটী স্তব্ধ হইয়া পড়ে ; আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অতএব প্রথমেই উপশাখাগুলিকে ছেদন করা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে মূল শাখা অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধানস্মৃতি বর্দ্ধিত হইতে হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদন-মোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণ-কল্পবৃক্ষে উপনীত হইতে পারে। মালীও তখন সেই ভগবৎসুখানুসন্ধান-স্মৃতিরূপা লতা আশ্রয় করিয়া কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হন ; তখন সেই কল্পবৃক্ষের সেবা করিয়া সুখে প্রেমফলরস আস্বাদন করেন। এই শ্রীকৃষ্ণসুখানু-সন্ধান-স্মৃতিরূপা ভক্তিলতায় যে প্রপক্ক প্রীতিফলের আবির্ভাব হয়, তাহাই পরম-পুরুষার্থ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি পুরুষ চতুষ্টয় সেই প্রেমফলের নিকট তৃণতুল্য—অতি তুচ্ছ।

অপরাধীর প্রথম লক্ষণ এই যে,—তাহার হৃদয়ে কখনও অভীষ্টদেবের সুখের চিন্তা বা স্মৃতি নাই ; সর্ব্বদাই সে নিশ্চিন্ত ও জড়স্মৃতিতে অন্যমনস্ক। তাহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই,—তাহার চক্ষুতে আত্মগ্লানি বা আত্মধিক্কারের দ্যোতক অশ্রু নাই, তাহার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি-তুল্য। তৃতীয় লক্ষণ এই যে,—তাহার শ্রীভগবন্নামে রুচি নাই ; ভগবদ্ভক্ত ও ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুতে আপন-বুদ্ধি নাই।

শ্রীভগবান্ স্মৃতিযুক্ত ব্যক্তির নিকটই আত্মবিক্রয় করেন।

"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি"

(ভা ১০।৮০।১১)

জগদ্‌গুরু শ্রীহরি নিজের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্মরণ-কারীর হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাকে স্মরণের বশীভূত করেন।

"ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।

কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥"

(ভঃ স ১৭৪ অনুচ্ছেদধৃত গৌতমীয় বাক্য)

যাঁহারা অনুক্ষণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মের অনুসন্ধান অর্থাৎ ভাবনায় অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের জপ, পূজা, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ধ্যান বা যৌগিক-চেষ্টা অথবা কোন বিধির ক্রম অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

"এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।

জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ॥"

(ভা ২।১৬)

আসন-প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিষ্ঠা, যে কিছু সাধনই মানব করুন না; যদি তত্তৎসাধনের দ্বারা মানবের অন্তিমকালে শ্রীনারায়ণের স্মৃতির উদয় হয়, তবে সেইটুকুই মানবজন্মের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল।

শ্রীশুকদেবের এই বাক্য হইতেও প্রমাণিত হয়,—শ্রীভগবৎ-স্মৃতিই যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধনের একমাত্র প্রাপ্য ফল।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সাধনভক্তির প্রকরণে যে-কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন সন্নিবেশ করিবার বিধি অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্মৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীপদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া সমস্ত বিধি ও নিষেধের মূল তাৎপর্য্যটী জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

(ভ র সি পূর্ব্ব, ২য় ল, ৫ম সং-ধৃত পাদ্মবচন)

শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মৃতিতে রাখিতে হইবে; কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইবে না। শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই দুইটি মূল বিধি ও নিষেধেরই কিঙ্কর।

কি বৈধী ভক্তি, কি রাগানুগা ভক্তি, উভয়েরই মূল প্রয়োজন —স্মৃতি। একটিতে শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা শ্রীভগবানের সুখচিন্তা হয়; আর একটীতে স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত অষ্টকাল বা সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুসন্ধান হয়। শাস্ত্রশাসনের দ্বারা অনুসন্ধান আর রুচি ও লালসার দ্বারা অনুসন্ধান, এই মাত্র বিশেষ। শাস্ত্রশাসন বা বৈধী ভক্তির দ্বারা যে ইষ্টদেবের সুখানু-সন্ধানে তন্ময়তা, তাহাই ধ্রুবানুস্মৃতি, আর লোভ বা রাগানুগ-ভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাই আবেশ। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবগীতায় বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"

(ভা ১১।১৪।২৭)

বিষয়ের চিন্তাকারী ব্যক্তির চিত্ত বিষয়েতেই আসক্ত হয়, আর যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

"যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ॥
অবিস্মৃতি কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥"

(ভা ১২।১২।৫৪-৫৫)

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শাস্ত্র-শ্রবণাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, তাহা কেবল প্রতিষ্ঠা ও অর্থাদিলাভেই পর্য্যবসিত হয়; পরন্তু শ্রীভগবানের গুণানুবাদ-শ্রবণে আদরাদির দ্বারা শ্রীধরের শ্রীপাদ-পদ্মযুগলে স্মৃতির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলের স্মৃতিই মানবের অশুভ নাশ, চিত্তশুদ্ধি, পরম-প্রীতির আস্পদ শ্রীভগবানে ভক্তি, বিজ্ঞান, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও পরম মঙ্গল বিস্তার করে।

শ্রীভগবৎ-বিস্মৃতি বা শ্রীভগবানের অনুসন্ধান-চিন্তা বা স্মৃতি-রাহিতাই জীবের মূল-ব্যাধি। পরমেশ্বর হইতে বিযুক্ত ব্যক্তির অস্মৃতি অর্থাৎ অদ্বিতীয় প্রিয়তম বস্তুতে (১) স্মৃতিভ্রংশ ও (২) বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। তাহা হইতেই অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতি অভিনিবেশ উপস্থিত হয়। অতএব সেই মূল ব্যাধির নিদান চিকিৎসাই অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতি স্মৃতি বা অভিনিবেশ। শ্রীগুরু-পাদপদ্মরূপী সদ্বৈদ্যের কৃপায় এই স্মৃতিটী হৃদয়ক্ষেত্রে লাভ হয়—মস্তিষ্কে নহে। শ্রীগুরুদেব যে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহাতে পরতত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান বা স্মৃতিরূপ ভক্তিলতা-বীজটি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদান করেন।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এই ভগবৎস্মৃতিরূপ ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। এই স্মৃতির তারতম্যানু-সারেই বৈষ্ণবতার তারতম্য। যে ব্যক্তি স্মৃতিহীন, তাঁহাকেই অবৈষ্ণব ও অপরাধী বলা যায়। বাহ্য কোন চিহ্নের দ্বারা বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্ণীত হয় না; শ্রীভগবৎ-প্রীতি হইতে উদিত স্মৃতির তারতম্য হইতেই বৈষ্ণবতার তারতম্য নির্ণীত হয়। যখন সেই সকল স্মৃতিযুক্ত ভাগবত বা বৈষ্ণব পরস্পর মিলিত হন বা অন্যত্র বিচরণ করেন, তখন তাঁহারা এই ভগবৎ-স্মৃতিরই যাহাতে উদ্দীপন হয়, সেইরূপ কার্য্যে রত থাকেন।

"স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম॥"

(ভা ১১।৩।৩১)

এইরূপ ভাগবত-পুরুষগণ সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির দ্বারা অঘদমন শ্রীযশোদানন্দন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয় স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া ভগবদ্‌গুণশ্রবণের দ্বারা পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন।

এই যে স্মরণ ও স্মারণ অর্থাৎ নিজে ভগবৎস্মৃতি বা সুখচিন্তায় আবিষ্ট থাকিয়া অপরকেও ভগবৎস্মৃতিতে আবিষ্ট করান, তাহাই ভাগবতগণের নিত্য ধর্ম্ম।

শ্রীভাগবতগণ তাঁহাদের প্রীতির আস্পদের স্মৃতি শয়ন, আসন, স্নান, ভোজন, গমন, উপবেশন—কোন কালেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ভূতগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায় প্রিয়তমের স্মৃতিতে তাঁহারা সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকেন।

"তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ! নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ॥
শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি?"

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ! তোমার বিক্রীড়া অর্থাৎ বিশিষ্ট লীলাসকল মানবগণের পরম মঙ্গলজনক এবং কর্ণের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ। তাহা আস্বাদন করিয়া লোক অন্যাভিলাষ ত্যাগ করে। তুমি আমাদের প্রিয়, আত্মা (প্রাণের প্রাণ); আমরা তোমার ভক্ত; শয়ন, আসন, গমন, উপবেশন, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনকালে তোমাকে আমরা কিরূপে ত্যাগ করিব অর্থাৎ বিস্মৃত হইব?" (ভা ১১।৬।৪৪-৪৫)

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব পূজা

নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথির আগমনী-গীতি-সঙ্কীর্ত্তনের মূল গায়করূপে যিনি ভক্তিশংসনাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শক্তিস্বরূপিণী সীতা-দেবীর আবির্ভাবের গৌর-পঞ্চমী তিথি অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভবের প্রকাশ-বিগ্রহ আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথির আরতি করিবার ক্ষীণ আশা পোষণ করিতেছি। গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈকুণ্ঠের নিঃশ্রেয়স বন হইতে এই ভূলোকে যে কল্যাণকল্পতরুরাজ আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ঠাকুর কমলনয়ন শ্রীচৈতন্যাশ্রয়-বিগ্রহ সরস্বতীর কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীই শ্রীভক্তিবিনোদ-বিভুর বৈভব—

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।'

—কল্যাণকল্পতরু, উপদেশ ১০

এক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর আবির্ভাব, আর এক গৌর-পঞ্চমীতে শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব-প্রকাশের জগতে আত্মপ্রকাশ। এইজন্যই বোধ হয় পঞ্চমী তিথি বাণীপূজার, গুরুপূজার বা ব্যাসপূজার পক্ষে প্রশস্ত তিথি।

শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী শ্রীভক্তিবিনোদ বাণীর পূজা করিবার প্রণালী বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্যের নিজকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' আমাদিগকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছি।

"শ্রীরাম-গোপাল আস্যে, বাসুদেবানন্ত-দাস্যে,
থাকিয়াত' সদা লহ নাম।"

ব্রহ্মসূত্রের অনুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'আম্নায়-সূত্র' রচনা করিয়াছেন। এই আম্নায়সূত্র অভিন্ন-বেদান্ত-সূত্র। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদে 'বাসুদেবানন্তদাস্যে' অবস্থান করিয়া 'সদা' 'নামব্রহ্মনাদের সেবা' রূপ নিজ মনোঽভীষ্টের সেবা করিবার আশীর্ব্বাদ জগতে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদের আম্নায়সূত্রকে, ব্রহ্মসূত্রের ধারাকে বা শ্রীব্রহ্মবাসুদেবগৌড়ীয়ের ধারাকে জাগতিক কোন শক্তি ছিন্ন করিতে পারে না।

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শ্রীব্রহ্ম-বাসুদেব-সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ, **শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপর নাম 'শ্রীবাসুদেব'।** সেই বাসুদেব আশ্রয়বিগ্রহ-প্রাণনাথ; তাঁহাকে বিষয়বিগ্রহ-প্রাণনাথ বা সাধারণ **জীববিশেষ বলা যাইবে না।** গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষায় তিনি **'সংসারার্ণব-তরণী'** ও 'ভগবৎপাদ'।

আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের আচার্য্যলীলায় শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ

প্রচারিত হইয়াছে। আবার সেই শুদ্ধ-দ্বৈত সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে (ভাঃ ১১।৭।৪৯) ব্রহ্ম-তর্কের বাক্যের দ্বারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তও প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীতে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, জীবকে 'বিষ্ণু' জ্ঞান করা যেরূপ apotheosis বলিয়া কথিত, তদ্রূপ বিষ্ণুকে বা গুরুতত্ত্বকে জীবজ্ঞানও anthropomorphism। উভয়ই মায়াবাদরূপ অপরাধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী কেবল জীবকে বিষ্ণু জ্ঞান করাকে 'মায়াবাদ' বলেন নাই, আচার্য্য বা গুরুতত্ত্বকে 'জীব' জ্ঞান করাকেও মায়াবাদ বলিয়া জানাইয়াছেন। আচার্য্যতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্ব মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হয়, বিষ্ণুপাদত্ব, বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকতা-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অণুত্বধর্ম্ম-নিবন্ধন মায়াভিভূত হয়, ইহাই মায়াবাদ-অপরাধ।

বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবকে 'জীব' বলা যেরূপ অপরাধ, প্রাণনাথ বাসুদেব আনন্দতীর্থপাদকেও 'জীব' বলা তদ্রূপ অপরাধ। আনন্দতীর্থ বাসুদেব ভগবৎপাদ—বিষ্ণুপাদ। যিনি বায়ুর অবতার, তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব বা বিষ্ণুপাদত্ব নিত্যসিদ্ধ। আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের সহিত বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাগ্রন্থে—রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুরের বাণীতে অসংখ্য ব্যাসের কথা শুনা যায়। পরবর্ত্তী ব্যাস পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাসের আসনে বসিয়া পূর্ব্ব-ব্যাসের বা আচার্য্যের পূজাই করিয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবতেরই

কীর্ত্তন করেন ; পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাসের অবমাননা করেন না বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদসম্বন্ধকে লোপ করিয়া মায়াবাদীর সর্ব্বব্রহ্মৈক্যবাদে পতিত হন না।

ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবাসুদেবমধ্বাচার্য্যের ধারায় বর্ত্তমানে আমাদের নিকট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদের আম্নায়সূত্র ও তত্ত্বসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন।

বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবের আবির্ভাবের আগমনী কথা জগতে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবকীর অষ্টম গর্ভ বিনাশ ও বাসুদেবাবির্ভাবের পরে বিংশতি-সংখ্যক অসুরকর্ত্তৃক কংসের আনুগত্যে বালকরূপী বাসুদেবকে ধরাধাম হইতে অপসারিত করিবার আসুরিক চেষ্টা হইয়াছিল। ভক্তিবিনোদ-ধারায় এই সকল লীলার বহু শিক্ষারহস্য আছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্বন্ধতত্ত্বচন্দ্রিকা বা গর্ভস্তোত্রব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে এই সকল লীলার রহস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"যাহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক জীব শুদ্ধভাবগত হইয়া স্বীয় চেষ্টাক্রমে দূর করিবেন, কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণকৃপা-সহকারে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যে সকল প্রতিবন্ধক জীব স্বয়ং দূর

করিতে সমর্থ হয়েন, ঐ সকল শ্রীভাগবতে বলদেব-কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া থাকার বর্ণন আছে। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয়ে যে-সকল প্রতিবন্ধক দূর হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূর করিয়াছেন,—এইরূপ বর্ণিত আছে। সূক্ষ্মবুদ্ধি সারগ্রাহিগণ ইহার আলোচনা করিয়া দেখিবেন। যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা মাথুরদোষ সকল বর্জ্জন করিবেন; যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষসকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধকসকল বর্জ্জন করতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।"

—(শ্রীকৃষ্ণসংহিতা অষ্টম অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,— "শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩শ শ্লোক হইতে অধ্যায়-শেষ পর্য্যন্ত যে ১৮টি অনর্থ ব্রজভজনের প্রতিবন্ধক বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহাতে যমলার্জ্জুনভঙ্গ ও যাজ্ঞিক বিপ্রগণের বৃথাভিমান-দৌরাত্ম্য এই দুইটী লীলা যোগ করিলেই বিংশতি প্রতিবন্ধক হয়। এই সমুদয়ই ব্রজভজনের প্রতিকূল তত্ত্ব। নামভজনকারী সাধক প্রথমেই হরিসম্বোধনে এই প্রতিকূল বর্জ্জনশক্তি হরির নিকট অহরহঃ প্রার্থনা করিবেন। তাহা করিতে পারিলেই ভক্তচিত্ত শোধিত হইবে।"

—(চৈঃ শিঃ ৬।৬)

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বাসুদেবাশ্রয়-বিগ্রহের আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে ও আচার্য্যলীলার অরুণোদয়ে ঠিক ঐ জাতীয় প্রতিবন্ধক উদিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বাসুদেব তাঁহার

নিত্যসিদ্ধ বিক্রমে ঐ বিংশতি প্রকার ব্রজভজন-বিরোধী বা শ্রীরূপানুগ-ভজন-বিরোধী প্রতিকূল তত্ত্বকে নিরাস করিতেছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভবের প্রভাবে সেই সকল রূপানুগ ভজনবিরোধী প্রতিবন্ধক সমূহ প্রতিকূল আচরণ করিয়া ব্যতিরেক ভাবে ভজনের আনুকূল্য ও প্রগতিসাধনই করিতেছেন। আমরা আত্মশোধনের জন্য সেই সকল প্রতিকূল তত্ত্বের আলোচনামুখে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব-প্রকাশ বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব ঃ—

কংসের স্বরূপ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন - "মহাপূণ্যভূমি ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ মথুরায় বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। সাত্বতদিগের বংশসম্ভূত বসুদেব **নাস্তিক্য** রূপ **কংসের মনোময়ী** ভগিনী **দেবকীকে** বিবাহ করেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতী হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া **স্মৃতিরূপ কারাগারে** তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করেন। যদুবংশের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন, এবং ভোজ-বংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্‌বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন। * নাস্তিক্যরূপ কংসধ্বংস ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য্য ভগবান প্রাদুর্ভূত হইলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন।

[১] পূতনা-বধ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে বলিয়াছেন,—

"ভুক্তিমুক্তিপ্রিয় **কপট সাধুগণ** পূতনাতত্ত্ব। শুদ্ধ ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নব-উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।"

বাসুদেবাশ্রয়-বিগ্রহতত্ত্বের আবির্ভাবেও ভুক্তিমুক্তি প্রিয় কপট সাধুতা-সমূহ বা পূতনাতত্ত্ব বিপদ্ গনিলেন। সেই কপট সাধুতাসমূহ নাস্তিকতারূপ কংসের আনুগত্যে শ্রীবাসুদেবাশ্রয়-বিগ্রহকে গর্ভস্থ থাকাকালেই অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বেই বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া কপটতার আশ্রয়ে তাঁহার বালপ্রকাশ স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভুক্তিমুক্তি-পিপাসা ও কাপট্যের বিনাশক হইবে, পুনরায় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মাতৃত্ব বা পালকত্বের বেশে বিষ্ণুপাদত্বকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেন। আশ্রয়-বিগ্রহ, শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া, তাঁহাদের নবোদিত চিরপুরাতন ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা-তত্ত্বকে বিনাশ করিলেন অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তি প্রিয়তা কপটতার অবগুণ্ঠনে যে পূর্ব্বাচার্য্যের বঞ্চনাময়ী প্রশংসাদির ময়ূরপুচ্ছে লোকলোচনে শোভিত থাকিয়া বায়সের চিত্তবৃত্তিকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, বৈষ্ণবসমাজে ভণ্ডামি চালাইতেছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই পূতনা তত্ত্বরূপ ভুক্তিমুক্তি কামনার নিরাসের দ্বারা রূপানুগ ভজনের সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইল।

[২] শকট-ভঞ্জন

শ্রীরূপানুগভজনরাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক শকটারিষ্ট নামক দৈত্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিচারে শকটারিষ্ট অসুর, বালকরূপী

শ্রীকৃষ্ণকে শকটের দ্বারা চাপিয়া মারিবার (?) জন্য ঐ শকটে
আবিষ্ট হইয়াছিল। দৈত্যের অঙ্গভারে শকটের চক্র ক্রমে ক্রমে
ভূমিতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যখন ঐ শকট শ্রীকৃষ্ণকে চাপি-
বার জন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদযুগ-
লের দ্বারা শকটকে উল্টাইয়া স্থানান্তরে পাতিত করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে এই শকটভঞ্জন-
লীলাকে "প্রাক্তনী ও আধুনিকী অসৎ সংস্কার, জাড্য ও অভি-
মানজনিত ভারবাহিত্ব" বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণসংহি-
তায় বলিয়াছেন, যাহারা বৈধপর্ব্বের সার অবগত না হইয়া তাহার
ভারবহনে তৎপর, তাহারা রাগ অনুভব করিতে পারে না।
অতএব তাহাই ভারবাহিত্বরূপ বুদ্ধি মর্দ্দক শকট।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আচার্য্য লীলায় শ্রীরূপানুগ-
ভজনরাজ্যের এই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকটীর ভঞ্জন দেখিতে পাওয়া
যায়। শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধ একটী ভারবাহী সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়া-
ছিল যে, বৈধপর্ব্বের সার অবগত না হইয়াই রাগানুভব হয়।
সাত্বত-স্মৃতির বিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভক্ত্যানুকূল অনুষ্ঠান
পরিত্যাগ করিয়াও, ভক্তি প্রতিকূল কর্ম্মজড়বিধানে অভিনিবিষ্ট
হইয়াও রাগানুগ সিদ্ধদেহ বা মঞ্জরীর অভিমান প্রচারপূর্ব্বক লাভ-
পূজাপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। শ্রীস্বরূপরূপানুগবর গুরু-
পাদপদ্মের প্রচারিত শিক্ষাদীক্ষার অনুসরণ ও অনুশীলন না
করিয়াও কেবল সুপারিশপত্রের দ্বারা গুরু-শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষয় ও অভয়
থাকিতে পারে, এইরূপ ভারবাহিত্যরূপ বুদ্ধিমর্দ্দক বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত

যখন শকটারিষ্টের ন্যায় আচার্য্যের প্রাথমিক আবির্ভাবকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন সেই আচার্য্যলীলা শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের পদযুগলের দ্বারা ঐ ভারবাহিত্বরূপ শকটাসুরকে উল্টাইয়া স্থানান্তরে পাতিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের এই পদযুগল আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের প্রাথমিক আচার্য্যলীলায় ঐ নিরর্থক গুরুশ্রেষ্ঠত্বাভিমানরূপ ভারবাহিত্বকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে—

"শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধনসাধ্যগতং স্বীয়-সর্ব্বস্বভূতং যৎকিমপি রহস্যং, তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্; যথা—(ভাঃ ৮।১৭।২০)—

"নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্॥"

শ্রীগুরু বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধনসাধ্যগত স্বীয়সর্ব্বস্বভূত যে রহস্য অবগত হওয়া যায়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে। যথা—"হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও এই তত্ত্ব অন্যকে বলিবে না। দেবগণের রহস্য সমস্ত সুগুপ্ত হইলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।" "সম্পন্ন" অর্থাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

[৩] তৃণাবর্ত্তবধ

ভারবাহিত্ব আপনাকে 'মঞ্জরী' বা 'সখী'-রূপে অভিমান করিয়া এবং স্তাবক-সম্প্রদায়ের দ্বারা তাহা প্রচার করিয়া যখন উহাকে কুতর্ক-বলে স্থাপন করিবার চেষ্টা করে, তখন শ্রীরূপানুগ-

ভজনের তৃতীয় প্রতিবন্ধক কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত্ত-দৈত্যের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কুতর্কাভিমান তৃণাবর্ত্তরূপে নিত্যসিদ্ধ-গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'নজির' অবৈধভাবে দেখাইয়া প্রমাণ করিতে উদ্যত হইল যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও যখন তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে নিজের নিত্যসিদ্ধস্বরূপের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন স্তাবক-সম্প্রদায়ের কৃপাসিদ্ধ গুরুপ্রেষ্ঠত্ব কেনই বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুকরণিক সংস্করণ হইতে পারিবে না? এই তৃণাবর্ত্তরূপ কুতর্ক ও হৈতুক পাষণ্ডমত শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত বা ভক্তিসিদ্ধান্তকে Intellectualism বা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম বলিয়া স্থাপন করিতে উদ্যত হইল!

ঐ হৈতুক পাষণ্ডমত ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞাতৃত্বকে আচার্য্যের লক্ষণ না বলিয়া 'বড় আমি'র ভারবাহিত্ব, মায়ারাণীর ভোক্তৃত্ব, অসার বাক্যবাগীশতা, মৎসরতাগর্ভ কালনেমিত্ব, প্রাকৃত বয়স, বেষ প্রভৃতিকে 'আচার্য্য-লক্ষণ' বলিয়া কল্পনা করিল!

হৈতুক পাষণ্ডমতবাদরূপ তৃণাবর্ত্ত কর্ম্মিজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের 'গদ্দিনশীন মহান্তগিরি'কে শ্রীমদ্ভাগবতমার্গের ও শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আম্নায়সূত্র-সংরক্ষণকারী আচার্য্যত্বকে একাকার করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল মধ্যে গৌড়ীয় গগন ধূলিরাশির দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক সকলের দৃষ্টি অবরোধ করিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভক্তগণের গোষ্ঠ ঐ ধূলির দ্বারা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। কুতর্ক তৃণাবর্ত্ত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আচার্য্যত্বের নবোদিত ভাবকে হরণ করিয়া লইবার

চেষ্টা করিল। তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের বিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি ও করকার দ্বারা আহত হইয়া অনেকেই শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে এবং নিজ শুদ্ধ-স্বরূপকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। কৃষ্ণের নিত্যত্ব নাই, আচার্য্যের নিত্যত্ব ও বিষ্ণুপাদত্ব নাই, কংসের আসুরিক চেষ্টা ও কৌশলগুলিই সত্য—এইরূপ নাস্তিকতায় ন্যূনাধিক সকলের হৃদয় আচ্ছন্ন হইল! কোমলশ্রদ্ধ নবীন সাধকগণের ত' কথাই নাই প্রৌঢ়শ্রদ্ধগণের হৃদয়েও সংশয় ও সমস্যার উদয় হইল! সাধারণ গণমত শুদ্ধভক্তি বা আস্তিকতার প্রতি একেবারেই আস্থা হারাইয়া ফেলিলেন! তখন তৃণাবর্ত্তের আশ্রিত পাষণ্ডমতসমূহ প্রখর বাত্যাচক্র হইতে অধিকতর ধূলিরাশি বর্ষণ করিতে থাকিল। যাঁহারা একান্তভাবে শুদ্ধভক্তির শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহারা এই নবোদিত ভাবকে ধূলিরাশির মধ্যে লুপ্ত ও গৌড়ীয়গগনের ঐরূপ ধূলিসমাচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া কেবলমাত্র যাঁহার কৃপায় হেলায় সমস্ত খেদ উদ্ধূলিত হয়, সেই অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যের শ্রীভক্তি-বিনোদদয়ার বাণী-বৈভবের শরণাপন্ন হইলেন ও সত্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এই ধূলি-বর্ষণবেগ শান্ত হইল।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তের গুরুত্ব-হেতু তৃণাবর্ত্তরূপ পাষণ্ড মতবাদ সেই সিদ্ধান্তকে গিরিতুল্য বোধ করিতে লাগিল। তখন ঐ পাষণ্ডমত শুদ্ধসিদ্ধান্তের ভার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী হইতে জানাইয়া দিলেন যে,—"**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার**

করত যাহারা গুরুপরম্পরাসিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করে না, তাহারা কলির গুপ্তচর।” আরও জানাইলেন যে, “শ্রীরূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না, অচিরেই পঞ্চাশ লক্ষ লোক আগমন করিতেছেন।” —শ্রীল প্রভুপাদের শত শত বার কীর্ত্তিত এই বাণী কখনই মিথ্যা হইবার নহে। তৃণাবর্ত্ত গৌড়ীয়গগনে ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া ঐ সময়কে ‘অন্ধকার যুগ’রূপে প্রচার করিতে চাহিলেও তাহা ‘অন্ধকার যুগ’ বা কংসরূপ নাস্তিকতার রাজত্ব নহে। কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম জনকে সর্ব্বদাই ভুবনমঙ্গলের জন্য জগতে সংরক্ষণ করেন।

সময় সময় যে ‘অন্ধকারযুগে’র কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সময়ও আম্নায়-ধারায় অক্ষুন্নত্ব থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে ভীষণ অন্ধকার যুগ ছিল, সেই সময়ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষগণ—মহান্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদির পর যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীরসিকানন্দ মুরারির শিষ্য শ্রীরাধানন্দ দেব, তচ্ছিষ্য শ্রীনয়নানন্দ দেব, শ্রীরাধা-দামোদর প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ আম্নায়ে মহান্ত সদ্‌গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের পর আবার যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও ভাষ্যকারের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস মহান্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কোনও

দিনই শ্রীরূপানুগাম্নায়-ধারায় মহান্ত আচার্য্যের নিত্যপ্রকটরূপ মহাবদান্যলীলা রুদ্ধ হয় নাই ও হইবে না।

তৃণাবর্ত্ত এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সহ্য করিতে পারিল না। ইহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের একহস্ত। দ্বিতীয় হস্তটী তৃণাবর্ত্তের আর একটী পাষণ্ডমতকে নিরাস করিলেন। তৃণাবর্ত্তরূপ পাষণ্ডমতের বিচারানুসারে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর যেরূপ গ্রন্থ-ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, তদ্রূপ পূর্ব্বাচার্য্যের অপ্রকটের পর তাঁহার আলেখ্য-অর্চ্চা ও গ্রন্থাবলীই আচার্য্যরূপে উদিত থাকিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, অন্য কোন মহান্ত আচার্য্যের আবশ্যকতা নাই,—এই হৈতুক পাষণ্ডমতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় হস্তরূপ সিদ্ধান্তটী তৃণাবর্ত্তের গলদেশ দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন এবং দেখাইলেন যে, ভক্ত-ভাগবত বা মহান্তগুরু ব্যতীত গ্রন্থভাগবতের ব্যাখ্যা করিবেন কে? লণ্ডনে শ্রীল প্রভুপাদ যে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তিবিরোধী দেখে শ্রীমূর্ত্তির পূজা প্রকাশ না করিয়া গ্রন্থভাগবতমাত্র স্থাপনের কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ সেই নাস্তিকতাগর্ভ অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরূপানুগগণ "গ্রন্থসাহেব-পূজার প্রচলনকারী নহেন, তাঁহারা Personality of Godhead বা পুরুষোত্তমের উপাসক। নরোত্তম শ্রীমহান্ত গুরুদেবের আনুগত্যে পুরুষোত্তমের সেবা-প্রচারই শ্রীরূপরঘুনাথের ধর্ম্ম। শ্রীব্যাসদেব, শুকদেব প্রভৃতি ভুবনপাবন মহান্ত আচার্য্যবর্গের অস্তিত্ব না থাকিলে কেবল গ্রন্থভাগবতের আবির্ভাবে জীবের নিত্যমঙ্গল

সাধিত হইত না। দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় ভাগবত-বক্তা বা মায়াবাদী কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত ভাগবত-বক্তা কিংবা যাহারা প্রেতশ্রাদ্ধ-বাসরে রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া উদরের সংস্থাপন করেন, সেইরূপ ব্যক্তিগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ মহান্ত আচার্য্যের অভাবের সুযোগ পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থাবলী পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবে, শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবে,—এইজন্য মহান্ত আচার্য্যের আবির্ভাব ঐ সকল অভক্তিমতবাদ-নিরসনের জন্য ভগবদিচ্ছায় নিত্য কালই প্রকাশিত থাকিবেন।

যখন ভক্তিসিদ্ধান্তের এই দুই হস্তের গুরুত্ব তৃণাবর্ত্তের গল-দেশকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন "ছেড়ে দে' মা কেঁদে বাঁচি"—এইরূপ এক অবস্থায় তৃণাবর্ত্ত পতিত হইল। তৃণাবর্ত্তের হস্তপদাদি অঙ্গ নিশ্চেষ্ট ও বলহীন হইল, তাহার নেত্রদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাতর হইয়া সেই পাষণ্ডমতবাদ অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। ভীষণ দৈত্য আকাশমার্গ হইতে রুদ্রবান বিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের ন্যায় শিলাতলে পতিত হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীভক্ত্যেক রক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদের অনুগত শ্রীভক্তিরক্ষক-সিদ্ধান্তের দ্বারা তৃণাবর্ত্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

[৪] যমলার্জ্জুনভঙ্গ

রূপানুগভজনের চতুর্থ প্রতিবন্ধক—যমলার্জ্জুনরূপী ধনমদজাত যোষিৎসঙ্গ, জিহ্বা লাম্পট্য ও ভূতহিংসা, নির্ল্লজ্জতাদি। বিষয়িসঙ্গ

হইতে জাত ধনমদ ও যোষিৎসঙ্গাদিকে ভক্তির অনুকূল বলিয়া প্রথমে গোপনে গোপনে চালাইবার চেষ্টা যখন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তৎপরে জগদ্‌গুরুদেব শ্রীনারদের (নারদ—সমগ্র জীবজাতি বা জীবসমষ্টিকে যিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করেন) মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াও যখন যোষিৎসঙ্গ, জিহ্বালাম্পট্য, নির্ল্লজ্জতাদি দোষ চলিতে লাগিল, তখন সেই জগদ্‌গুরুর বঞ্চনারূপ অভিসম্পাতে চেতনের বৃত্তি স্থাবরত্ব লাভ করিল অর্থাৎ অপরাধকঠিন হইয়া উঠিল। সেই দোষ আচার্য্যের প্রাথমিক লীলাই উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। সেই দোষ উৎপাটিত করিবার কালে চোর যেরূপ নিজের দোষ এড়াইবার জন্য প্রকৃত সাধুকে 'চোর চোর' বলিয়া দেখাইয়া দেয়, এখানেও সেইরূপ অসৎচেষ্টার উদয় হইল। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবধূত হইলেই কখনই নিজ-চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল-চরিত্র প্রভুকে যাঁহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। **অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা-দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন! হা কলি, তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা করিলে!** অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নর-রসিক-মধ্যে গণন করেন। নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ

গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা-স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন !”

(‘নামবলে পাপ প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ’, সঃ তোঃ ৮।৯)

যেখানে গুরুর সেবক-বিচার, সেইখানে গুরুর সেবককে কখনই ভোগ্য বস্তুরূপে বা যোষিতে পরিণত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে পারে না। সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত থাকিয়া অর্থাৎ গুরু-সেবককে ভোগ করিয়া বা ঐ বৃত্তিকে কোনরূপে প্রশ্রয় দান করিয়া গুরুশ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। যেখানে এবিচারটী স্থাবরত্ব-ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে, সেইখানে আচার্য্যলীলা উহার মূল উৎপাটন করিয়া দিলেন এবং জানাইলেন,—“কোন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কখনও শ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচার বা উহার ত্রিসীমানায় যাইতে পারে না।”

[৫] বৎসাসুর বধ

শ্রীরূপানুগভজনের পঞ্চম প্রতিবন্ধক-- বৎসাসুর। অরিষ্টাসুর হইতে ইহার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে। বাল-বুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিবশবর্ত্তিতা হয়, তাহাই বৎসাসুর নামক অনর্থ। বৎসাসুর শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস অর্থাৎ পাল্য সেবকগণের বেষ ধারণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিচরণ করে। আচার্য্যলীলা শ্রীরূপানুগ ভজনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ এইরূপ দুষ্ক্রিয়াও পরবুদ্ধি-বশবর্ত্তিতাকে সম্পূর্ণ ভাবে সংহার করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ “নিরীহ ভাগবত জীবের রক্তমাংসগত

চাপল্যবশ হওয়াকে "বালদোষ" ও "বালবুদ্ধি" বলিয়াছেন। এই বালবুদ্ধি-জনিত দুষ্ক্রিয়াকে কংস প্রশ্রয় দেওয়ায় উহা নানা-প্রকার জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতেছিল! এমন কি, শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিষ্ণুপাদত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার ভজনমন্দিরের সংলগ্ন স্থানে নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া চালাইতেছিল এবং সেই ভগবৎপাদাচার্য্যের বৎসগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার কলঙ্ক আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নবোদিত আচার্য্য-লীলার সেই দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিবশবর্ত্তিতারূপ বৎসাসুর সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হইয়াছে।

(৬) বকাসুর বধ

শ্রীরূপানুগ ভজনের ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক—বকাসুর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন, "ধর্ম্মকাপট্যরূপ মহা-ধূর্ত্ত বকাসুর বৈষ্ণবদিগের প্রতিবন্ধক। ইহাকে "নামাপরাধ" বলে। যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা-লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী, কিন্তু **যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থ সঞ্চয়কে উদ্দেশ করে, তাহারাই কপট।** ইহা দূর না করিলে রাগের উদয় হয় না। **সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীনলিঙ্গ দ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে। ঐসকল দাম্ভিকদিগের বাহ্যলিঙ্গ দেখিয়া যে-সকল লোক আদর করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রীতির অনাপ্তি-হেতু হইয়া জগতের কণ্টক হন।**"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—
"কুটীনাটী, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যা ব্যবহারই 'বকাসুর'।
তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি হয় না।"

ব্রহ্ম-বাসুদেব-গৌড়ীয় পরম্পরায় সময় সময় বকাসুরসমূহ
প্রবেশ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।
শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণীর নামের ধ্বজা উড়াইয়া যে ধর্ম্মকাপট্য-
রূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুর স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চলক্ষণ
অবলম্বনপূর্ব্বক সম্মান ও অর্থ-সঞ্চয়কে মূলমন্ত্র করিয়াছিল এবং
শ্রীচৈতন্যবাণীর সম্প্রদায়-লিঙ্গ ও কেহ কেহ উদাসীনলিঙ্গদ্বারা
জগৎকে বঞ্চনা করিতেছিল, আর ঐ দাম্ভিকদিগের বাহ্যলিঙ্গ
দেখিয়া কোমলশ্রদ্ধ ও অতত্ত্বজ্ঞ জনসাধারণ উহাকে আদর করিতে-
ছিল, বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রীতির অনাপ্তি হেতু তাহারা জগতের কণ্টক
হইয়াছিল, সেই ভাবটীকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-বাসুদেবের
আচার্য্যলীলা অগ্রন্থি-তৃণবিশেষের পত্রের ন্যায় শুদ্ধভক্তসম্প্র-
দায়ের সমক্ষে অবলীলাক্রমে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

বকধার্ম্মিকতা, কুটীনাটী, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্যজনিত মিথ্যা ব্যব-
হারের প্রতি মহাভাগবতের বঞ্চনা কখনই ঐসকল ধর্ম্মকাপট্য বা
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী বা শুদ্ধভক্তির ধ্বংসকারী অপরাধ
সমূহের সমর্থক হইতে পারে না। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের
আচার্য্যলীলায় সেই ধর্ম্মকাপট্য-শাঠ্যরূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুরের চেষ্টা
সমূহ তৃণপত্রের ন্যায় বিদীর্ণ হইল। ইহাতে শুদ্ধভক্তির সেবক
দেবতাগণ ঢক্কা-ভেরী-মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহিত স্তব করিতে করিতে

আশ্রয়-বিগ্রহের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রূপানুগ-সেবক সম্প্রদায়ও দেবতাগণের এইরূপ আনন্দোল্লাস দর্শন করিয়া যৎপরনাস্তি চমৎকৃত হইলেন। সকলেই উহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য, এই বালককে বহুবার বিনাশ করিতে আসিলেও যাহারা হননেচ্ছু, তাহাদিগেরই অনিষ্ট হইল। ঐ অসুরাদি সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সদৃশ ও ঘোর দর্শন হইয়াও ত' ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না! বরং ইহার হিংসা করিতে আসিয়া অগ্নি সম্মুখস্থ পতঙ্গের ন্যায় তাহারাই দগ্ধ হইয়া গেল। এই আশ্রয়-বিগ্রহের প্রভাব এইরূপ যে, তাঁহার আগমন-সংবাদেই ধূর্ত্ততা, কপটতা, শাঠ্য, মৎসরতা, ধর্ম্মধ্বজিতা, সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীন-লিঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা লোক-বঞ্চনাবৃত্তি প্রভৃতি কংসানুচরগণ নিয়ে মূল-পুরুষের সহিত "পালায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিল।

[৭] অঘাসুর বধ

শ্রীরূপানুগভজনের সপ্তম প্রতিবন্ধক—অঘাসুর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে ইহা "দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপ-বুদ্ধি নৃশংসত্ব ও প্রচণ্ডত্ব।" আচার্য্যলীলা ধর্ম্মকাপট্য রূপ বকাসুরকে বিনাশ করিলে সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ কংস অন্যান্য অসুরগণের সহিত মন্ত্রনা করিয়া কি ভাবে বিনষ্ট রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করা যায়, তজ্জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কারণ, একটী বালকের ভয়ে তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, এইরূপ একটি কলঙ্ক সাধারণের চক্ষে বড়ই অপমান-জনক এবং তাহাদের মাৎসর্য্যের ধ্বজাস্বরূপ

তখন কংস এইরূপ কোন অসুরের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য বিচার করিল যে, কৃষ্ণের বয়স্যগণের সহিত নন্দাদি ব্রজ বাসিগণকে পূতনা ও বকাসুরের প্রেত তর্পণের নিমিত্ত 'তিলোদক' রূপে পরিণত করিতে পারে অর্থাৎ অঘাসুর পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; কাজেই সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ব্রজবাসী বা শ্রীবাসুদেবাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রেত-শ্রাদ্ধের উপকরণরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিল। এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন, "ইহা লীলাশক্তিরই চাতুর্য বিশেষ। লীলাশক্তি ভাবিলেন, ভগবানের এই বাল্যলীলায় ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ পরমানন্দের বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বিহার সমাপ্ত হওয়া অসম্ভব, আর খেলা শেষ না হইলেও শ্রীবাসুদেবের ভোজনাদি হইতেছে না, তজ্জন্য লীলাশক্তি সেই লীলা বিচ্ছেদ মানসে ও দুষ্টের সংহার আবশ্যক ভাবিয়া অন্তর্য্যামীর ইচ্ছানুসারে অঘাসুর নামক দৈত্যকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্ম্মতি অঘাসুর যোজন-পরিমিত বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় স্থূলবৃহৎ অজগর রূপ ধারণ করিল ও গুহার ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া শ্রীবাসুদেব ও শ্রীবাসুদেবের সেবোপকরণ-সমূহকে গ্রাস করিবার অভিলাষে পথে শয়ন করিয়া রহিল। কৃষ্ণ সেবার উপকরণগুলি দ্বারা কৃষ্ণের সেবা হইবে না, সে-ই উহাদিগকে গ্রাস করিবে; শ্রীবাসুদেবের সহিত তদাশ্রিত জনগণ সকলেই যেন তাহার প্রেততর্পণের 'তিলোদক'!

অঘাসুরের মুখমধ্য ঘোর অন্ধকারপূর্ণ, দন্তগুলি এক একটী পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, জিহ্বা যেন বিস্তৃত পথ, নিঃশ্বাস খরতর বায়ুসম ও চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি দাবাগ্নিসদৃশ অতিশয় উষ্ণ। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীবাসুদেবাশ্রিত বালকগণ উহাকে 'মহা-প্রাণী' জ্ঞান করিয়া উচ্চ-হাস্য করিতে লাগিল। বালকগণ অঘাসুরের কৌশলে গোবৎসসকলের সহিত উহার উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু রাক্ষস তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিল না। অঘাসুর বকারি বাসুদেবের প্রবেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। কি করিয়া বকারিকে তাহার মুখগহ্বরে আনয়ন করিবে, এই কৌশল ও বুদ্ধি উদ্ভাবনা করিতেছিল। কিরূপে ঐ খল অসুরও মরিবে, অথচ নিজজনগণ রক্ষা পাইবে, এই দুই-কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া বকারি শ্রীবাসুদেব অঘাসুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। ইহা-দেখিয়া অঘাসুরের বান্ধব ও মূল চক্রান্তকারী কংসাদির সহিত অন্যান্য দৈত্যগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা মনে করিল, 'এতদিনে বাসুদেবকে আমাদের কবলে পাইয়াছি : তাঁহার সেবার সমস্ত উপকরণগুলিকে ও সহায়কগুলিকে আমাদের গ্রাসে পাইয়াছি, এখন আর কিরূপে বাহির হয় দেখি, এবার আমাদের ভ্রষ্ট রাজ্য উদ্ধার হইবে, নির্ব্বাপিত যশঃ পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে।' ইহা ভাবিয়া যখন দৈত্যগণ হর্ষধ্বনি করিতেছিল, তখন দেবতাগণের হর্ষধ্বনির মধ্যে অঘাসুর সর্পের গলদেশে বকারি বাসুদেব নিজজনগণের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। গলদেশে দেহবর্দ্ধন-হেতু সেই অঘাসুরের কণ্ঠরোধ হওয়ায় তাহার চক্ষু বহির্গত হইল। সে ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ

ভ্রমণ করিতে লাগিল। শেষে অঘাসুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শ্রীবাসুদেব দেখিলেন, তাঁহার বিরহে ও অসুরের জঠরানলের জ্বালায় তাঁহার নিজ-জনগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির দ্বারা সচেতন করিয়া জগন্মঙ্গলের জন্য প্রকটিত নিজস্বরূপকে নিজজনগণের সহিত অসুরের মুখ হইতে বাহিরে প্রকাশ করিলেন। সুবুদ্ধিমন্ত পাঠকগণ! বিষয়-বিগ্রহ বকারি বাসুদেবের লীলার সহিত আশ্রয়বিগ্রহ বকারি বাসুদেবের লীলা মিলাইয়া শ্রীরূপানুগভজনের প্রতিবন্ধককে দূর করিবেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চম বর্ষীয় বালক বাসুদেব মহাভারত-কথিত মণিমান্-নামক সর্পাকার অসুরকে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা সংহার করিয়াছিলেন।

(৮) ব্রহ্মমোহন

ব্রহ্মমোহন-ব্যাপারটী ব্রজভজনের অষ্টম প্রতিবন্ধক। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে ইহা "কর্ম্মজ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা"র প্রতীক। ব্রহ্মার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা আকাশে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-বধ হইতে নিজজনগণের উদ্ধার পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সর্বজ্ঞ হইলেও যেন শ্রীবাসুদেবের অন্য মনোহর মহিমা দর্শন করিবার অভিলাষে তথায় আগমন করিয়া তাঁহার ব্রজের বৎস-বালকদিগকে অপহরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহ বটেন, কিন্তু কৃষ্ণ

সর্ব্বলোকের অন্তর্গত মনুষ্যবিশেষ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করায় ব্রহ্মার অধীন হন নাই; কিন্তু আধ্যক্ষিকতা ইহা বুঝিতে পারে না। এইরূপ আধ্যক্ষিকতা কখনও মৎসরতার অধীনতায়, কখনও বা বহির্ম্মুখতার স্বভাববশতঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবে সাধারণ, জীববুদ্ধি করিলে হরিভজনের যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহারই নাম 'ব্রহ্মমোহন'। ব্রহ্মমোহনাবস্থারূপ প্রতিবন্ধক জীবহৃদয়ে উদিত হইলে জীবের বিচার এই হয় যে, বর্ণ আশ্রম, বয়স বা দৈহিক বিপুলতার মধ্যে আচার্যত্ব আবদ্ধ! একদিন শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবাসুদেবকে 'বালক' জ্ঞান করিয়া মধ্যগেহ এবং 'সাধারণ প্রজা' মনে করিয়া মহাদেব নামক জনৈক রাজা আচার্য্যের বৈভবের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বাসুদেব পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রহ্লাদ অসুর হিরণ্যকশিপুর নিকট সামান্য বালক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অতি বাল্যকালেই অন্যান্য অসুরবালকগণের উপদেষ্টা ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যনন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পঞ্চমবর্ষ বয়সেই ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞতা-নিবন্ধন আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব আচার্য্যতত্ত্বে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ বা স্ত্রী এই সকল আধ্যক্ষিক বিচার ব্রহ্মমোহরূপ ভজন-প্রতিবন্ধক।

দণ্ডধারী সন্ন্যাসী না হইলে আচার্য্য হইবার যোগ্যতা হয় না, পুরুষদেহধারী না হইলে আচার্য্য হওয়া যায় না — এইসকল অত্যন্ত

স্থূল ও অসার সিদ্ধান্ত ব্রহ্মমোহরূপ প্রতিবন্ধক। শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় এইরূপ ব্রহ্মমোহরূপ প্রতিবন্ধক নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" —জৈঃ ধঃ ২০ অঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—

"যে-কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে, বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না।"

— (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

"শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস কিংবা সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর অনুসরণে বিধিমার্গে শিথিলতাপ্রযুক্ত ও অনুরাগাধিক্যবশতঃ কাষায় বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরমহংস-বেষ গ্রহণ করুন, সকলেই ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিগণ লোকচক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অভিনয় করিয়া কিম্বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীবাসাদি গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিয়া, শ্রীসনাতনাদি পরমহংসবেষে সজ্জিত হইয়া, শ্রীল

প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া সকলেই কায়মনোবাক্যে হরিদাস্যে নিযুক্ত ছিলেন।"

—(গৌড়ীয় ২য় বর্ষ, ২৯শ সং ৪, ৫ পৃষ্ঠা)

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থকুল এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামিকুলের সকলেই ত্রিদণ্ডী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরশাখার মূল-পুরুষ—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু। এই গদাধরের ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামক একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া মাধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত হন।"

—(গৌঃ ४র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা—শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'ত্রিদণ্ডী' প্রবন্ধ)

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ব্রহ্মচারী লীলায় আচার্য্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন এবং বহু ব্যক্তিকে দীক্ষা ও কৌপীনাদি পর্য্যন্ত প্রদান করেন।

শ্রীরূপানুগভজনের প্রতিবন্ধকরূপ ব্রহ্মমোহ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে ভিন্ন তত্ত্ব বিচার করিয়া থাকে। শ্রীরূপানুগ ভক্তি-বিনোদ-ধারায় সেইরূপ ব্রহ্মমোহের বিচার নাই।

"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥"

—(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭)

"শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে তত্ত্বগত কোনও পার্থক্য

নাই, কেবল লীলাগত পার্থক্য। আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিধেয়-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে।" —(অনুভাষ্য চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭)

শ্রীরামানুজাচার্য্যের সাক্ষাদুপদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা॥

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে।"

—(ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুবাদ)

আর একটী ব্রহ্মমোহ এই যে, "কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ঐকান্তিক বৈষ্ণব বা আচার্য্যকে 'নিত্যসিদ্ধ' বা 'পরমহংস' বলা অন্যায় ও অপরাধ! "ঐকান্তিক বৈষ্ণবে তাঁহার নিত্যসিদ্ধত্ব ও পরমহংসত্ব সম্বন্ধে যে সংশয়, কুতর্ক বা বেদবাদজনিত মোহ উপস্থিত হয়, তাহাই ব্রহ্ম-মোহরূপ শ্রীরূপানুগভজন প্রতিবন্ধক। রূপানুগবিচারে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয় না। একমাত্র বৈষ্ণবগণই সহজপরমহংস।

"এ জগতে চিদচিদ্-বিচার-চতুর পরমহংস ভক্তগণই ধন্য। ভক্তগণই পণ্ডিত, কেন না, তাঁহারা জড়জগতের মোহ-কলিলের পার পাইয়াছেন।"

—(আস্বাদবিস্তারিণী ভাষা-টীকা)

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী এই—"গৃহস্থ, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর চেহারাতেও পরমহংস বা উচ্চসন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই সন্ন্যাস। বৈষ্ণবমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী, বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।)

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

—এই অবস্থা-লাভই পারমহংস্যের সুষ্ঠু বিচার। ভোগ ও ত্যাগের বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্য-ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়।"

—(শ্রীল প্রভুপাদ কৃত গৌড়ীয়ভাষ্য ভাঃ ১।১৮, ২৮, ৩৬)

"ভাগবতা এব পরমহংসাঃ"—(শ্রীধরস্বামী, ভাঃ ৫।১৫)

অর্থাৎ ভাগবত বা বৈষ্ণবগণই পরমহংস।

"ভাগবতা এব পরমহংসা হেয়োপাদেয়-বিদঃ"

– (শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ ৫।১।৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৩।২৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পরমহংসকে 'প্রধানীভূত ভক্তিমান্' বলিয়াছেন।

'আচার্য্যত্ব কুল-পুরোহিত বা তথাকথিত ধর্ম্ম-পুরোহিতের ন্যায় একটি বৃত্তিবিশেষ; অথবা পরীক্ষাবিশেষের উপাধি কিংবা বিবিদিৎসা সন্ন্যাসের বিশেষণ মাত্র আচার্য্যত্ব'—এই সকল বিচারই —ব্রহ্মমোহ। শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় এইরূপ ব্রহ্ম-

মোহনের ছলনা উপস্থিত হইলে আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের আচার্য্য-লীলা তাহা নিরাস করিলেন।

আচার্য্যের লক্ষণ শ্রীব্যাসদেব ও পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ এইরূপ বলিয়াছেন—

"পঞ্চরাত্র-প্রবুদ্ধস্তু সিদ্ধান্তার্থস্থ তত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তি র্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এবাচার্য্যস্তু জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্ বদামি তে॥"

—(হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র)

"আচার্য্যস্তু ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
শৌচাচার-পরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ॥"

—(মাৎস্য)

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

—(বায়ুপুরাণ)

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্যকে কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত দেখিয়া 'আচার্য্য' উপাধি দিয়া-ছিলেন।—(ভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। শ্রীবীরভদ্র প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন. তাহা হইতেও জানা যায়, আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি, তিনি গ্রন্থাদি প্রচারের দ্বারা কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন।

"শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব

একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি-শ্রীমদ্রূপগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজন-সংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোষি।"
—(ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ)

"কেহ কেহ গৌরপ্রেমস্বরূপ আচার্য্য।
আচার্য্যের দ্বারে প্রভু সাধে বহুকার্য্য॥
গোস্বামিগণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার।
ভক্তবিরোধীর দর্প করিল সংহার॥"
—(ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ)

[৯] ধেনুকাসুর

ধেনুকাসুর শ্রীরূপানুগভজনের নবম প্রতিবন্ধক। গোবর্দ্ধনগিরির নিকটে তালবন অবস্থিত। রাম ও কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সেই তালবনে গমন করিয়া তালভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু ঐ তালবনে এক মহাবলশালী অসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিত। ঐ অসুর নর-মাংসভোজী।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে ধেনুকাসুরকে স্থূলবুদ্ধি, সৎ-জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা ও স্বরূপজ্ঞানবিরোধের প্রতীক বলিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। • • মিষ্ট তালফল গর্দ্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না, অথচ অপরলোকে খাইবে,

তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবব্দিগের পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়কর্তৃক যে-সকল পরমার্থ-গ্রন্থ রচিত আছে, স্থূল-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকে দেখিতে দেয় না। * * অতএব গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবতত্ত্বের উন্নতি হয় না।”

আচার্য্যলীলা যখন বনভ্রমণরূপ প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন এইরূপ স্থূলবুদ্ধি, সৎ-জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা ও স্বরূপজ্ঞানবিরোধরূপ ধেনুকাসুর কৃষ্ণ ও তাঁহার নিজজনগণের ঐ সুমিষ্টফল আস্বাদনের বিঘ্ন উৎপাদন করিল। নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফলস্বরূপ নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম, যাহা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-পরম্পরায় অবিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছে, সেই ফল তত্ত্বান্ধতারূপ স্থূলবুদ্ধি থাকিলে আস্বাদন করা যায় না। কিন্তু মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা ভগবত্তত্ত্বকে Intellectualism রূপে প্রচার করিয়া নিজেও গর্দ্দভতা-নিবন্ধন ঐ ফল ভক্ষণ করিতে পারিবে না, অপরকেও ভক্ষণ করিতে দিবে না, এইরূপ এক মৎসরধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ভক্তিসিদ্ধান্তে আলস্য ও জাড্য অথবা কাল্পনিক সিদ্ধান্ত, 'মেয়েমানুষী ও বনমানুষী' স্থূলবুদ্ধি তালবনে কংসচর গর্দ্দভাসুর-রূপে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর বলে, বলদেবপ্রভুর কৃপায় সেই মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা ও স্থূলবুদ্ধি কল্যাণকল্পতরুর নিঃশ্রেয়স-বন হইতে বিদূরিত হইল।

এই স্থূলবুদ্ধি গর্দ্দভাসুরই বিচার করিয়াছিল যে আচার্য্য-

ধারার নিত্যত্ব নাই। 'অন্ধকার যুগ' কথাটির দ্বারা আচার্য্যত্বের অনিত্যত্ব বা 'লীলার অবসান' ঘটাইতে পারিলে ক্রিয়ার বাগাড়ম্বর রাজত্ব করিতে পারে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে কল্যাণকল্পতরুর ফল আস্বাদনে বাধা প্রদান ব্যতীত আর কি? নিজেও ঐ ফল খাইতে পারিব না, অপরকেও খাইতে দিব না!

এই ধেনুকাসুররূপী স্থূলবুদ্ধি শুষ্কত্যাগ-বৃত্তিকে ভগবদ্ভজন অপেক্ষা বহুমানন করিতে করিতে প্রচ্ছন্নভোগী ও স্পষ্ট ভোগী হইয়া পড়ে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান একটা পরিহাস বা প্রহসনবিশেষ, ভোগ ও ত্যাগই সারাৎসার অর্থাৎ নাস্তিকতাই চরম প্রাপ্যবস্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। ইহাই স্বরূপ-জ্ঞানবিরোধ বা তত্ত্বান্ধতা; শ্রীরূপানুগ ভজনের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।

বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের দ্বারা এই তালবনবাসের অভিনয়-কারী ধেনুকাসুর নিহত হয়। এই স্থূলবুদ্ধিকে বলদেব বিতাড়িত করেন।

[১০] কালিয়-দমন

শ্রীরূপানুগভজনের দশম প্রতিবন্ধক কালিয়। অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা, দয়াশূন্যতা প্রভৃতি কালিয় সর্পের প্রতীক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন,— "কালিয়সর্পরূপ খলতা বৈষ্ণবদিগের চিদ্ দ্রবতারূপ যমুনাকে সর্ব্বদা দূষিত করে।" 'আমি গুরুশ্রেষ্ঠ', 'আমি সন্ন্যাসী', 'আমি 'বড় আমি', 'আমি মাপারাণীর মহারাজ', 'আমি পরমহংস ও সিদ্ধ-মঞ্জরী'; সুতরাং সাত্বত বিধির অনুসরণ বা অর্চ্চনাদি কার্য্যে

উদাসীনতা আমার পক্ষে গুণ-ব্যতীত দোষ নহে—এইরূপ খলতার দ্বারা পরের অপকার-সাধন, ক্রূরতাময় শুষ্কহাস্য প্রভৃতির দ্বারা লোকবঞ্চনাই কালিয় সর্পের আদর্শ। আচার্য্যলীলায় রূপানুগ-ভজনের এই প্রতিবন্ধককে দমন করিয়া বৈষ্ণবদিগের চিদ্দ্রবতারূপ যমুনাকে নির্ম্মল করিবার চেষ্টা সুধীগণ দর্শন করিতে পারিয়াছেন।

[১১] দাবাগ্নি পান

ব্রজভজনের একাদশ প্রতিবন্ধক দাবাগ্নি। পরস্পরবাদ, বিদ্বেষ বা সঙ্ঘর্ষ মাত্রই দাবানল। শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, কালিয়ের সখা কংসা-সুরের অনুচর কোন অসুর ব্রজবাসিগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মায়াবলে এই দাবাগ্নি-রূপ ধারণ করিয়াছিল।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হইতেই বিবাদ, বিদ্বেষ ও সঙ্ঘর্ষের উদয় হয়। নাস্তিক্য কংসাসুর—অতৃপ্তকনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী। তাহার প্রিয়তম চর প্রলম্ব এই দাবাগ্নির প্রধান সূত্রধর। ঐ অসুর কালিয়ের সখা ও কংসের অনুচর হইয়া শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অহৈতুক সেবক-সম্প্রদায়কে বিনাশ করিবার নিমিত্ত রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গ্রীষ্ম-কালীন শুষ্ক অরণ্য হইতে দাবাগ্নিরূপে উত্থিত হইয়াছিল। কি প্রকারে সেবকগণের মধ্যে কনক প্রতিষ্ঠাদির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করাইয়া তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া দিবে, ইহাই ছিল তাহার মূল উদ্দেশ্য। এই দাবাগ্নি এক সময় বাড়বাগ্নির ন্যায় নীলাচলের সমুদ্র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের অভিনয় করিয়া-

ছিল। এই দাবাগ্নি অনেক বারই সজ্ঘর্ষ ও বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কালিয়ের সখা এই দাবাগ্নির ক্রূরতা, খলতা, পরের সর্ব্বনাশ, গুরুসেবককে যোষিদ্‌জ্ঞানে ভোগচেষ্টা প্রভৃতি ঘৃণিত আসুরিক প্রবৃত্তি শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে ন্যূনাধিক সকলেরই পরিজ্ঞাত বিষয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই দাবানলকে 'নাস্তিক্যাদির দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রবে'র প্রতীক বলিয়াছেন। শুদ্ধরূপানুগধর্ম্ম, তদ্‌রক্ষক আচার্য্য ও সেবকবৃন্দের প্রতি যে উপদ্রব, তাহাই দাবানল। নাস্তিক্যবাদরূপ কংসের প্রেরিত অসুরগণ নানাভাবে এই দাবানল সৃষ্টি করিয়া থাকে। নিরীহ বৈষ্ণবগণকে অসংখ্য উপায়ে নির্য্যাতন করিবার শত শত কৌশল আবিষ্কার করে। ইহা বর্জ্জনের নামই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে দাবানল পান। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আচার্য্যলীলায় এই দাবানলরূপ অসৎসঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

[১২] প্রলম্বাসুর

শ্রীরূপানুগভজনের দ্বাদশ প্রতিবন্ধক প্রলম্বাসুর ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এই প্রলম্বকে স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশার প্রতীক বলিয়াছেন। যখন রামকৃষ্ণ গোপগণের সহিত বনে গোচারণ করিতেছিলেন, তখন প্রলম্ব নামক অসুর রামকৃষ্ণকে হরণ করিবার নিমিত্ত গোপরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রলম্বকে উহার বিনাশ-সাধনের

নিমিত্ত উহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিলেন। যখন রামকৃষ্ণ বয়স্য-গণের সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, তখন ক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে বহন করিয়াছিলেন, প্রলম্ব বলদেবকে বহন করিয়াছিল। প্রলম্ব বলদেবকে অতিবেগে আকাশমার্গে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু বলদেবের মুষ্টির প্রহারে প্রলম্বাসুর আহত হইয়া ভগ্নমস্তকে রক্ত বমন করিতে লাগিল. তাহার স্মৃতি-শক্তি নষ্ট হইল, ক্রমে প্রাণশূন্য হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া পতিত হইল।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আচার্য্যলীলায় তাঁহার সেবার বেষ ধারণ করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছিল। সর্ব্বদর্শী ভগবৎপাদ তাহা জানিতে পারিয়াও ব্যতিরেকভাবে তাঁহার লীলার পুষ্টির জন্য শ্রীরূপানুগভজনের ঐ প্রতিবন্ধকটীকে অনুচর-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সময় সময় বলিতেন,—"আমি প্রলম্বকে বলি দিয়া নির্হেতুক সত্যানুসন্ধিৎসুগণের মঙ্গল বিধান করিব।"

তাঁহার এই অপূর্ব্ব কৌশলময়ী লীলা জগতে প্রকাশিত না হইলে আচার্য্যলীলার সার্ব্বদেশিকত্ব প্রমাণিত হইত না অর্থাৎ স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা কিরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা বা অনুচরের রূপ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করিতে পারে এবং রূপানুগ ভজন-প্রয়াসিগণ তাহা হইতে কিরূপ সতর্ক হইবেন, —এই শিক্ষাটি জগতে প্রকাশিত হইত না। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনে ঐকান্তিকতারূপ

মুষ্টি প্রহারে সেই প্রলম্বাসুরের মস্তক ভগ্ন হইয়াছে। ঐ অসুর রুধির বমন করিতে করিতে স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রলম্বাসুর নিজ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়কে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর আরোপ করিবার জন্য যে-সকল চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বাস্তব-সত্যের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। উহার দ্বারা তাহারই চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

(১৩) যাজ্ঞিক বিপ্র

শ্রীরূপানুগভজনের ত্রয়োদশ প্রতিবন্ধক যাজ্ঞিকবিপ্র। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাকে বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্য বা কর্ম্মজড়তা বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আচার্য্যলীলায় একরূপ কর্ম্মজড়তা ও অদৈব-বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্যরূপ মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোভাবের পর অন্য প্রকার বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কার্ষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্য ও কর্ম্মজড়তার উদ্ভব হইল। অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রীগুরুদেবে জাতি-বুদ্ধি, আশ্রমের তারতম্যরূপ বদ্ধদশার বিচারে আচার্য্যত্ব-নিরূপণ-চেষ্টারূপ কর্ম্মজড়তা বা বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কার্ষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্যরূপ একটি যুক্তিবাদী আসুরিক ভাব ব্রজ-ভজনের প্রতি-বন্ধকরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। আচার্য্যলীলায় এই প্রতিবন্ধকটি ঐকান্তিক ভজনপ্রয়াসিগণের কোনই অমঙ্গল করিতে পারিল না। কারণ, অধোক্ষজ-বিমুখগণের মস্তক মুণ্ডন, দণ্ডধারণ, কৃত্রিম বাগ্মিতা, সুবৃহৎ বপু, বহুজ্ঞতা, ক্রিয়াদাক্ষ্য, আসুরিক তপস্যা প্রভৃতির কিছুই মূল্য নাই।

(১৪) ইন্দ্রপূজা-বারণ

ব্রজভজনের চতুর্দ্দশ প্রতিবন্ধক—ইন্দ্রপূজা। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এই ইন্দ্র-পূজাকে 'বহ্বীশ্বর বুদ্ধি ও অহংগ্রহোপাসনা'র প্রতীক বলিয়াছেন। বহ্বীশ্বরবুদ্ধি ও অহোংগ্রহোপাসনা অনেক প্রকার। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্ব অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকারে এই বহ্বীশ্বর-বুদ্ধি ও অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধ দৃষ্ট হয়।

বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের লীলায় ইন্দ্র-পূজা-বারণের দ্বারা কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব সংস্থাপন ও অন্যান্য দেবতায় স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বাসুদেব দেবতাদিগের মধ্যে তারতম্য বিচার প্রদর্শন ও বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মাকে বা শ্রীব্যাসদেবকে অন্যান্য দেবতাগণের সহিত সমান আসন প্রদান করেন নাই। সকলেই এক গুরুর শিষ্য হইলেও সতীর্থগণ সকলে সমান, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চাবচ ভেদ নাই, অথবা কেবলমাত্র বেষ বা আশ্রমের দ্বারাই উচ্চাবচ নিরূপিত, এইরূপ বিচার শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার বিচার নহে। এমন কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও শ্রীস্বরূপ-সনাতন রূপের বৈশিষ্ট্য আছে শ্রীস্বরূপ রূপানুগ পরিচয়েই গৌড়ীয়গণ পরিচিত সকল বৈষ্ণবকে সমান বলিলে—

যে জন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥"

—এই ভক্তিবিনোদবাণীকে লঙ্ঘন করা হয়। এইরূপ অপসিদ্ধান্তই বহ্বীশ্বরবুদ্ধি। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কোন সরল কিংবা তত্ত্বানভিজ্ঞ জনসাধারণ তাঁহাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে। 'বড় আমি'র অভিমানকারী বা সন্ন্যাসলিঙ্গধৃক্ কিংবা বাক্যবাগীশ অথবা কর্ম্মবীর বা ক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তিগণকে দেখিয়া ঐকান্তিক শরণাগত ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা উপলব্ধির অভাবই ইন্দ্র পূজা বা বাহ্য ঐশ্বর্য্যের পূজা। 'কেন' উপনিষদে ইন্দ্রের বিভূতি মূলপুরুষ কে, তাহা একটি আখ্যায়িকার দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। আচার্য্যলীলায় ইন্দ্রপূজা-বারণের দ্বারা 'Show bottie' সমূহের পূজা নিষেধ করা হইয়াছে। যতক্ষণ ইন্দ্র ব্রহ্মের শক্তি ধারণ করেন, ব্রহ্মের সেবানুকূল্য করেন ততক্ষণই তাঁহার আধিকারিক দেবত্ব। কিন্তু ইন্দ্র যখন 'বড় আমি' হইতে চাহে, 'মাপারাণীর মহারাজ' হইবার অভিলাষ করে, পৃথিবী-বিজয়ী-বাগ্মী বা 'গুরুশ্রেষ্ঠ' বলিয়া আপনাকে প্রচার করে, তখন পরব্রহ্ম তাহার শক্তি হরণ করিয়া লন। ইন্দ্র যখন কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার দাস হইয়া পড়ে, তখন আর তাহাকে ভগবৎসেবক বা প্রভু বলা যায় না।

'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"। গুরু-সেবককে ভোগ করিবার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অহংগ্রহোপাসনা। উহা জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ অপেক্ষা অপরাধ-জনক। আমি বৈষ্ণবের গুরু', 'বৈষ্ণবের প্রভু', 'গুরুসেবকের গুরু' 'আমি উচ্চাসনে বসিয়া থাকিব, আর গুরুসেবক গরুড় পক্ষীর ন্যায় নিম্নে অবস্থান করিয়া গলবস্ত্র-

কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার স্তব করিবে, আর সেইরূপ চিত্র বৈষ্ণব-সমাজে ও সাধারণ্যে প্রচার করিয়া আমি কিরূপ বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারি, তাহা প্রদর্শন করিব' এইরূপ অহংগ্রহো-পাসনা শ্রীরূপানুগভজনের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা ও সমস্ত শক্তিতত্ত্বের অংশিনী হইয়াও তুলসী মঞ্জরীকে কখনও নিজ পাদপদ্মে ধারণ করেন না। তিনি শ্রীতুলসীকে হস্তে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রদান করেন। ইহাই শ্রীরূপানুগভজনের ধারা।

কোন এক সময় গৌর নাগরী-সম্প্রদায়ের দলভুক্ত কোন এক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত অভিমান করিয়া 'গৌড়ীয়' পত্রের প্রচ্ছদপটের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট কালের একটি 'ব্লক' নিৰ্ম্মাণ করাইয়া আনিয়াছিলেন। ঐ ব্লকটি ঐ ব্যক্তির পরিকল্পনানুসারে এইরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছিল যে, 'গৌড়ীয়' শব্দের দুইদিকে দুইটি গরুড় করজোড়ে 'গৌড়ীয়'কে স্তব করিতেছেন! বোধ হয়, বৈকুণ্ঠপার্ষদ অপেক্ষা শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়ের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনই উক্ত মনোধৰ্ম্মীর উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব এইরূপ পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ অপরাধজনক জানাইয়া উহা বারণ করিয়া-ছিলেন। এই সকল সংসিদ্ধান্ত স্থাপনের দ্বারা আচার্য্যলীলায় বহ্বীশ্বরবুদ্ধি ও অহংগ্রহোপাসনারূপ ইন্দ্র-পূজা বারণ করা হইয়াছে।

(১৫) বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার

বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার লীলাটী বারুণী অর্থাৎ আসব সেবায়-

ভজনানন্দ বৃদ্ধি হয়, এই বুদ্ধি দূরীকরণের আদর্শ। কৃষ্ণসংহিতায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—জীবের নিরুপাধিক আনন্দকে 'নন্দ' বলিয়া ব্রজে লক্ষ করা যায়। কোন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ আনন্দকে সম্বর্দ্ধন করণাশয়ে মাদক দ্রব্য সেবন করেন। তাহাতে আত্মবিস্মৃতি রূপ বৃহৎ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ব্রজভাবগত পুরুষেরা কখনই কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করেন না।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার পঞ্চদশ বর্ষ সজ্জনতোষণীতে 'কলি' প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—'আসবমাত্রই পান পাত্র কোন স্থলে দ্রব্যজাতীয়, কোন স্থানে ধুম্রাকার।" ঠাকুর তন্ত্র হইতে বার প্রকার মদ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঠাকুর লিখিয়াছেন, "আসব সেবন-দ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার হয়, এইরূপ কথা কেবল আসবপরতন্ত্র লোকের আত্মরক্ষা বাক্যমাত্র!" বিষয়ীর সঙ্গরূপ আসব-সেবনের দ্বারা হরিসেবার সহায়তা হয়, এইরূপ মদমত্ততামূলক আত্ম-রক্ষাপর বাক্য কতিপয় ব্যক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণকে এইরূপ কুবিষয়ীর সঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

(১৬) সর্প হইতে নন্দমোচন

'সর্প হইতে নন্দমোচন' লীলাটী শ্রীরূপানুগভজনের ষোড়শ প্রতিবন্ধক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাকে মায়াবাদাদি গিলিত ভক্তিতত্ত্বের উদ্ধার ও মায়াবাদি-সঙ্গত্যাগের প্রতীক বলিয়াছেন।

আচার্য্য ও আম্নায়বিরোধি-সম্প্রদায় এক-জগদ্‌গুরুবাদিগণের ন্যায় মহান্ত-গুরুবাদ অস্বীকার করিয়া কৃষ্ণের নিঃশক্তিকত্ব প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছেন। সকল সময়ই এই পৃথিবীতে কৃষ্ণশক্তির পরিচয় আছে। শিক্ষাগুরুকে ভক্তশ্রেষ্ঠ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত না জানাই মায়াবাদ। দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুকে কৃষ্ণের সমান বা কৃষ্ণ হইতে ছোট, উভয় বিচারই অপরাধজনক। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "শ্রীগুরুস্বরূপ" প্রবন্ধে। সঃ তোঃ ১৮।৫) লিখিয়াছেন,—"গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয়তত্ত্বই ভগবান; কিন্তু পরস্পর পৃথক। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎ-শক্তি-মূলে নিত্য-বিরাজমান; কেবল সম্বিৎ-শক্তি-পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া-মত হইয়া যাইবে।

শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বা আচার্য্যকে যে, 'ওঁ বিষ্ণুপাদ', ভগবচ্চরণ' বা 'ভগবৎপাদ' প্রভৃতি বলিবার বিধি শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিভক্তি বিলাসে (১।১ বিঃ ৬০) শাস্ত্রপ্রমাণমূলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য মায়াবাদের প্রশ্রয় দেন নাই। শিষ্য যখন গুরুদেবকে "ওঁ বিষ্ণুপাদ" বা "ভগবৎপাদ' বলেন, তখন তাহা শ্রীগুরুদেব

কখনই নিজে আত্মসাৎকরেন না। বস্তুতঃ শ্রীগুরুদেবকে জীবজ্ঞান বা হ্লাদিনীর ভোক্তা শক্তিমত্তত্ত্ব জ্ঞান, উভয়ই মায়াবাদ। আচার্য্যলীলায় এই সকল সিদ্ধান্তপ্রচারের দ্বারা খলতাপূর্ণ মায়াবাদরূপ সর্প হইতে ভক্তিতত্ত্বরূপ 'নন্দে'র উদ্ধার হইয়াছে।

[১৭] শঙ্খচূড় বধ

শঙ্খচূড় বধ ও তাহার মস্তকের মণি-মোচনরূপ লীলাটী শ্রীরূপানুগভজনের সপ্তদশ প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গস্পৃহার বর্জ্জন—এই লীলার প্রতীক। আচার্য্যলীলায় এই শঙ্খচূড়বধ ও মণিমোচন লীলাটী প্রত্যেক অকপট সাধকই পরিদর্শন করিতে পারিয়াছেন। শঙ্খচূড় দৈত্য তাহার মস্তকস্থিত ভাস্বরমণির প্রভার দ্বারা বহুলোককে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শঙ্খচূড় ধনাধিপতি কুবেরের অনুচর। সে মনে করিয়াছিল, ধনকুবেরই তাহাকে রক্ষা করিবে। সেই ব্যক্তি ধনমদের মুখাপেক্ষিতারূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া হরিসেবার ছলনায় প্রতিষ্ঠাশা ও যোষিৎসঙ্গস্পৃহায় আসক্ত হইয়া পড়িতেছিল। লোকে তাহার মস্তকে ভাস্বরমণি দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যাইত। কাজেই অনেকে তাহার চরিত্র জানিলেও উহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন সেই ধনমত্ততার আনুগত্য বৃত্তি ভগবৎ প্রকাশ-বিগ্রহকে 'মনুষ্য' মনে করিয়া তৎসেবক সম্প্রদায়ের শুদ্ধা সেবাবৃত্তি অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তখন আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেব শঙ্খচূড়ের মস্তকের সহিত শিরোমণিটি তাহার সৎসিদ্ধান্তরূপ মুষ্টির দ্বারা মোচন করিয়া বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রদান করিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় লিখিয়াছেন—

"প্রতিষ্ঠাপরতা ও ভক্তিচ্ছলে ভোগকামনা—ইহারা শঙ্খচূড় নামা প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া যে-সকল লোক কোন কার্য্য করেন, তাঁহারাও একপ্রকার দাম্ভিক। অতএব বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন।"

এই সকল দাম্ভিক 'বড় আমি'র অভিমান-ভরে ডগমগ হইয়া যে-সকল বহ্বারম্ভ করিয়াছিল, তাহা আচার্য্যলীলায় সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

[১৮] অরিষ্টবৃষ-বধ

অরিষ্টাসুর বৃষভ ব্রজভজনের অষ্টাদশ প্রতিবন্ধক। অরিষ্টাসুর বৃষের রূপ ধারণ করায় লোকে ইহাকে **'ধর্ম্মের ষাঁড়'** মনে করে। এই অরিষ্ট 'ধর্ম্মের ষাঁড়' রূপে হ্লাদিনীর বিভিন্নাংশ শক্তিতত্ত্বকে ভোগ করিবার জন্য ভ্রমণ করিয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছলধর্ম্মাদির অভিমান ভক্তিকে অবহেলা করার সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাকে "Stud bull" বলিতেন। এই অরিষ্টাসুর মনে করিত যে, "ভগবদ্ভক্তি একটা ধাপ্পাবাজী বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের কৌশল মাত্র। ভোগী ও বিষয়ী-লোকের নিকট একটা বাহ্যাড়ম্বর সংরক্ষণ করিয়া গোপনে গোপনে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করাই সাধ্যসার। শাস্ত্রে যে-সকল কথা আছে, তাহা ইউটোপিয়ান থিওরী (Utopian theory) বা কাল্পনিক সর্ব্বোত্তমতা মাত্র। জালিয়াতী, ধাপ্পাবাজী ও ছল ধর্ম্মাদির দ্বারা ভক্তিকে অবহেলা করিলে বাস্তবতার কোন অসুবিধা

হয় না। আচার্যালীলায় এই অরিষ্টাসুর বৃষের ধ্বংস হইয়াছে—ছলধর্ম্মের ষাঁড়—ধ্বংস-দেবতার বাহন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

[১৯] কেশীদৈত্য বধ

কেশীদৈত্য শ্রীরূপানুগভজনের ঊনবিংশ প্রতিবন্ধক কংস-প্রেরিত কেশীদৈত্য বৃহদাকার অশ্বের আকৃতি ধারণ করিয়া মনের ন্যায় দ্রুতবেগে নন্দব্রজে গমন করিয়াছিল। তাহার অশ্বজাতীয় শব্দে বিশ্ব ভীত হইয়াছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় বিশাল, মুখবিবর বিকট, গলদেশ বৃহৎ ও শরীর নীলবর্ণ মেঘের ন্যায়। কোন কোন বৈষ্ণব ইহাকে 'গরিলা'র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই দৈত্য দুরাশয় কংসের মঙ্গল সাধনের জন্য ব্রজধাম কম্পিত করিয়া সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাকে 'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিব অহঙ্কারের প্রতীক বলিয়াছেন।

"আমার শরীর অশ্বের ন্যায় স্থূল ও আমার স্বর অশ্বের হ্রেষারবের ন্যায় উচ্চ, বহু যোষিৎ, বিষয়ী ও ধনবান আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, আমার পদানত হন, 'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এইরূপ অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিব অহঙ্কারের যখন উদয় হয়, তখন 'ভাল আমি' হইবার পরিবর্ত্তে আমরা 'বড় আমি' হইয়া পড়ি। 'আমি আচার্য্য' অভিমান করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রকট-কালেই তাঁহার বিনা অনুমতিতে শিষ্য-করণ, নিজ চিত্রপটের পূজা-প্রচার, স্বতন্ত্রভাবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া থাকি। এই

জাতীয় চিত্ত-বৃত্তিরূপ কেশীদৈত্য ঘর্ম্মাক্ত শরীরে ঘূর্ণিত লোচনে পূর্ব্বীয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। 'কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী অনর্থযুক্ত জীবও বড় ভক্ত ও আচার্য্য হইতে পারে'—এইরূপ বিচার, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও জাগতিক অহঙ্কাররূপ কেশী দৈত্য আচার্য্যলীলায় অত্যন্ত হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

[২০] ব্যোমাসুর

শ্রীরূপানুগভজনের বিংশতিতম প্রতিবন্ধক ব্যোমাসুর। মহামায়াবী ময়পুত্র ব্যোমাসুর গোপবালকের বেষ ধারণ করিয়া চোরের অনুকরণ পূর্ব্বক মেষরূপধারী অনেক গোপবালককে অপহরণ করিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব্যোমাসুর দৈত্যকে চৌরাদি ও কপট ভক্তের আদর্শ বলিয়াছেন। ব্যোমাসুর শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্যের কোন কোন কোমলশ্রদ্ধ সেবককে বা বালককে নিজের কপট বেষ ও সুপারীশ পত্র প্রভৃতি দেখাইয়া অপহরণ করিয়াছে ও করিতেছে। এমন কি, শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি ও শ্রীশেষ-শায়ী-মূর্ত্তিকে ব্রজমন্দির হইতে অপহরণ করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে! ব্রজের বিভিন্ন বৈভবকে বিভিন্ন স্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কোমল-শ্রদ্ধগণের কোমল-শ্রদ্ধা, বৈষ্ণবসাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি চেতনবৃত্তিকে হরণ করিয়াছে। এই অসুর প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবতধর্ম্ম ও কপট ভক্তির মূর্ত্ত প্রতীক। প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবতধর্ম্ম ও আশ্রয়বিগ্রহের দোহাই দিয়া বংশপরম্পরায় হরিগুরুবৈষ্ণব-ভোগ-বৃত্তি চালাইবার জন্য যাবতীয় কপটতার আশ্রয় করিয়াছে।

আচার্য্যলীলায় এই সকল চৌরাদি ও কপট ভক্তের সঙ্গরূপ অনর্থ সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হইয়াছে।

আচার্য্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা অর্থাৎ কৃষ্ণ ও গৌর উভয় লীলার ভজন রহস্যের প্রতিকূল তত্ত্বসমূহের নিরাস দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর বাণীর অনুসরণে জানিতে পারা যায় যে, 'গৌরলীলায় বঙ্গকবি প্রমুখ সিদ্ধান্ত-বিরোধী রসাভাসদুষ্ট ছল কবিগণ, রামচন্দ্রপুরীপ্রমুখ হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ, কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ছোট হরিদাসের আদর্শে জিহ্বাশিশ্নোদর-লম্পট কপট ত্যাগিগণ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষিগণ, বাউলিয়া কমলাকান্ত, শঙ্কর, মাধব প্রভৃতি মায়াবাদ-সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তিগণ, অদ্বৈতাচার্য্যের পরিত্যক্ত ও গদাধর-পণ্ডিতবিরোধী ব্যক্তিগণ, সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গভঙ্গকারী শাসকাভিমানিগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতী-প্রকাশ-বিগ্রহের লীলা-কালেও এইরূপ আত্মবঞ্চনার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিবিনোদধারার যে সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, আমরা নিজ দুর্দ্দৈববশেই বঞ্চিত হই। 'সূর্য্য ছত্র দ্বারা আবৃত হইয়াছেন' বলিলে যেরূপ আমরা আমাদের চক্ষুকেই ছত্রের দ্বারা আবরণ করি, সুবৃহৎ সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারি না, তদ্রূপ যখন অন্যাভিলাষের বহুরূপী যবনিকার দ্বারা আমাদের সেবাবৃত্তিকে আবরণ করি, তখনই আমরা আচার্য্য-কৃপা হইতে বঞ্চিত হই; ইহারই নাম

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া। শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-বাণীর অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্ব্বাদধারা শ্রাবণের ধারার ন্যায় অনর্গল বর্ষিত হইতেছে। যাঁহারা অন্যাভিলাষের বিভিন্ন আবরণের দ্বারা আপাত আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন বা হইবেন, তাঁহারাই ঐ ধারা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদর্শ-চরিত্রগঠন ও তাহা সমভাবে আচার ও প্রচার না করিলে কেবল সুপারীশের জোরে বৈষ্ণবতা লাভ হইতে পারে না। স্বতন্ত্রতাই তটস্থশক্তিজাত জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে মুহূর্ত্তে সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার প্রকাশিত, সেই মুহূর্ত্তেই বৈষ্ণবতা প্রকাশিত। আবার তটস্থধর্ম্ম-নিবন্ধন যে মুহূর্ত্তে স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার, সেই মুহূর্ত্তেই অবৈষ্ণবতার প্রকাশ।

স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবৎপ্রকাশ বিগ্রহ আচার্য্যের বাৎসল্য-লীলা-রহস্য ভক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারা দর্শন করিতে হয়। আমরা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সিদ্ধান্ত হইতে কৃষ্ণ ও গৌরলীলার প্রকৃত ভক্তবাৎসল্যের রহস্য কি, তাহা উদ্ধার করিয়া আচার্য্য-প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুপূজার আরতি করিতেছি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১১শ স্কন্ধ গৌড়ীয়ভাষ্যে বলিতেছেন,—

"বিষ্ণুর সহিত বিষ্ণুবংশের সাম্য কল্পনা করায় জগতে যে অমঙ্গল ঘটে, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্যই ভগবানের যদুকুল-ধ্বংসের প্রয়াস। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল। কিন্তু যেস্থলে

শ্রীকৃষ্ণাধস্তনের কৃষ্ণবৈমুখ্য বা কার্ষ্ণবাৎসল্যাভাব বা ভগবদধীন-জনের মধ্যে মিত্রতাভাব, সেইস্থলে কৃষ্ণের আত্মীয় জ্ঞানে বিদ্বেষিজনের প্রতি জীবের মিত্রতা অজ্ঞতারই কারণ হয়। কংসকে 'ভগবন্মাতুল' মনে করিয়া যদি কেহ তাহাকে কৃষ্ণের অনুগত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার যেরূপ ভ্রমপূর্ণ হয়, দুর্জ্জনাদিকে কৃষ্ণের আত্মীয়-জ্ঞানে যদি কৃষ্ণবিদ্বেষিপক্ষকে কৃষ্ণপাল্যপক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেইরূপ মায়াবাদাশ্রিত জনগণ কৃষ্ণভক্তবিরোধিগণকে কৃষ্ণাত্মীয়কুল-জ্ঞানে অবিচার গ্রহণ করিলেন। * * বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়ের কৃত্য-বিমুখ যে-সকল আশ্রিতাভিমানী, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্তির বিরোধী বলিয়া না জানিয়া অনুকূলজ্ঞান, কখনই 'সুদর্শন' শব্দবাচ্য নহে। * * যদিও প্রাকৃত সহজিয়া-কুল আপনাদিগকে কৃষ্ণের 'আত্মীয়' জ্ঞান করেন, তথাপি পরমদয়াময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের বিনাশ-সাধনে সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তাঁহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন না। যদুকুমারগণের কপটতা 'বিনীতবৎ' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা দুর্ব্বিনীত। * * শ্রীগৌর-সুন্দরের স্বীয় জননীদ্বারা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর স্থানে অপরাধখণ্ডন প্রভৃতি লীলা ঔদার্য্যের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণের যদুকুল-সংহার লীলা ভক্তবাৎসল্যেরই জ্ঞাপিকা। * * শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় মিছা-ভক্ত-সম্প্রদায় পরস্পর প্রতিষ্ঠাশায় ভাগবাটোয়ারা ও কনক-কামিনীর অংশ-নির্দ্দেশ লইয়া এরকা বনের শর-

সংগ্রহ-রূপ মিছাভক্তি-শর-দ্বারা কামবাণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণবৈমুখ্যই লাভ করিবেন। * * যেরূপ শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণ মিছাভক্তগণের ভক্তি-বিদ্বেষকে 'ভক্তি' বলিয়া প্রচলন করা অমঙ্গলের হেতু বলিয়া জানাইয়া দেন, সেইরূপ ভাবেই নারদাদি ঋষিগণ কপটতাশ্রিতাভিমানী যদুনন্দনকে মূঢ়, দুষ্টমতি প্রভৃতি সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন—এই মিথ্যা-গর্ভে বা মিথ্যা-সাধুর বেষে তোমাদের কুলনাশন মুষল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভোগী বিদ্ধ-গৌড়ীয়-ভক্তনামধারী প্রেমভক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা কপটতা করিয়া দেখান। স্ত্রী বেষের অন্তর্বত্নীতায় মিছাভক্তির অকর্ম্মণ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং মুষলের দ্বারা মিছাভক্তকুলনাশন হইবে, ইহা জানাইয়া দিলেন। * * যদুকুমারগণ নারদাদি বৈষ্ণবের বাক্যে সজ্জিত উদরাভ্যন্তর উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে, কপটতার জন্য বৈষ্ণবাপরাধের ফলস্বরূপ সত্যসত্যই কুলনাশন মুষল রহিয়াছে। এই আদর্শে বিদ্ধসমাজে কপটতানামক মুষল কখনই ভক্তের সমাজে শান্তি বিধান করিতে পারিবে না; পরন্তু অভক্তিক্রিয়াসমূহ ও সেইরূপ অপসম্প্রদায়ের অবিবেচনা - সমস্তই ধ্বংস লাভ করিবার আকর দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের কৃত কার্য্যের জন্য ভয় হইল, সুতরাং **যাহাতে কপটতা সূক্ষ্মাকার ধারণ করে এবং ছড়াইয়া না পড়ে, তাহা হইলে আর লোকে কপটতা ধরিতে পারিবে না,** এইরূপ পরামর্শ করিলেন। কিন্তু **এইরূপ পরামর্শ করিয়াও তাঁহারা ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ-নিবন্ধন তাঁহাদের কুল**

রক্ষা করিতে পারেন নাই। * * কৃষ্ণ যেরূপ জবিষ্ঠ কলি জন্মগ্রহণ করাইয়া নিজ কুল সংহারের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও তদ্রূপ ত্রয়োদশ প্রকার এবং ভাবী বহুপ্রকার অপসম্প্রদায়ের গৌরানুগতব্রুব গৌরবংশ্য মিথ্যা-ভিমানী জনগণকে সংহার করিবার জন্য বিভিন্ন মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদে জগৎ প্লাবিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার তিনি নিজ-জনগণকে কপটজনগণের মিছা ভক্তির সহিত পৃথক্ থাকিবার জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের যে সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গৌর-ভক্তগণ আলোচনা করিয়া বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করিবেন না।"

এই আচার্য্যলীলায় কৃষ্ণলীলার বিংশতি বা দ্বাবিংশতি অসুরমারণলীলা অর্থাৎ ব্রজভজন বা শ্রীরূপানুগ ভজনের প্রতি-বন্ধক দূরীকরণ লীলা তথা শ্রীগৌরলীলার মৃদঙ্গভঙ্গকারী কাজী দলন লীলা, ছোট-হরিদাস-বর্জ্জন, রামচন্দ্র পুরী ও শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুসেবার পার্থক্য প্রদর্শন, বঙ্গদেশীয় কবির ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস দোষ নিরসন, বাউলিয়া সম্ভোগ বাদ, শ্রীগদাধর শ্রীঅচ্যুতানন্দ-বিরোধী আচার্য্যকল্পনা বাদ, অদ্বৈতবংশ্যাভিমা প্রেতশ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি বহু বহু মতবাদের নিরাস হইয়াছে।

—:০:—